গৈলার কথা

গৈলা সম্মিলনী

প্রকাশক ঃ
শৈলা সম্মিলনীর পক্ষে ইতিহাস শাখার কর্মসচিব
হিরণ্ময় গুপ্ত,
পূর্বাচল, পোঃ রহড়া, ২৪ পরগণা।

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬

মুদ্রাকর ঃ
কুমারেশ ভট্টাচার্য,
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
২০৩-১-১, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬।

শৈলাবাসীদের উদ্দেশ্যে

ভূমিকা

"গৈলার কথা" প্রকাশিত হইল। ইহাতে গ্রামে প্রথম বসতি আরম্ভ, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন দিক হইতে গ্রামের অধিবাসীদেব জীবন যাত্রাব পরিচয় আছে।

এক ভৌগোলিক অস্তিত্ব ছাড়া যে গ্রাম তাহার সমস্ত গৌরব ও ঐতিহ্য লইযা ক্রমশই বিস্মৃতিব অতলগভে ধীবে ধীবে বিলীন হইয়া যাইতেছে সে গ্রামের আর পরিচয় ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস কেন এ জন্য একটু ভূমিকাব প্রয়োজন হইতে পারে। আমাদের মনে হয উপরোক্ত কারণেই ইহার অতীত ইতিহাস রচনা করা আবশ্যক। অতীত গৌরব আমাদের নিজ শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলে, আত্মবিশ্বাস ফিরাইয়া আনিয়া দৃঢপদে উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসব হইতে সাহায্য করে ও মনে আশাব সঞ্চার করে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে আমাদের গ্রাম একদা বাংলা দেশে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং দেশেব তৎকালীন অবস্থায় কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এক গৌরবময় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।

সর্বভারতীয় সংস্কৃতির সহিত আমাদের প্রথম যোগ সাধন হয় কয়েকশত বৎসর পূর্বে ত্রিলোচন দাশ কবীন্দ্রের 'কলাপ ব্যাকরণের' "কাতন্ত্র পরিশিষ্ট" নামে টীকার মারফতে। পরে বাংলা দেশের নিজস্ব সাহিত্য ও কৃষ্টির সহিত আমাদের একাত্মতা পূর্ণতা লাভ করে বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' গ্রন্থের মাধ্যমে।

এখানকাব মনসা দেবীও কযেকশত বৎসর ধবিযা পূর্ববঙ্গেব বিভিন্ন জিলার অগণিত নবনাবীকে আকৃষ্ট করিযাছে ও তাহাদেব হৃদযে ভক্তিভাব জাগ্রত কবিযাছে।

পুরাতনেব ভাবধাবায অর্থাৎ ধর্ম, সংস্কৃত চর্চা, টোল প্রভৃতিতে যেমন গৈলা সমস্ত পূর্ববঙ্গে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকাব কবিয়াছিল ঠিক তেমনি নূতন যুগে ইংবেজী শিক্ষা গ্রহণেও যথেষ্ট কৃতিত্বেব পবিচয দিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয স্থাপনেব কয়েক বৎসবেব মধ্যেই, ১৮৬৫ সালে, এই গ্রামেব একজন যুবক গ্রাজুয়েট হ'ন। এ সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবে স্মবণীয় যে তখনকাব দিনে এই শিক্ষা গ্রহণ মোটেই সহজ ব্যাপাব ছিল না, ৭।৮ দিন ধবিযা নৌকাযোগে বিপদসংকুল নদী পথে ঢাকা শহব বা ৩।৪ দিন ধবিয়া অনুরূপভাবে খুলনা ও তৎপব স্থলপথে কলিকাতা যাইতে হইত। ক্রমে ক্রমে গ্রামে ইংরেজী শিক্ষার সবিশেষ প্রসার হয়, ছেলে মেয়েদের জন্য উচ্চ ইংবেজী স্কুল স্থাপিত হয ও শহবেব বিভিন্ন কলেজে গ্রামেব বহু ছাত্র ছাত্রী শিক্ষা লাভ কবিতে আবম্ভ কবে।

ডঃ সুরেন্দ্র নাথ দাশ গুপ্ত, যাঁহাব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ভারতবর্ষ, ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বিদ্বৎ সমাজে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, এই গ্রামেরই সন্তান। গ্রামের বহু ছেলে ও মেযে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ, ও এম-এস-সি প্রভৃতি পরীক্ষায প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং এ দেশের ও ইউবোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় এবং ডাক্তাবি ও ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সংখ্যাও কম নহে।

সাহিত্য ও সাংবাদিকতাব ক্ষেত্রেও গ্রামের সন্তানগণ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

রাজনৈতিক ও মুক্তি আন্দোলনেও গৈলা যোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছে। ললিত মোহন দাসতো আজীবন কংগ্রেসের মাধ্যমে

দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। কংগ্রেসী, বিপ্লবী ও কম্যুনিষ্ট ভাব ধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া গ্রামের বহু সংখ্যক যুবক যুবতী স্বাধীনতা সংগ্রামে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকাব করিয়াছেন। বিচারে বা বিনা বিচারে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক কাবারুদ্ধ বা অন্তরিতেব সংখ্যাও প্রচুব। তারকেশ্বর সেনের হিজলী ক্যাম্পে পুলিশের গুলিতে প্রাণ বিসর্জনের কথাতো সর্বজন বিদিত।

জনহিতকর বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠান আমাদেব উচ্চ সামাজিক বোধের পরিচায়ক।

সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে গ্রামের অনেকে দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ পদ অধিকারের মর্যাদা অর্জন কবিয়াছেন—ভারতীয় সৈন্য ও নৌবিভাগও বাদ যায় নাই। ওকালতি, ডাক্তারি প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসায়ে অনেকে প্রভূত যশের অধিকাবী হইয়াছেন।

বিপিন চন্দ্র পাল, পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয়, সুভাষ চন্দ্র বসু প্রভৃতি সর্বভারতীয় নেতা এবং স্বামী ভোলানন্দ গিরি, ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ প্রমুখ বিখ্যাত ধর্মপ্রচারকগণ বিভিন্ন সময়ে এই গ্রামে পদার্পণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে সর্বশেষে আসেন সুভাষ চন্দ্র বসু—তিনি আসিয়াছিলেন গৈলা স্কুল প্রাঙ্গণে তারকেশ্বর সেনের স্মৃতি চিহ্ন প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে।

এ সবই আমাদের গৌরবের বিষয় এবং এই কারণেই গ্রামের এই বিবরণ প্রণয়নে আমরা ব্রতী হইয়াছি। ইহা পাঠে বয়স্কদের মনে পূর্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিবে ও বর্তমান নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও তাঁহারা কিছুটা আনন্দ পাইবেন; যুবকেরা ও আমাদের ভাবী বংশধরেরা গ্রামের পূর্ব বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন ও তৎকালীন পরিবেশে তাঁহাদের পূর্বপুরুষদের বিভিন্ন কর্ম প্রচেষ্টার পরিচয় লাভ করিবেন। ইহা তাঁহাদের ঐতিহ্য অধিকতর গৌরবান্বিত করার প্রেরণা যোগাইতে পারে।

এই বইয়ে 'গৈলা' শব্দ তাহার প্রচলিত অর্থে অর্থাৎ গৈলা, মানসী

ফুল্লশ্রী, কালুপাড়া, উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ সিহিপাশা ও মুড়িহার, যে ৭টি মৌজা একত্রে 'গৈলা' নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ তাহাদের সকলগুলিই বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই বিবরণটি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে গ্রামের পরিচয়, অধিবাসীদের গ্রামে প্রথম আগমন কাল, দেবালয় ও পূজাপার্বণ, সংস্কৃত ও ইংরেজী শিক্ষার বিবরণ, আর্থিক অবস্থা, রাজনৈতিক আন্দোলন, সামাজিক রীতিনীতি ও বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানাদির সামগ্রিক ভাবে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে বিভিন্ন বাড়ির কথা লেখা হইয়াছে। পুস্তকের যাহাতে অযথা কলেবব বৃদ্ধি না হয় সে জন্য প্রথম খণ্ডে যাঁহাদের কথা লেখা হইয়াছে, দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁহাদের বিষয় লেখা হয় নাই, কেবলমাত্র নূতন কিছু থাকিলেই তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই কারণে প্রথম খণ্ড না পড়িয়া দ্বিতীয় খণ্ড পড়া সমীচীন হইবে না।

পুস্তকে জীবিত ও মৃত উভয় শ্রেণীর লোকেরই নাম আছে।

কি ভাবে এই ইতিবৃত্ত রচনার কাজ আরম্ভ হইল সে সম্বন্ধে কিছু বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। "গৈলা সম্মিলনী"র এক সাধারণ সভায় কালীপ্রসন্ন পিপলাই গ্রামের এইরূপ সাধারণ ইতিহাস প্রণয়ন ও প্রকাশ করার প্রস্তাব করেন ও সকলে আনন্দের সহিত উহা সমর্থন করেন। তদনুযায়ী প্রশ্নপত্রিকা প্রস্তুত করিয়া গ্রামবাসীদের মধ্যে বিতরণ করা হয় ও তথ্যাদি প্রেরণের জন্য আবেদন জানান হয়। তথ্য সংগ্রহের জন্য এক কমিটি গঠিত হয় ও হিরণ্ময় গুপ্ত ঐ কমিটির কর্মসচিব নির্বাচিত হ'ন। কমিটি গ্রামের অনেকের নিকট হইতে বংশ তালিকা, বংশ প্রসিদ্ধি, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ ও কিছু হস্ত লিখিত বিবরণ সংগ্রহ করেন কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রাচীন দলিলাদি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এই সব উপকরণের ভিত্তিতে সত্যেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত এক প্রাথমিক খসড়া রচনা করেন। উহার কোনও কোনও

অংশ পরিবর্তন করিয়া ও কতক নূতন বিষয় সন্নিবেশিত করিয়া কালী প্রসন্ন পিপলাই পরে এক নূতন খসড়া প্রস্তুত করেন। উহার চূড়ান্তরূপ দেওয়ার জন্য "গৈলা সম্মিলনী" তাহাব সাধারণ সভায় এক "ইতিহাস কমিটি" নির্বাচন করেন। ঐ কমিটিতে ছিলেন অমূল্য রতন গুপ্ত, কালী প্রসন্ন পিপলাই, নারায়ণ প্রসাদ দাশ গুপ্ত, শচীন্দ্র নাথ গুপ্ত, সত্যেন্দ্র নাথ দাশ গুপ্ত ও হিরণ্ময় গুপ্ত। কমিটি বিভিন্ন দিক হইতে পূর্বোক্ত খসড়া আলোচনান্তে উহার কিছু পরিবর্তন কবিয়া পাণ্ডুলিপির চূড়ান্ত রূপ দান করেনও তদনুসারে বর্তমান পুস্তক প্রকাশিত হয়। প্রকাশনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করিয়াছেন কর্মসচিব হিরণ্ময় গুপ্ত।

সংগৃহীত উপকরণের অপ্রতুলতা ও বর্তমান অবস্থায় কোনও কোনও বিবরণের সত্যতা যাচাই করার সুযোগ না থাকায় এই বইয়ে কিছু কিছু ভুল ভ্রান্তি বা কোনও বিষয়ে অসম্পূর্ণতা থাকা অসম্ভব নহে। আমাদের আশা ভবিষ্যতে এই সব ত্রুটি সংশোধন করিয়া গ্রামের এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হইবে।

এই পুস্তক প্রকাশের যাবতীয় খরচ দিয়াছেন গ্রামের অজিত কুমার গুপ্ত, অমূল্য কুমার গুপ্ত, কালীপ্রসন্ন পিপলাই, ডাঃ কুলভূষণ সেন গুপ্ত, ননীগোপাল ভট্টাচার্য, নরেশ চন্দ্র চাটার্জি, নারায়ণপ্রসাদ দাশ গুপ্ত, প্রভারঞ্জন দাশ গুপ্ত, বিজন বিহারী সেন, ভোলানাথ সেন, মাখন লাল দাশ গুপ্ত, মিহির কুমার দাশ গুপ্ত, শচীন্দ্র নাথ গুপ্ত, ডাঃ সুশীল চন্দ্র দাশ গুপ্ত ও হিরণ্ময় গুপ্ত। যাঁহারা উপকরণ বা অর্থদানে বা অন্যভাবে এই পুস্তক রচনা ও প্রকাশে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের গ্রামের অধিবাসী না হইয়াও কণিকা গুপ্ত প্রকাশন ব্যাপারে আমাদের অকুণ্ঠ সাহায্য করিয়াছেন, সে জন্য আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ।

এই পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ "গৈলা সম্মিলনী ছাত্র ভাণ্ডার" ও গ্রামের হিতকর অন্যান্য কার্যে ব্যয় করা হইবে।

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম খণ্ড

নাম ও ভৌগোলিক বিবরণ

গৈলা গ্রাম বরিশাল জিলার সদব মহকুমাব গৌরনদী থানায় অবস্থিত ও গ্রামটি বাঙ্গডোবা পবগণাব অন্তর্গত। ইহা বরিশাল শহর হইতে ২৬ মাইল উত্তর পশ্চিমে ও ফরিদপুর জিলার সীমানা হইতে ৬।৭ মাইল দূরে অবস্থিত। ১৮৭৩ সালের পূর্বে মাদাবিপুর মহকুমার অধিকাংশই বরিশাল জিলাভুক্ত ছিল, তখন গৈলা ছিল মাদারিপুর মহকুমার মধ্যে।

গৈলা, মানসী ফুল্লশ্রী, দক্ষিণ সিহিপাশা, মধ্য সিহিপাশা, উত্তর সিহিপাশা, কালুপাডা ও মুড়িহার নামীয় সাতটি মৌজা বর্ত্তমানে গৈলা নামে পরিচিত। আয়তনে এই বৃহত্তর গৈলা প্রায় সাড়ে চার বর্গমাইল। ১৯১১ সালের আদম শুমারিতে ইহার লোকসংখ্যা ১০৪৫০ নির্ধারিত হইয়াছিল (প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যা ২৪১১)।

এই মৌজাগুলি পরস্পব সংলগ্ন ও একটি সুসংবদ্ধ ও ঘন সন্নিবিষ্ট বসত বাডি পূর্ণ অঞ্চল। গ্রামের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটা না একটা বসত বাড়ি রহিয়াছে। উত্তর সিহিপাশা ও মানসী ফুল্লশ্রী মৌজার মধ্যে অল্প পরিমান চাষের জমি বাদে এই সব মৌজার মধ্যে আর চাষী জমি নাই। প্রান্তভাগে কিছু পরিমান জমি আছে; এক মৌজার সীমানা কোথায় শেষ হইয়াছে ও অপর মৌজা কোথায় আরম্ভ

হইয়াছে তাহা প্রায় কেহই জানে না। এই সমগ্র ভূখণ্ডটিকে দেখিলেই এক গ্রাম বলিয়া মনে হয় এবং বর্ত্তমানে একই সাধারণ চলতি নাম "গৈলা" বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার চারি পার্শ্বের মৌজায় প্রচুর পরিমান চাষী জমি রহিয়াছে।

মৌজাগুলির নামের উৎপত্তি কি ভাবে হইল ঠিক জানা যায় না। তবে গৈলা ও সিহিপাশা নামের সম্বন্ধে কিংবদন্তী এই যে মুসলমান অধিকার কালে এই অঞ্চলে সেনানিবাস ছিল ও গোলাবারুদ প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র তৈয়ার হইত এবং কালক্রমে গোলা হইতে 'গৈলা' ও সিপাহীর বাসস্থান হইতে "সিপাহীপাশা" ও পরে সিহিপাশা নামের উদ্ভব হইয়াছে।

মুসলমান শাসনের যুগে অনেক আঞ্চলিক শাসনকর্ত্তা কার্য্যতঃ স্বাধীন ভাবে রাজকার্য্য চালাইতেন ও সৈন্যবাহিনী গঠন করিতেন, গোলা বারুদ তৈয়ার করিতেন, পথ ঘাট নির্ম্মাণ করাইতেন ও আবশ্যক মত যুদ্ধাদির জন্য বড় বড় নৌকা (জাহাজ) তৈয়ার করাইতেন। গৈলার মধ্যে একটি পাড়াকে গোলার পাড় বলে। উহার পাশেই বড় একটি দীঘি। এখন তাহা নানাবিধ জলজ উদ্ভিদে পরিপূর্ণ। উহার নাম গোলার দীঘি বা আন্ধি। এই দীঘির পূর্ব পারেই বহু ঘর লৌহ কর্ম্মকার দের বাড়ি। এই সব কর্ম্মকারদের দক্ষতার খুব প্রসিদ্ধি ছিল। তাহারা গাঁদা বন্দুক তৈয়ারী করিতে পারিত। গ্রামের দক্ষিণভাগে অন্যান্য খাল অপেক্ষা প্রশস্ততর ও গভীরতর একটি খালকে "লস্করের আড়া" বলে। গ্রাম হইতে আনুমানিক এক ক্রোশ দূরে বিলের মধ্যে "জাহাজ ঘাটা" নামে একটি স্থানে আছে। এই সব কারণে এখানে এক কালে গোলা বারুদ তৈয়ারী ও সৈন্য সিপাহী থাকার কিংবদন্তীর মূলে সত্য থাকা অসম্ভব মনে হয় না। কিন্তু 'গোলার পাড়' ও 'গোলার আন্ধি' কালুপাড়া মৌজায় অবস্থিত এবং গৈলা মৌজার সীমানা হইতে কিয়ৎ দূরে। সে জন্য কেহ কেহ মনে করেন যে 'গোলা' হইতে 'গৈলা' নামের

উৎপত্তি হয় নাই, ঐ নাম 'কালুপাড়া' প্রভৃতির মত পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল।

ফুল্লশ্রী নামটি আমরা বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গল গ্রন্থে সর্ব প্রথম পাই। কবি নিজ বাসভূমি বর্ণনা করিতে বলিয়াছেন "পশ্চিমে ঘাঘর নদ পুবে ঘণ্ডেশ্বর, মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর।" "হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে বসতি বিজয়"। ঘাঘর নদ বর্ত্তমানে ফুল্লশ্রী হইতে পশ্চিমে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত ও ঘণ্ডেশ্বর নদী (সম্ভবতঃ পালরদি নদীর পূর্ব নাম) প্রায় চার মাইল পূর্বে। কবির পরিত্যক্ত বসত ভিটা প্রসিদ্ধ মনসা বাড়ি সংলগ্ন দীঘির দক্ষিণ পারে, মনসা মন্দিব হইতে আন্দাজ ১৫০।১৬০ হাত দূবে। উহা ও মনসা বাড়ি বর্ত্তমানে কালুপাড়া মৌজা মধ্যে অবস্থিত। মানসী ফুল্লশ্রী মৌজার প্রান্ত সীমানা উহা হইতে বেশি দূরে নয়। ফুল্লশ্রীর উল্লেখ দুই কারণে হইতে পারে (ক) হয়তো ফুল্লশ্রী নামের তখন সমধিক প্রসিদ্ধি ছিল অথবা (খ) কবির বসত বাটি তখন ফুল্লশ্রী মৌজার মধ্যে ছিল, পরে মৌজার সীমানা পরিবর্ত্তনে কবির ভিটা ও মনসা বাড়ি কালুপাড়া মধ্যে পড়িয়াছে। ফুল্লশ্রীকে মানসী ফুল্লশ্রী মৌজা বলা হয়। মনসা দেবীর নাম হইতেই মানসী নাম উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক। ঐ নাম ফুল্লশ্রীর সঙ্গে যুক্ত হইয়া ফুল্লশ্রীর নাম এখন মানসী ফুল্লশ্রী দাঁড়াইয়াছে। এই স্থানে তীর্থচিন্তামণির শ্লোক "শিবস্য চ যথা কাশী বিষ্ণোর্বৃন্দাবনং যথা, মানসী মনসা দেব্যা স্ত্রিপুর্যা ত্রিপুরঃ যথা" স্মরণ করা যাইতে পারে। ইহাতে মানসীকে মনসাদেবীর স্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই সব কারণে কেহ কেহ মনে করেন যে কবির বাড়ি ও মনসা বাড়ি তখন ফুল্লশ্রী মৌজা মধ্যে অবস্থিত ছিল।

উপরোক্ত সাতটি মৌজা মধ্যে "গৈলা" নাম কেন প্রসিদ্ধ হইল এবং সকলে এই নাম কেনমানিয়া লইল বলা কঠিন। যে সাতটি মৌজা গৈলা নামে অভিহিত তাহার দক্ষিণাংশে ক্ষুদ্র আয়তন নিয়া গৈলা মৌজা অবস্থিত। বিখ্যাত মনসাবাড়ি, গৈলা স্কুল, বাজার, পোস্ট

আফিস, কবীন্দ্র কলেজ, সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি বা প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী তালুকদাবগণেব ভদ্রাসন বাড়ি কোনটাই গৈলা মৌজায় অবস্থিত নয় কিন্তু অন্যান্য সব মৌজাব নাম প্রায় ডুবিয়া গিয়াছে এবং গৌববে গৈলা সর্ব্বোচ্চ মর্য্যাদা লাভ কবিযাছে। দক্ষিণ সিহিপাশা ও মধ্যসিহিপাশা নাম একেবাবে লোপ পাইযাছে। কালুপাড়া নাম পূবসেন পাড়াব সেনদেব হইতে দুইটি সেনেব বাড়িব পৃথক পবিচয দেওযাব জন্য কালুপাড়া সেনেব বাড়ি নামে বাঁচিযা আছে। উত্তব সিহিপাশা মৌজা শুধু সিহিপাশা নামে পবিচিত। দুই প্রান্তে স্থিত ফুল্লশ্রী ও মুডিহাব নাম এখনও স্থানীয ভাবে চলিতেছে।

গৈলা নামেব প্রসিদ্ধিব কাবণ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে গৈলা বাজাব ও গৈলা পোস্ট আফিস হইতে 'গৈলা' নামেব প্রচলন হইযাছে। কিন্তু বাজাব বা পোস্ট আফিস কোনটাই গৈলা মৌজায অবস্থিত নহে। উভযেই কালুপাড়া মৌজাব মধ্যে। সুতবাং এ মত যুক্তিসংগত নহে। ববং মনে কবা যাইতে পাবে যে বাজাব ও পোস্ট আফিস স্থাপনেব পূর্ব হইতেই গৈলা নামেব প্রচলন ছিল।

কেহ কেহ মনে কবেন অন্যান্য মৌজাব নাম অপেক্ষা 'গৈলা' উচ্চাবণে সহজ বলিয়াই সাধাবণ নাম হিসাবে চলিযাছে। কিন্তু শুধু এই কাবণেই লোকে নিজেব গ্রামের নাম কাযত পবিবর্তন কবিবে কিনা বিবেচনাব বিষয়।

কারণ যাহাই হউক উপবোক্ত মৌজাগুলি বুঝাইতে 'গৈলা' এই সাধাবণ নাম চলিযা গিযাছে, কিন্তু কবে যে ঐ নাম প্রথম প্রচলিত হইল তাহা ঠিক জানা যায না। বিজয গুপ্তের সময় প্রচলন ছিল না বলা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দেব শেষপাদের পুরানো দলিলে লোকে নিজের সাকিন লিখিতে প্রথমে মৌজার নাম (যেমন সাং দক্ষিণ সিহিপাশা) লিখিয়া পরে "ডাক নাম গৈলা" লিখিযাছেন এরূপ দেখা যায। পবে ক্রমে ক্রমে প্রথমে মৌজার নাম লেখাও বন্ধ হইয়া

শুধু 'গৈলা' নাম চলিতেছে। মনে করা যাইতে পারে অষ্টাদশ শতাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে বা তাহার ও পূর্বে সাধারণ নাম হিসাবে 'গৈলা' শব্দের ব্যবহার চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

এই বইতে উপরোক্ত সাতটি মৌজা সমগ্রভাবে বা ইহার যে কোনও অংশ বুঝাইতে 'গৈলা' শব্দ প্রয়োগ করা হইবে। কোনও সময় কোনও পাড়া বুঝাইতে স্থানীয় নাম ও ব্যবহাব করা যাইতে পারে।

পাদটীকা :

উপরে মানসী ফুল্লশ্রী মৌজার গৈলা জনপদের অন্যতম মৌজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কিছুকাল যাবৎ ফুল্লশ্রীর কেহ কেহ বলিতেছেন যে ফুল্লশ্রীর একটি স্বাধীন পৃথক সত্তা আছে এবং উহা কখনও গৈলার অঙ্গীভূত হয় নাই বা বৃহত্তর গৈলা নামে পরিচিত ছিল না। সুতরাং মানসী ফুল্লশ্রী মৌজাকে গৈলা জনপদের অন্যতম মৌজা বলিলে ভুল হইবে।

উপরোক্ত মতের বিষয়ে আমরা কোনও বিচার বা বিতর্কে না যাইয়া শুধু এইমাত্র বলিতে চাই যে, ফুল্লশ্রীর মজুমদার বাড়ি, দাশ ঠাকুরদের বাড়ি, কবিরাজ বাড়ি, নরসিংহ দাশের বাড়ি, বৈদিকবাড়ি, চন্দ্রকান্ত বিস্তারত্নের বাড়ি, দারোগা বাড়ি গৈলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সুসংবদ্ধ অঞ্চল এবং ঐ সকল বাড়ির ও মানিক সেনের, সত্য সেনের কালী প্রসন্ন মুখার্জির ও সোমদ্দার বাড়ির লোকেরা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ভাবে ও শিক্ষা ব্যাপারে বরাবরই বৃহত্তর গৈলার লোকদের সঙ্গে একত্রে সমগ্র গ্রামের জন্য কাজ করিয়া গিয়াছেন এবং তাহারা গৈলার লোক বলিয়া সাধারণের মধ্যে পরিচিত ছিলেন। তাহাদের মৌজাকেও বৃহত্তর গৈলার অন্তর্গত ধরা হইত। ইহার বিরুদ্ধে পূর্বে কিছু শোনা যায় নাই।

গভর্ণমেণ্টও মানসী ফুল্লশ্রী মৌজাকে গৈলা জনপদের অন্যতম মৌজা বলিয়া পরিগণিত করিত। (১)

এ অবস্থায় বর্তমানে কাহারও কাহারও আপত্তি সত্ত্বেও আমরা উপরোক্ত মৌজাকে গৈলার অংশ বলিয়া বর্ণনা করা ও তাহার অধিবাসীদের বিবরণ এই বইতে দেওয়া যুক্তি সঙ্গত মনে করিয়াছি।

---

(১) Bengal District Gazetteer (Backerganj), published by the Bengal Secretariat in 1918.

প্রাকৃতিক অবস্থা

যে ভূখণ্ডে গৈলা অবস্থিত তাহা নিম্ন জলাভূমি বা বিলাঞ্চল। বৎসরের প্রায় পাঁচ মাস কাল উহা জলে প্লাবিত থাকে এবং হেমন্ত ঋতুর প্রারম্ভ হইতে জল কমিতে থাকে এবং শীতের শেষে সমগ্র ভূখণ্ড আবার আত্ম প্রকাশ করে। বর্ষা ও শরৎকালে এই জল কৃষ্ণবর্ণ ও এত স্বচ্ছ হয় যে তখন তলদেশ পর্যন্ত দেখা যায়।

এখানকার জলের গতি দক্ষিণমুখে, অসংখ্য খাল ও ডাঙ্গার মাধ্যমে তাহা ধামুরা ও ওটরার বড় খালের দিকে প্রবাহিত হয়। ঐ খাল ক্রমে প্রশস্ত হইয়া নদীতে পরিণত হইয়াছে। গৈলা গ্রামের মাত্র কিয়দংশ জলই পূর্ব দিকে পালরদির নদীতে গিয়া পড়ে।

গৈলায় গভীর পুষ্করিণী খনন কালে দেখা গিয়াছে যে প্রথম স্তরের পলি মাটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। এই স্তর বিলান মাটির। দ্বিতীয় নিম্নস্তরে সূক্ষ্ম কাল রঙের বালি এবং তন্নিম্নে সাদা সূক্ষ্ম বালি। আরও গভীর দেশে সাদা বালি মিশ্রিত জল এবং তারপর আর তলদেশে খনন কার্য অসম্ভব।

ভদ্রাসন বাড়িগুলি পরিখা বা ছোট খাল (স্থানীয় ভাষায় ডাঙ্গা ও বেড়) দ্বারা বেষ্টিত। বর্ষাকালে প্রত্যেক বাড়ির ঘাটেই নৌকা পৌছে। শীত ও গ্রীষ্মকালে সবগুলি খাল নৌকা চলাচলযোগ্য থাকে না। ঐ সব ডাঙ্গার পাড়ে অসংখ্য হিজল, জারুল, জিন, মাদার ও বন্যা

গাছ ও বসতখণ্ডে কড়াই, ছাইতান (ছাতিম বা সপ্তপর্ণী) দেবদারু এবং নানাবিধ ফলবান বৃক্ষের সমাবেশে দূর হইতে এই অঞ্চলটিকে ক্ষুদ্র জঙ্গলের ন্যায় দেখা যায়। রাস্তার পাশে মাঝে মাঝে বিরাট বট, অশ্বত্থ, শিমুল, তাল, অশোক ও বকুল প্রভৃতি বৃক্ষ সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ভদ্রাসন বাটি পৌঁছিতে হইলে অনেক সময়, বিশেষতঃ বর্ষাকালে চার (বাঁশের সাঁকো বা পুল) এর উপর দিয়া যাইতে হইত। পূর্বে প্রায় প্রতি গৃহস্থেরই বহির্গমনের জন্য একখানি ছোট নৌকা থাকিত। কখনও কখনও দেখা যাইত নৌকার পরিবর্তে তালের ডোঙ্গা। প্রায় সকলেই সন্তরণপটু ছিল।

পরবর্তী কালে গৈলা হইতে পালবদি নদী পর্যন্ত খাল ও আমবৌলা খাল এবং আরও পরে উত্তর প্রান্তে রাজিহারের খাল খননের ফলে জল নিকাশের পথ সুগম হইয়াছে এবং ভূমির উচ্চতা ও উর্বরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গৈলা জনপদে অসংখ্য পুষ্করিণী ও সুবৃহৎ দীর্ঘিকা বিদ্যমান। সপ্তদশ শতাব্দীতে এই অঞ্চলে ছবি খাঁ (সফি খাঁ ?) নামে একজন শাসনকর্তা ছিলেন। তাহার নামীয় আন্ধি বা প্রাচীন দীঘি এখনও আছে। ইহা ভিন্ন 'রাজার মায়ের আন্ধি' 'গোলার আন্ধি', দাশের বাড়ির দীঘি, সিংহিপাশা কবিরাজ বাড়ির দীঘি, রামনাথ দাশের বাড়ির দরজার দীঘি, পুরান বাড়ীর দীঘি, গুণদির দীঘি, ঘটকের পারের আন্ধি, মজুমদার বাড়ির দীঘি, হরিদাসের আন্ধি, বিজয় সেনের দীঘি, তুতুহারের আন্ধি, গোকুল সেনের দীঘি, যমদ্বারের পাড়ের দীঘি, দত্ত খাঁর পাড়ের ও ইন্দ্র সেনের পাড়ের ও তর্কবাগীশের বাড়ির দীঘি প্রভৃতি আছে।

এককালে এই সমস্ত জলাশয়গুলি কেবল যে পানীয় জল সরবরাহ করিত তাহা নহে, ইহাতে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য জন্মিত। মৎস্য

জন্মাইবার উপায় স্বরূপ এই সমস্ত দীঘির সহিত 'যান' বা ছোট খালের সাহায্যে বাহিরের বিল বা খালের সংযোগ সাধন করা হইত। কোনও সময়ে বা তাল গাছের খোল দ্বারা যোগ রাখা হইত। ইহাতে বর্ষাগমে জল প্লাবনের সময় বিভিন্ন রকম মৎস্যাদির বহুপোনা (বাচ্চা) জলাশয়গুলিতে আসিয়া প্রবেশ করিত। আর বাহিরের জলের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা হওয়ায় জলটি বেশ পরিষ্কার থাকিত ও পান ও স্নানার্থীদের বেশ সুবিধা হইত।

এই সমস্ত পুরাতন জলাশয়গুলি খননের পর বহুকাল গত হওয়ায় ও মালিকদের মধ্যে নানা ভাগ ও আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হওয়ায় সংস্কার অভাবে সরোবরগুলি এখন বহুবিধ জলজ 'ধাপ', নলবন, কচুরি পানা প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ হইয়া ব্যবহারের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা প্রচুর। কোনও কোনও বৃহৎ জলাশয়ের অংশ চাষী জমিতে পরিণত হইয়াছে। (যেমন গোকুল সেনের দীঘি, তুতুহারের আন্ধি প্রভৃতি) কোনও দীঘির এখন নাম মাত্র অবশিষ্ট আছে, জলাশয় আর নাই যেমন "দীঘির পাড"। কোনও কোনও বাড়ির সংলগ্ন দীঘি বা বৃহৎ পুকুর উপযুক্ত ভাবে রক্ষিত ও নিত্য কার্যে ব্যবহৃত হয়।

চারিদিকে খাল পুষ্করিণী, গাছপালা প্রভৃতি থাকায় গৈলার আবহাওয়ায় একটা সমতা লক্ষিত হইত এবং গরমের সময় অত্যধিক গরম বা শীতের সময় অসহ্য শীত অনুভূত হইত না। গৈলা গ্রামের বারিপাত, তাপমান প্রভৃতির পৃথক তালিকা রাখা না হইলেও বরিশাল শহরের তালিকা হইতে ইহার কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। ১৮৯২—১৯০১ সালে এই রিপোর্টে দেখা যায় বরিশাল শহরে বৃষ্টিপাত ছিল গড়ে ৬৯.০৮ ইঞ্চি এবং তাপ ছিল গড়ে ৭৭ ডিগ্রী ফারেণ হাইট। সর্বোচ্চ তাপ ১০১.৮ এবং সর্বনিম্ন তাপ ৪২.৪ ডিগ্রী। মে

মাসের গড় তাপ ৮৩ ডিগ্রী এবং ডিসেম্বর মাসের গড় তাপ ৬৮ ডিগ্রী ফারেনহাইট। (১)

যোগাযোগ ব্যবস্থা —রাস্তা ও খাল

সপ্তদশ শতাব্দে এতদঞ্চলের তৎকালীন শাসনকর্তা ছবি খাঁ বাখরগঞ্জ জিলার উত্তরপশ্চিমাংশে, বিশেষতঃ বর্তমান গৌরনদী থানা ও কোটালিপাড়া অঞ্চলে, বহু জাঙ্গাল (রাস্তা) নির্মাণ করিয়াছিলেন। এগুলি বেশ প্রশস্ত ও উচু ছিল। পরে এইগুলি উপযুক্তভাবে সংরক্ষিত না হওয়ায় অনেকাংশ ভাঙ্গিয়া যায় ও পার্শ্ববর্ত্তী ভূমির মালিকেরা কোনও স্থলে সম্পূর্ণ জাঙ্গাল কোথায় বা তাহার কতকাংশ কাটিয়া সমতল করিয়া নিজেদের জমির সামিল করিয়া নিয়াছে। এই সব জাঙ্গালগুলি "ছবি খাঁর জাঙ্গাল" নামে পরিচিত। এতদঞ্চলে ছবি খাঁই প্রথম রাস্তা নির্মাতা বলিয়া স্বীকৃত। এই সব জাঙ্গালের শেষ চিহ্ন এখনও স্থানে স্থানে আছে। জাঙ্গালের দুই পাশে ছোট বড় অনেক গাছ ছিল। কোথায়ও বা দীঘি আছে। গ্রামের ছবি খাঁর দীঘির কথা পূর্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে।

গৈলা গ্রামে ছবি খাঁর নামে পরিচিত তিনটি জাঙ্গালের চিহ্ন আছে।

(১) Bengal District Gazetteer (Backerganj), published by the Bengal Secretariat in 1918.

একটি রামনাথ দাসের হাটখোলা হইতে দক্ষিণ দিকে ধামুরাও ওটরার দিকে গিয়াছে, একটি পশ্চিম দিকে কোটালিপাড়ার মধ্য দিয়া আরও পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়াছে, তৃতীয়টি গৈলা হইতে পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরবর্তী কালে তৈরী গৈলা-গৌরনদী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড রাস্তা স্থানে স্থানে শেষোক্ত এই জাঙ্গালেব উপব নির্মিত হইয়াছে।

গ্রামে কিংবদন্তী এই যে প্রজাসাধাবণেব জন্য ছবি খাঁ এই সব জাঙ্গালের পাশে সোনার মোহব পূর্ণ মাটির কলসী গোপনে পুতিয়া রাখিতেন এব বলিতেন যাহার অদৃষ্টে থাকে সে এই ধন পাউক ও অনেকে এই গুপ্ত ধন পাইয়া ধনী হইয়াছে। কেহ হঠাৎ বড লোক হইলে লোকে বলাবলি কবিত যে লোকটি ছবি খাঁব ধন পাইয়াছে। এই প্রবাদ কতটা সত্যমূলক বলা যায় না, তবে একথা ঠিক যে কয়েক শতাব্দীব্যাপী মুসলমান শাসন কালেব তিনিই এ অঞ্চলেব একমাত্র শাসনকর্তা যাহাকে লোকে এখনও শ্রদ্ধাব সহিত স্মবণ করে।

উনবিংশ শতাব্দের তৃতীয় পাদের শেষ দিকে এবং চতুর্থ পাদে বকশী বাড়ির রজনীকান্ত দাশ ববিশাল ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডেব ভাইস চেয়ারম্যান থাকা কালে তাহাব উদ্যোগে বরিশাল ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে গৈলা-গৌরনদী (পালরদি) বোড ও খাল ও আমবোলা রোড ও খাল নির্মিত হয়। এই নিম্ন বিলাঞ্চলে রাস্তা নির্মাণের জন্য প্রচুর মাটির দরকার। এই মাটির প্রয়োজনেই রাস্তার পাশে খাল খনন অপরিহার্য হইত।

গৈলা-গৌরনদী রোড ও খাল চাঁদসী ও বানিয়াস্থরির মধ্য দিয়া বরিশাল-ভুরঘাটা-মাদারিপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা ও খালের সহিত পালরদিতে মিলিত হয়। এই সংযোগস্থল হইতে সোজা পূর্বদিকে এক মাইল দূরবর্তী পালরদি নদী পর্য্যন্ত (যেখানে থানা ও ষ্টীমার ঘাট)

এই রাস্তা ও খাল গিয়াছে ইহাই গৈলার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী ষ্টীমার স্টেশন। বরিশাল জিলার কোন অংশে রেলপথ নাই। এই ষ্টীমার স্টেশনই বাহিরের ও বরিশাল শহরের সঙ্গে গ্রামের প্রধান যোগসূত্র।

গৈলা গৌরনদী রোড প্রজা ও মালিকগণের বিনামূল্যে স্বেচ্ছা প্রদত্ত জমির উপর নির্মিত ও স্থানে স্থানে বাঁকা। চাদসীতে এই রোডের সংলগ্ন খালের এক অংশ প্রশস্ততর হইয়া রামসিদ্ধি গ্রামের মধ্য দিয়া টরকিবন্দরের নিকট পালরদি নদীতে পড়িয়াছে। পরবর্ত্তী কালে চাঁদসীর এই সংযোগস্থল হইতে আর একটি খাল সিহিপাশার উত্তর দিয়া বাজিহার পর্য্যন্ত কাটান হইয়াছে।

আমবৌলা রোড ও খাল গৈলা গৌরনদী রোড ও খাল হইতে গৈলা স্কুলের সম্মুখ দিয়া পশ্চিম দিকে বরিশাল জিলার সীমান্ত আমবৌলা হইয়া পশ্চিমে ঘাঘর নদী পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তা ও খাল কোটালি পাড়া ও খুলনা জিলার সঙ্গে গ্রামের সংযোগ করিয়াছে।

বর্ত্তমান শতাব্দে আর একটি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড রোড রামনাথ দাশের হাটখোলা হইতে সোজা পরদিকে সাওড়া ও বিজয়পুরের মধ্য দিয়া বরিশাল-মাদারিপুর রোডের সহিত পালরদিতে মিলিত হইয়াছে। এই রাস্তা 'সাওড়া রোড' নামে প্রসিদ্ধ। এই রাস্তা দ্বারা গৈলা হইতে থানা ও ষ্টীমার ষ্টেশনের দূরত্ব অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে।

উপরোক্ত ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা ও খাল দ্বারা গ্রাম হইতে বরিশাল শহরের ও বাহিরের সঙ্গে সংযোগ পথ সুগম হইয়াছে। গৈলা হইতে বিভিন্ন খাল পথে বহুসংখ্যক লোক- নৌকাযোগে যাতায়াত করে। হেমন্ত ও শীত ঋতুতে কোনও কোনও খালে (যেমন বানিয়াস্থরি, মাহিলাড়া, লাকুটিয়া) ভাটার সময় জল এত কমিয়া যাইত যে নৌকার তলদেশ মাটি স্পর্শ করিত। তখন যাত্রীদের নৌকা হইতে নামিতে হইত। যখন তাহাতেও নৌকা চলিত না তখন পুরুষ যাত্রীরা মাঝির

সঙ্গে একত্র হইয়া নৌকা টানিয়া আগাইয়া দিত। অনেক সময় কয়েক খানা নৌকা এক জায়গায আটকাইয়া পডিত। তখন সব নৌকার যাত্রীরা একত্র হইয়া ক্রমে ক্রমে এক এক নৌকা টানিয়া নিত। এই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হইলে পববর্তী জোযাবেব জন্য অপেক্ষা কবিতে হইত।

ববিশাল হইতে গৈলা পর্যন্ত যাত্রীবাহী "গহনাব নৌকা" যাতায়াত কবিত। কিছুকাল এই জল পথে মটব লঞ্চও চলিয়াছিল।

শেষের দিকে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডেব বাস্তা দিয়া বরিশাল হইতে পালরদি ভুবঘাটা পয্যন্ত 'বাস' যাতায়াত কবিত। পালবদিতে বাসেব ষ্টেশন গৈলা হইতে প্রায় ৩ মাইল দূববর্তী ছিল।

এ অঞ্চলে গোরুব গাডীব প্রচলন ছিল না।

গৈলা হইতে কলিকাতা যাইতে হইলে পাটগাতি বা বরিশাল হইয়া যাইতে হইত। লোকে গৈলা হইতে রাত্রে নৌকাযোগে রওয়ানা হইয়া সকালে পাটগাতি পৌছিত, এবং তথায খাওযা দাওয়া করিয়া বেলা ২।৩টায ষ্টীমাব ধবিযা বাত্র ৮।৯টায খুলনা ও তথা হইতে ট্রেনযোগে তারপব দিন ভোবে কলিকাতা পৌছিত। পাটগাতিব পথে প্রচুর মাছ পাওয়া যাইত এবং পাটগাতিতে রান্না ও খাওযা ঐ পথে যাতায়াতের বড আকর্ষণ ছিল।

বরিশালের পথে যাইতে হইলে গৈলা হইতে প্রথমে নৌকাযোগে ১২।১৪ ঘণ্টায বরিশাল পৌছিতে যাইত। ষ্টীমারে পালরদি হইতে ৫।৬ ঘণ্টায বরিশাল পৌছান হইত—মোটরে পালরদি হইতে লাগিত ৩।৪ ঘণ্টা। বরিশাল হইতে খুলনা ষ্টীমারে ১০।১২ ঘণ্টার পথ, সকালে ও সন্ধ্যায় ষ্টীমাব ছাডিত। খুলনা হইতে পরে মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেন যোগে কলিকাতা যাইতে হইত।

ঢাকা যাইতে হইলে পালরদি হইতে সকালে ষ্টীমারে রওয়ানা হইয়া নন্দীবাজাবে ষ্টীমাব বদল করিয়া বাত ৯টায় ঢাকা পৌছান যাইত।

গ্রামের ভিতরের খাল ও রাস্তা

গৈলার অসংখ্য ছোট ছোট খালের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নহে। কয়েকটি মাত্রের পরিচয় দেওয়া হইল

১। উত্তরবাংশে সিহিপাশার মধ্য দিয়া একটি খাল মনসা বাড়ির নিকট দিয়া উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছে।

২। দাশের বাড়ির দোল খোলার পূর্ব্বদিক দিয়া একটি খাল উত্তর দিকে সিহিপাশার দিকে গিয়াছে। এই খাল প্রথমোক্ত খালের সহিত মিশিয়াছে।

৩। গৈলা-পালরদি খাল হইতে একটি খাল বকশী বাড়ি পর্যন্ত গিয়াছে।

৪। আমবৌলা খাল ও পালরদি খালের সংযোগ স্থল হইতে স্কুলের উত্তর দিয়া একটি খাল দাশের বাড়ির দক্ষিণ দিয়া ফুল্লশ্রীর পূর্ব প্রান্তে আবার আমবৌলা খালে পড়িয়াছে।

৫। গৈলা-পালরদি খাল হইতে রাবেন্দ্র বাড়ির দক্ষিণ দিয়া পুরান বাড়ির উত্তরে পূর্বাভিমুখে ও রামনাথ দাশের বাড়ির দরজা হইয়া একটি খাল দক্ষিণ দিকে, কর্ম্মকার বাড়ি, চৌধুরী বাড়ি ও ভরদ্বাজের বাড়ির পূর্ব দিয়া লস্করের আড়ায় পড়ে। ঐ খাল ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে দুই পাঠক বাড়ির মধ্য দিয়া মুড়িহার ও পতিহার মৌজার মধ্য দিয়া দক্ষিণে ধামুরার দিকে চলিয়া গিয়াছে।

৬। কালুপাড়া সেন ও শঙ্কর গুপ্তের বাড়ির মধ্যবর্তী একটি খাল পালরদি খাল হইতে দক্ষিণ বরাবর, বেজের পাড়ের পূর্ব্ব ও পিপলাই বাড়ির প্রথমে পশ্চিম ও পরে পিপলাই ও চৌধুরী বাড়ীর দক্ষিণ দিয়া উপরোক্ত ৫নং খালে ভরদ্বাজের বাড়ির সামনে গিয়া মিলিত হইয়াছে।

৭। এই খালের আর একটি শাখা পিপলাই বাড়ির দক্ষিণ পশ্চিম দিয়া তর্কবাগীশের বাড়ির দক্ষিণে মাঠের মধ্যে পড়িয়াছে।

৮। উপরোক্ত ৬ নং খাল হইতে পূর্বাভিমুখী একটি খাল ডাঃ চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তীর বাড়িব ও ছোট নয়া গুপ্তেব বাড়িব দক্ষিণ দিয়া কর্ম্মকাব বাড়িব নিকট পূর্বোক্ত ৫নং খালে মিশিয়াছে।

পূবে তিনটি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডেব বাস্তার কথা বলা হইয়াছে। বিগত শতাব্দে বকশী বাড়িব বজনীকান্ত দাশেব প্রচেষ্টায় ইহা ভিন্ন বরিশাল সদব লোকাল বোর্ড হইতে গ্রামে অনেক লোকাল বোর্ড বোড তৈযাব হইযাছিল। বর্ত্তমান শতাব্দেও ঐরূপ কয়েকটি বাস্তা তৈযাব হইযাছে। তাহাদেব কযেকটিব পবিচয় নিচে দেওয়া হইল।

১। গৈলা বাজাব হইতে উত্তব দিকে একটি বাস্তা গিযা মনসা বাড়ি, কবিবাজ বাড়ি, বতন সেনেব বাড়ি, তুহি সেনেব বাড়ি, যুগল দাশেব বাড়ি ও বামমোহন দাশেব বাড়ি বাজাবেব কাছে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডেব বাস্তাব সঙ্গে যুক্ত কবিয়াছে।

২। বাজার হইতে দাশেব বাড়িব মধ্য দিয়া পশ্চিম দিকে সোজা একটি বাস্তা গিয়া ফুল্লশ্রীতে আমবৌলা বোডেব সহিত মিলিত হইয়াছে।

৩। গৈলা-গৌরনদী বোড হইতে একটি বাস্তা বকশী বাড়ি হইযা উপরোক্ত ১নং বাস্তাব সহিত যুক্ত হইয়াছে।

৪। গৈলা-গৌরনদী রোড হইতে একটি রাস্তা বাবেন্দ্র বাড়িব দক্ষিণ দিয়া পূর্ব্বদিকে বামনাথ দাশের বাড়ি পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং এই রাস্তার মধ্যস্থল হইতে একটি বাস্তা দীঘির পাড পর্য্যন্ত গিয়াছে।

৫। রামনাথ দাশের বাড়ির দরজা হইতে একটি রাস্তা দক্ষিণ দিকে কর্ম্মকার বাড়ির পূব দিযা মঠ বাড়ির উত্তর পশ্চিম সীমানা পর্য্যন্ত গিয়া সেখান হইতে প্রথমে পূর্ব দিকে মঠবাড়ির উত্তর ও আলোক গুপ্তের বাড়ির দক্ষিণ দিয়া ও পরে সেন পাড়ার ভিতর দিয়া দক্ষিণ দিকে চলিয়া গিয়াছে।

৬। আমবৌলা রোড হইতে গৈলাস্কুলের সম্মুখ দিয়া পূর্ব্বাভিমুখী একটি রাস্তা কালুপাড়া সেনদের দুই বাড়ির মধ্য দিয়া, ছোট নয়া গুপ্তের বাড়ি ও রামনাথ দাশের বাড়ির দক্ষিণ দিয়া রামনাথ দাশের হাটখোলায় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের পূর্ব্বোক্ত সাওড়া রোডের সহিত মিলিয়াছে। এই রাস্তাটিকে ভিলেজ রোড (village road) বলা হইত।

৭। আমবৌলা রোড হইতে স্কুলের নিকট দিয়া পূর্ব দক্ষিণ কোণে তর্কবাগীশের বাড়ি পর্য্যন্ত একটি রাস্তা গিয়াছে।

৮। কবীন্দ্র বাড়ির পূব দিয়া একটী রাস্তা উত্তর দিকে রামনাথ দাশের হাটখোলার পূর্ব দিকে সাওডা রোডের সহিত মিলিত হইয়াছে।

ইহা ভিন্ন গ্রামের অধিবাসীরাও নিজেদের ব্যয়ে বহু ছোট ছোট রাস্তা নিজ নিজ বাড়ি হইতে তৈয়ার করিয়া ঐ সব ডিষ্ট্রিক্ট ও লোকাল বোর্ডের রাস্তার সঙ্গে সংযুক্ত করে। ফলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে প্রায় সমস্ত বাড়িগুলি রাস্তা দ্বারা মোটামুটি ভাবে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া যায় এবং বারমাসই লোকে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করার সুযোগ পায়। রাস্তা করার সময় ছোট ছোট সব খালের উপর বাঁশের সাঁকো নির্ম্মিত হইত। তাহাতে জলে নৌকা চলাচল অব্যাহত থাকিত।

বর্তমান অধিবাসীবৃন্দ ও তাহাদের আগমন কাল

গ্রামে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, কর্মকার, কুম্ভকার, গোয়ালা, নরসুন্দর, মালাকার, নট্ট, বাজনদার, শুক্লদাস (রজক), ভুঁইমালী, নমশুদ্র, খৃষ্টান ও মুসলমান প্রভৃতি বহুসংখ্যক সম্প্রদায়ের লোকের বাস। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যজাতি সংখ্যায় সর্বাধিক। তাহার পর কায়স্থ, কর্মকারাদি। নমশূদ্র ও মুসলমানের সংখ্যা বেশী নয়। খৃষ্টানদের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম।

ব্রাহ্মণদের মধ্যে অধিকাংশই রাঢ়ী শ্রেণীয়। তন্মধ্যে কর্ণপুর ভট্টাচার্য (তর্কবাগীশ বংশ) পঞ্চানন ভট্টাচার্য, বঙ্গবাস ও কুন্দগ্রামীগণ বংশজ; ডিংসাই, পিপলাই, সিমলাই, মিশ্র ও পুষিলাল বংশ শ্রোত্রিয়। ব্যানার্জি, মুখার্জি, চাটার্জি ও গাঙ্গুলীগণ উপরোক্ত শোত্রিয় ও বংশজদের দৌহিত্র বংশীয় (এবং অধিকাংশই ভঙ্গ)। ব্রাহ্মণদের মধ্যে বঙ্গবাস ও ডিংসাই বংশ সংখ্যায় সর্বাধিক। বৈদিক ব্রাহ্মণদের বাড়ির সংখ্যা ১৫।১৬ খানা, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, পিপলাই ও মিশ্রদের কয়েকখানা বাড়ি, বারেন্দ্র শ্রেণীর মাত্র তিনখানা বাড়ি আছে।

বৈদ্যদের মধ্যে ভবদাশ, বিনায়ক সেন ও কায়ুগুপ্ত বংশ সংখ্যায় বেশি এবং তাহাদের বাড়িও অনেক। নিমদাশ, ভুহিসেন, ভরদ্বাজ ও

চিন্তামণি দাশ বংশেব, রামমানিক্য সেনের ও দাশঠাকুবদেব একাধিক বাড়ি। নবসিংহ দাশ, নয দাশ, শিযাল সেনদেব একখানা করিয়া বাড়ি। ইহা ভিন্ন মুনশী বাড়ি, কবীন্দ্র বাড়ি প্রভৃতি বাড়ি রহিয়াছে।

কায়স্থদেব মধ্যে তপাদাব, কব, দত্ত, দেব, দাস, নন্দী, দে, নাগ, ভদ্র প্রভৃতি বংশ আছে। কর্মকাবদেব মধ্যে বিভিন্ন বংশ আছে। তুই এক বংশ মজুমদাব উপাধিধারী।

উপবোক্ত নানাজাতিব পূর্বপুরুষগণ একই সমযে গৈলা আসিযা বসতি আবম্ভ কবে নাই। বিভিন্ন সমযে ও উপলক্ষে আসিযাছে।

বর্তমান অধিবাসীদেব পূবপুরুষদেব গ্রামে প্রথম আগমনকাল আলোচনা কবিতে গিযা আমাদেব প্রথমেই বলিতে হয় যে আমরা প্রায় কোনও বংশেবই প্রাচীন বংশ তালিকা পাই নাই। যাহা পাইযাছি তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কোনও কোনও বংশেব বিভিন্ন রকমেব বংশ তালিকাও পাইযাছি। ঐ সব ভিন্ন ভিন্ন বংশ তালিকা আলোচনা কবিযা যেটা নির্ভবযোগ্য মনে হইযাছে তাহার ও বংশ প্রসিদ্ধির উপর নিভব কবিতে হইযাছে। কাল নির্ণয কবিতে গড়ে প্রত্যেক পুরুষে ২৫ বৎসব ধবা হইযাছে।

ভবদাশ বংশ—এ বংশেব অনেক বাড়ি। বাঘবেন্দ্র দাশ ও ত্রিলোচন তুই ভ্রাতা এই কয় বাড়িব আদি পুরুষ। বাঘবেন্দ্রেব সন্তানগণ দাশেব বাড়ি (৪ হিস্যা) বামমোহন দাশেব বাড়ি, দীনবন্ধু দাশেব বাড়ি (পুরান বাড়ি), রামনাথ দাশেব বাড়ি, হবিপ্রসাদ দাশেব বাড়ি, খাজাঞ্চি বাড়ি ও দীঘির পাড়েব তিন বাড়িতে বাস কবেন। ত্রিলোচন দাশের সন্তানগণ যুগল দাশের বাড়ি, কবিরাজ বাড়ি, বক্‌শী বাড়ি ও শিবনাথ দাশেব (শিবাই দাশেব) বাড়িতে বাস করেন। রাঘবেন্দ্র ও ত্রিলোচনের পিতা ছিলেন হেরম্ব চন্দ্র ও ভগিনী রুক্মিণী দেবী। এখানে আসার পর তাঁহার (রুক্মিণী দেবীর) এখানকাব সনাতন গুপ্তের সহিত বিবাহ হয়। তাঁহাদের পুত্র বিজয় গুপ্ত (মনসামঙ্গল গ্রন্থ প্রণেতা)। এ পর্যন্ত

ইহাদের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু কে প্রথম এবং কি উপলক্ষে গৈলা আসিয়াছিলেন সে বিষয়ে বিভিন্ন মত আছে।

এক মতে হেরম্বচন্দ্র মুসলমান যুগে নায়েব তহশীলদার পদে নিযুক্ত হইয়া প্রথমে গৈলা আসেন এবং বর্তমান বাজার মা'র আন্ধির পাড়ে কোনও স্থানে কাছারি বাড়ি নির্মাণ করিয়া তাঁহার কাজ আরম্ভ করেন এবং পরে স্ত্রী, পুত্র কন্যাদি সহ বর্ত্তমান দীনবন্ধু দাশের বাড়ি (অর্থাৎ পুরান বাড়ি) প্রথম নির্মান করিয়া স্থায়ীভাবে বাস আরম্ভ করেন। পরে ক্রমশ বংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বাড়িতে তাঁহাব সন্তানগণ গিয়া বসবাস করিতে থাকেন।

অন্য মতে হেরম্বচন্দ্র দাশের পুত্র ত্রিলোচন দাশগুপ্ত সংস্কৃত শিক্ষাব জন্য পৈতৃক বাড়ি বিক্রমপুর অঞ্চল হইতে বর্ত্তমান যুগল দাশের বাড়ি আসেন এবং তথায় পণ্ডিত মহাশয়ের টোলে থাকিয়াই পাঠ আরম্ভ করেন। তাঁহার অসাধারণ মেধায় আকৃষ্ট হইয়া উক্ত পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার একমাত্র কন্যাকে তাঁহার সহিত বিবাহ দেন। বিবাহেব পর সস্ত্রীক দেশে গেলে তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ তাঁহাকে এক ঘরে করেন। ফলে পুত্র ত্রিলোচন দাশের পরামর্শ মতে পিতা হেরম্বচন্দ্র তাঁহার স্ত্রী, দুই পুত্র ত্রিলোচন ও রাঘবেন্দ্র, কন্যা রুক্মিণী দেবী এবং ডিংসাই বংশীয় রামটুরী চক্রবর্ত্তীকে (পুরোহিত) নিয়া গৈলা চলিয়া আসেন ও পুত্র ত্রিলোচনের শ্বশুরালয়ে (বর্ত্তমান যুগল দাশের বাড়ি) বাস করিতে থাকেন। রামটুরী চক্রবর্ত্তীকে সিহিপাশা অঞ্চলে বর্ত্তমান রাম কিশোরের মঠের নিকট একটি বাড়ি করিয়া দেন। যুগল দাশের বাড়িতে স্থানাভাব হওয়ায় কিছুদিন পরে তাঁহারা বর্তমান কবিরাজ বাড়ি উঠিয়া যান। তাহার কিছুকাল পরে উক্ত বাড়ির দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সনাতন গুপ্তের সহিত রুক্মিণী দেবীর বিবাহ হয়। ত্রিলোচন দাশ ও তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুর পরে কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাঘবেন্দ্র পুরান বাড়িতে অর্থাৎ বর্ত্তমান দীনবন্ধু দাশের বাড়িতে বাস

করিতে আরম্ভ করেন। এই মতেই ভবদাশ বংশের অধিকাংশ বিশ্বাসী।

ভবদাশের সহিত হেরম্বের কি সম্বন্ধ ছিল এবং বংশ ভবদাশ বংশ নামে কেন খ্যাত হয় তাহাও ঠিক জানা যায় না। এক মতে 'ভব' ছিলেন হেরম্বের পিতা, অন্য মতে প্রপিতামহ। এই বিষয়ে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আমরা পাই নাই। ভবদাশ হেরম্ব চন্দ্রের পিতা হইলে এ বংশ ভবদাশ বংশ নামে পরিচিত হওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশি মনে হয়। যাহা হউক বর্ত্তমান ভবদাশ বংশীয়দের যে হেরম্বচন্দ্র পূর্বপুরুষ, তিনিই যে প্রথম স্ত্রী পুত্রাদি নিয়া আসিয়া গৈলা বাস আরম্ভ করেন এবং ভবদাশ যে তাহার পূর্বপুরুষ এ বিষয়ে মতভেদ নাই।

যে বংশ তালিকা গ্রহণ করা হইযাছে তদনুসারে বর্ত্তমান ২০।২৫ বৎসরের যুবক হইতে ভবদাশ বংশের উপরোক্ত হেরম্ব দাশ উর্ধ্বতন ষোড়শ পুরুষের অধিক নহে।

সুতরাং উপরের হিসাবানুসারে তিনি প্রায় ১৬×২৫=৪০০ বৎসর পূর্বের অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের লোক ছিলেন এবং সেই সময় হইতে ভবদাশ বংশ গৈলায় আছে। এ স্থলে স্মরণ করা যাইতে পারে যে হেরম্ব চন্দ্রের পুত্র ত্রিলোচন দাশ 'কবীন্দ্র' উপাধিধারী ছিলেন এবং কলাপ ব্যাকরণের "কাতন্ত্র পরিশিষ্ট" নামে প্রসিদ্ধ টীকা রচয়িতা। সংস্কৃত ব্যাকরণের ঐতিহাসিকেরা উহার রচনাকাল আনুমানিক ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দ মনে করেন। (গুরুপদ হালদার রচিত "ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস" প্রথম খণ্ড) যদি ত্রিলোচন দাশ বৃদ্ধ বয়সে ঐ টীকা লিখিয়া থাকেন তবে উপরোক্ত অনুমিত কালের সঙ্গে ইহার বিশেষ অমিল হয় না।

এই প্রসঙ্গে আরও এককথা বলা দরকার। ভবদাশদের মধ্যে প্রসিদ্ধি যে ত্রিলোচনের ভগিনী রুক্মিণী দেবীর বিবাহ হয় তাহাদের

গৈলা আসার পর সনাতন গুপ্তের সহিত এবং তাঁহাদের পুত্র মনসা মঙ্গল গ্রন্থের রচয়িতা বিজয় গুপ্ত। সুতরাং মনসামঙ্গল গ্রন্থ রচনার অন্তত ২৫ বৎসর পূর্বে তাঁহারা গৈলা আসিয়াছিলেন। বিজয়ের এই গ্রন্থ রচনাকাল নিয়া মতভেদ আছে। বহু ঐতিহাসিক তাহাকে হোসেন শাহ সুলতানের (১৪৯৩—১৫১৯) সমসাময়িক এবং মনসা-মঙ্গলের রচনাকাল ১৪৯৪।৯৫ খ্রীষ্টাব্দ মনে করেন। কেহ তাহাকে পরবর্ত্তী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমরা মনসামঙ্গল অধ্যায়ে আলোচনা করিব।

যদি বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল গ্রন্থের রচনাকাল ১৪৯৪-১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দ ধরা যায় তবে হেরম্ব দাশের গৈলা আগমনকাল অন্তত ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ আমাদের অনুমিত সময় হইতে প্রায় ১০০ বৎসর পূর্বে দাঁড়ায় এবং ত্রিলোচন দাশ কবীন্দ্রের টীকা রচনাকাল ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দের অনেক পূর্বে ধরিতে হয়।

ভিংসাই শ্রোত্রিয়গণ—ইহারাও বলেন যে তাঁহাদের পূর্বপুরুষ রামটুরী চক্রবর্ত্তী ভবদাশ বংশের আদি পুরুষের সহিত প্রথম গৈলা আসেন। সুতরাং এই বংশ ও ভবদাশ বংশ একই সময় গৈলা আসেন। ইহাদের সিহিপাশা অঞ্চলে মনসা বাড়ি প্রভৃতি অনেকগুলি বাড়ি।

মিশ্র বংশ—এই বংশের পূর্বপুরুষ রাজারাম মিশ্র কাশী নিবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বাংলা দেশে তদানীন্তন নবাবের অধীনে সৈন্য বিভাগে কাজ করিতেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে এতদঞ্চলের শাসনকর্ত্তা প্রসিদ্ধ ছবি খাঁ নবাবের বিরাগভাজন হ'ন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে নবাব সৈন্য প্রেরণ করেন। এই দলের একটি বাহিনীর নায়ক ছিলেন রাজারাম মিশ্র। প্রধানত তাঁহারই কৌশলে ছবি খাঁ পরাজিত ও ধৃত হন। পুরস্কার স্বরূপ নবাব তাঁহাকে গৈলা গ্রামে ও পার্শ্ববর্ত্তী মৌজায় বহু জমি দেন এবং তদবধি তিনি এখানে (বর্ত্তমান প্রসন্ন মিশ্রের বাড়িতে) বসবাস করিতে থাকেন। সেখান হইতে

তাঁহার সন্তানগণ ক্রমশ অন্য বাড়ি যান। ইহাদের গোড়ার দিকে ৬ খানা বাড়ি ছিল কিন্তু বর্ত্তমানে মাত্র ৩ খানা বাড়ি।

বিনায়ক সেন বংশ—এই বংশের আদি পুরুষ ভবানন্দ সেন বিক্রমপুর পোড়াগাছা হইতে প্রথম গৈলা আসিয়া মধুর আদ্ধির পারে বাস আরম্ভ করেন। পরে বর্তমান কালুপাড়া সেনের দক্ষিণ বা পুরান বাড়িতে বসতি স্থাপন করেন। কালক্রমে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে উত্তরের বাড়িতে (নয়া বাড়ি—কুমুদ সেনদের বাড়ি) কেহ কেহ যান। আরও পরে পুরান বাড়ি হইতে রামভদ্র সেন ও নয়া বাড়ি হইতে একজন পূর্ব সেন পাড়া গিয়া বাস শুরু করেন। তাঁহারাই পূর্ব সেন পাড়ার সেনদেব আদি-পুরুষ। ভবানন্দ সেন বর্ত্তমান যুবকদের উর্ধ্বতন দ্বাদশ পুরুষ।

বঙ্গবাস বংশ—ইহাদেব পূবপুরুষ ছিলেন যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাহাব গৈলায আগমন বিষয়ে দুইটি প্রসিদ্ধি আছে। যথা—

(১) তিনি বিক্রমপুব ফুলিয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হ'ন। গৈলার প্রসিদ্ধ মনসা বাড়ির নাম শুনিয়া এখানে আসিয়া আরোগ্যার্থ ঐ মন্দিরে হত্যা দেন। পরে একেবারে সুস্থ হইয়া গৈলা গ্রামেই স্থায়ীভাবে বসতি আরম্ভ করেন এবং যাজনিক ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হ'ন।

(২) বিনায়ক সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ সেন যখন বিক্রমপুর হইতে আসিয়া গৈলায় বসতি স্থাপন করেন তখন যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পুরোহিত ভাবে আসিয়াছিলেন।

বিনায়ক সেন বংশ বঙ্গবাসগণের যজমান। যজ্ঞেশ্বর বর্ত্তমান বংশীয়গণের হইতে একাদশ পুরুষ উর্ধ্বে।

মোটামুটি ভাবে বলা যায় যজ্ঞেশ্বর ও সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রায় একই সময়ে গৈলা আসিয়াছিলেন। বঙ্গবাস বংশের বহু বাড়ি। প্রসঙ্গ

চাটার্জি, রমণী গাঙ্গুলী, মধু মুখার্জি, নিশি গাঙ্গুলী প্রভৃতি ইহাদের দৌহিত্রবংশ।

কায়স্থ গুপ্তবংশ—ইহাদের উর্ধ্বতন দ্বাদশ পুরুষ মহাদেব গুপ্ত কর্ণপুর যশোহর (অধুনা খুলনা) জিলার সেনহাটি গ্রাম হইতে প্রথম গৈলা আসেন প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্বে। তাঁহার দুই ছেলে। প্রথম ছেলে চন্দ্রশেখর কণ্ঠাভরণের সন্তানগণ ফুল্লশ্রী গুপ্তের বাড়ি, গোলার পাড গুপ্তের বাড়ি, চৌধুরী বাডিতে বসবাস করেন। অপর পুত্র গোপী-রমণ। তাঁহার এক পুত্র জগদানন্দ হরিগুপ্তের বাড়ি ও অপর পুত্র রামগোবিন্দ শঙ্কর গুপ্তের বাডিতে বসবাস আরম্ভ করেন। মহাদেবের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ রঘুরাম গুপ্ত প্রায় শতবর্ষ পরে পূর্বসেন পাড়া বিবাহ করেন এবং যৌতুক স্বরূপ বর্তমান চৌধুরী বাডি পা'ন এবং সেখানেই বাস করিতে থাকেন। শঙ্কর গুপ্তের বাডির লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে রামনাথ ও তাহাব ভ্রাতা বামদাস বর্তমান রামনাথের পৌত্র আলোক গুপ্তের নামে প্রসিদ্ধ বাডি (বড নয়া বাডি) গিয়া বাস আরম্ভ করেন। রামচন্দ্র পরে শঙ্কর গুপ্তের বাডি হইতে ছোট নয়া বাডি গিয়া বাস করিতে থাকেন।

বৈদিক ব্রাহ্মণগণ—ইহাদের বিভিন্ন বাডির পূর্বপুরুষগণ একই সময়ে গৈলা আসেন নাই। সকলেই কোটালিপাডা হইতে এখানে আসেন এবং সেখানকার "ঠাকুব চক্রবর্ত্তী" মহাশয়ের বংশ। ডক্টর চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তীর পূর্বপুরুষ নারায়ন বিদ্যাবাগীশ এবং ফুল্লশ্রীর বৈদিক-গণের পূর্বপুরুষ জনার্দন প্রায় একই সময় এখানে বসতি আরম্ভ করেন, নারায়ণ পূর্ব পাডায় ও জনার্দন ফুল্লশ্রীতে। নারায়ন ছিলেন বর্তমান যুবকদের উর্ধ্বতন দ্বাদশ পুরুষ।

মজুমদার বাড়ি—এই বংশের পূর্বপুরুষ রূপনারায়ণ সেন পোড়া-গাছা অঞ্চল হইতে ফুল্লশ্রী আসিয়া বাস আরম্ভ করেন। তিনি এখন হইতে দ্বাদশ পুরুষ উর্ধ্বে। সুতরাং সপ্তদশ শতাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে ইহাদের

আগমনকাল বলা যায়। ইহারা পরে মজুমদার উপাধি গ্রহণ করেন।

সোমদ্দার বংশ—ইহাদেব আদিপুরুষ হরিদাস পিপলাই বিক্রমপুর (অধুনা ফরিদপুর) জিলাব অন্তর্গত আমগ্রাম হইতে এখানে আসিযা ফুল্লশ্রী অঞ্চলে বাস আরম্ভ কবেন। ইহারা পবে সোমদ্দার পদবী গ্রহণ কবেন। হবিদাস বর্তমান যুবকদেব হইতে ১১।১২ পুরুষ উর্ধ্বে।

তপাদার বংশ—ইহাদেব আদি গোবিন্দদেব মাধবপাশা অঞ্চল হইতে এখানে আসেন ও ফুল্লশ্রীতে বসতি স্থাপন কবেন। ইহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধি যে "বাজাব মাযের আদ্ধি' খনন কালে ইনি চন্দ্রদ্বীপের রাজার কর্মচারীস্বরূপে এখানে প্রথম আসেন। ইনি বর্তমান যুবক-গণেব ১১।১২ পুরুষ উর্ধ্বে। লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে এখন থেকে পাঁচ পুরুষ পূবে এ বাড়ি হইতে একজন উত্তর সিহিপাশা বাড়ি কবেন। শ্রীনাথ সবকার প্রভৃতি তাহাব বংশ ও অপব একজন (গোলক কি যশোবন্ত) একই সমযে দক্ষিণ ফুল্লশ্রীতে বাস আরম্ভ কবেন।

কর্মকারগণ—ইহাবা সকলে একবংশেব নহে বা একই সময়ে এখানে আসেন নাই। প্রসিদ্ধি যে মুসলমান যুগে অস্ত্র-শস্ত্র গোলা-বারুদ তৈরির প্রযোজনে ইহাদেব অনেক বাড়ির পূর্বপুরুষগণকেই গৈলায় আনিয়া স্থাপিত কবা হয়।

পঞ্চানন ভট্টাচার্য বংশ—এই বংশেব প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত রামচন্দ্র ন্যায় পঞ্চানন ভট্টাচায নদীযা জিলাব কাঁচডাপাডা হইতে গৈলা আসেন। ইনি ছিলেন ঘকর মুখোপাধ্যাযেব বংশধর। লব্ধ প্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া সকলে তাহাকে ভট্টাচার্য মহাশয় বলিয়া সম্বোধন করিত ও ক্রমে সংক্ষেপে তিনি পঞ্চানন ভট্টাচার্য বলিয়া পবিচিত হ'ন। বর্তমান ভবেন্দ্র ভট্টাচার্যেব বাডি ছিল তাঁহার আদি বাডি। তাঁহার একপুত্র হরিরাম আচার্য বেজের পাড় (বর্তমান শীতল ভট্টাচার্যের বাডি) গিয়া বাস আরম্ভ করেন। পরে গদাধর ন্যায়বাগীশ

ভ্রাতাগণ সহ বর্তমান আনন্দ ভট্টাচার্যের বাড়ি বসবাস আরম্ভ করেন এবং তাঁহাদেব একজন রাধানাথ ভট্টাচার্য নামে পরিচিত বাড়ি স্থাপন করেন। পবে গদাধবের পুত্র বানেশ্বব ন্যাযপঞ্চানন নূতন আর এক বাড়ি (বর্তমান কৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্যের বাড়ি) গিযা বাস আবম্ভ করেন। পঞ্চানন ভট্টাচায এখন হইতে একাদশ পুরুষ উর্ধ্বে।

পিপলাই বংশ—আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দেব চতুর্থ পাদে রাঘবেন্দ্র পিপলাই বা তৎপিতা চন্দ্রশেখব বিক্রমপুব (অধুনা ফরিদপুর) অন্তর্গত আমগ্রাম গ্রাম হইতে আসিযা বর্তমান পিপলাইদেব পুবান বাড়ির মধ্য-খণ্ডে বসতি আরম্ভ কবেন। (সোমদ্দাবদেব পূর্বপুরুষ হবিদাস পিপ-লাইও প্রায় একই সমযে আমগ্রাম হইতে এখানে আসিযা বাস আবম্ভ কবেন।) তাহার প্রায শত বৎসব পব এই বংশেব রামমোহন বর্ত্তমান চৌধুবী বাডিব দক্ষিণে এক বাড়ি কবেন। তাঁহার বংশ লোপ হইলে যোগেন্দ্র পিপলাই ১৩০৪ সালে সেই বাডিতে বাস আরম্ভ কবেন। ঐ সালেই দুর্গাচরণ তাহাদের পুবান বাডিব সংলগ্ন পূবেব বাড়ি ক্রয করিযা সেখানে নূতন বাড়ি করেন। চন্দ্রশেখর ছিলেন বর্ত্তমান বংশীযদেব উর্দ্ধতন একাদশ পুরুষ।

তর্কবাগীশ বংশ—ইহাবা ভবদাশ বংশেব গুরু এবং প্রথম বাস কবিতেন গৈলাব বাজাবের কিছু দক্ষিণপূর্বেব এক বাড়িতে। পরে অষ্টাদশ শতাব্দীব মাঝামাঝি পুবাতন বাড়ি ত্যাগ কবিয়া রামজয তর্কবাগীশ বর্তমান বাড়িতে আসেন।

বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ :—

অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয়পাদে রামনাথ দাস বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পূর্বপুরুষকে নিজ বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম আদি বিগ্রহ নিত্য পূজার জন্য উত্তরবঙ্গ হইতে গৈলা আনযন করেন।

সিমলাই বংশ—ইঁহারা গৈলার দক্ষিণে টেমার গ্রামে বাস করি-

তেন। তর্কবাগীশের বাড়ির ব্রাহ্মণগণ ইহাদের গুরু ছিলেন। প্রসিদ্ধি এই যে প্রতিদিন গুরুর চরণ বন্দনার সুবিধার জন্যে এই বংশের একজন গুরু বাড়ির সংলগ্ন পূর্ব দিকের বাড়িতে বাস আরম্ভ করেন। বর্তমান গৈলার সিমলাইগণ তাঁহারই বংশধর।

সত্যসেনের বাড়ি—এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা রামকান্ত সেন প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে রামনাথ দাসের বাড়িতে বিবাহ করিয়া এখানে আসিয়া ফুল্লশ্রীতে বাস আরম্ভ করেন। তিনি এখন হইতে ৮ পুরুষ উর্ধ্বে।

মাণিক সেনের বাড়ি—ইহাদের পূর্বপুরুষ কৃষ্ণচন্দ্র সেন যশোহর জেলার উচলি গ্রাম হইতে এখানে প্রথম আসেন। তিনি বর্তমান যুবকগণ হইতে ৭।৮ পুরুষ উর্ধ্বে।

শুকদাস বংশ—শুকদাস চাঁদসী হইতে এখানে আসিয়া উত্তর ফুল্লশ্রী অঞ্চলে বাস আরম্ভ করেন। তিনি এখন হইতে ৭।৮ পুরুষ উর্ধ্বে। ইহাদের কয়েকখানা বাড়ি। ইহারা কায়স্থ বংশ সম্ভূত।

তুহিসেন বংশ—এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা রমাপতি সেন। তিনি ছিলেন বর্তমান যুবকদের উর্ধ্বতন সপ্তম কি অষ্টম পুরুষ।

মুনশী বাড়ি—ইহাদের সপ্তম পুরুষ উর্ধ্বে রামচন্দ্র দাশ বিনায়ক সেনবংশ ও মজুমদারদের পূর্বপুরুষের মত বিক্রমপুর পোড়াগাছা অঞ্চল হইতে বর্তমান মুনশী বাড়ি আসিয়া বাস আরম্ভ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দের শেষ ভাগে তিনি এখানে আসেন।

ভুটি বাড়ি—উনবিংশ শতাব্দের প্রথম ভাগে অথবা অষ্টাদশ শতাব্দের শেষে রামদুর্লভ সেন ও তাঁহার ভাই হরমোহন সিহিপাশা অঞ্চলে বাস করিতেন। গৈলায় ঐ দুই ভাই অথবা তাঁহাদের পূর্বপুরুষ, প্রথমে কে বাসস্থাপন করেন তাহা জানা যায় না।

রামকমল দাসের বাড়ি—প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্বে এই বাড়ির পূর্বপুরুষ রামময় দাস ইহাদের বর্তমান বাড়ি খরিদ করিয়া বাস আরম্ভ করেন। তিনি চাঁদসী গ্রাম হইতে এখানে আসেন ইঁহারা কায়স্থ।

সরকার বাড়ি (ফুলশ্রী)—ইহাদের ঊর্ধ্বতন পঞ্চম কি ষষ্ঠ পুরুষ শম্ভুনাথ দাস সরকার চাঁদসী গ্রাম হইতে প্রথমে এখানে আসিয়া বাস আরম্ভ করেন। ইহারা জাতিতে কায়স্থ।

রামহরিদাসের বাড়ি (ফুলশ্রী)—বর্তমান যুবকগণের উর্দ্ধতন পঞ্চম কি ষষ্ঠ পুরুষ রামহরিদাস ফরিদপুর জিলার গোপালপুর অঞ্চল হইতে এখানে প্রথম আসেন। ইহারা জাতিতে কায়স্থ।

আমরা যে যে বংশের পূর্বপুরুষগণের আগমনের বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাদের বিষয়ে উপরে লিখিলাম। যাহাদের বিষয়ে জানিতে পারি নাই তাঁহারা যে আমাদের উল্লিখিত বংশের পূর্বেই গৈলা আসিয়াছিলেন তাহা মনে করার কোনও যুক্তি সংগত কারণ নাই। উপরের বিবরণ হইতে দেখা যায় বর্তমান অধিবাসীদের মধ্যে ভবদাশ বংশ এবং তাঁহাদের পুরোহিত ডিংসাই শ্রোত্রিয়গণ সর্বপ্রথমে, পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দের শেষার্দ্ধে গৈলায় আসেন। অনেক বংশই সপ্তদশ শতাব্দে, কয়েক বংশ অষ্টাদশ শতাব্দে এবং দুই এক বংশ উনবিংশ শতাব্দের প্রথমপাদে গৈলায় বসতি স্থাপন করেন।

প্রাচীন বসতি

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে বর্তমান অধিবাসিগণের পূর্ব পুরুষগণ ৪০০।৫০০ বৎসরের মধ্যে এখানে আসিয়া বাস আরম্ভ করেন। এখন প্রশ্ন হইল ইহাদের পূর্বে গ্রামে কি কোনও বসতি ছিল, থাকিলে তাহারা কেন চলিয়া গেল অথবা বিলাঞ্চল বলিয়া জায়গা কি একেবারে পতিত ও অনধ্যুষিত ছিল।

মনসামঙ্গল গ্রন্থে নিজের গ্রাম ফুল্লশ্রীর পরিচয় দিতে গিয়া কবি বিজয়গুপ্ত লিখিয়াছেন—

"চারি বেদধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল
বৈদ্য জাতি বসে নিজ শাস্ত্রেতে কুশল
কায়স্থ জাতি বসে তথা লিখনের গুর
অন্যজাতি বসে নিজ শাস্ত্রে সুচতুর॥"

কবিজনসুলভ কিছু কল্পনা ও অতিরঞ্জন বাদ দিলেও মনে করা যাইতে পারে গ্রামে তখন ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থাদি বাস করিত। আর ইহাও বিবেচ্য যে যদি তখন লোকের মধ্যে বাংলা লেখা পড়া বা সংস্কৃত চর্চ্চা না থাকিত তবে বিজয়ের মত কবির জন্ম সম্ভব হইত কিনা অথবা তাঁহার মাতুল ত্রিলোচন দাশের বিক্রমপুর হইতে সংস্কৃত পড়িতে গৈলা আসার কোনও প্রয়োজন ছিল কি না। ত্রিলোচনের ভগিনী রুক্মিণী দেবীর গৈলার সনাতন গুপ্তের সহিত বিবাহের প্রসিদ্ধিও এখানে পূর্ব

হইতেই বসতি স্থচিত করে। হেরম্বচন্দ্রের নবাব সরকারে চাকরি উপলক্ষে এখানে আসিয়া রাজার মায়ের আন্ধি অঞ্চলে থাকা ও পরে নিজে বাড়ি করার প্রসিদ্ধিও উপরোক্ত মত সমর্থন করে।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে গ্রামে বহু পুরাতন দীঘি বা আন্ধি আছে। গ্রামের এক প্রান্তে রাজার মায়ের আন্ধি, এক দিকে বিজয় সেনের দীঘি, অপর দিকে গোকুল সেনের দীঘি ও মধ্যভাগে ইন্দ্র সেনের দীঘি, যম-দ্বারের পাড়ের তুটি দীঘি, দত্ত খাঁর পাড়ের দীঘি, দক্ষিণাংশে তর্কবাগীশের বাড়ির সংলগ্ন পুরাতন দীঘি প্রভৃতি আছে। এই সেনত্রয় কাহারা ছিলেন তাহা জানা যায় না তবে তাঁহারা যে বর্তমান অধিবাসীদের পূর্বপুরুষ ছিলেন না ইহা নিশ্চিত। উপরোক্ত পুরাতন দীঘি সকল কাহারা কাটাইয়াছিলেন কিছু জানা যায় না। তবে এটা লক্ষণীয় যে বর্ত্তমান অধিবাসিগণের পূর্বপুরুষেরা খনন করাইয়াছিলেন এমন কোনও দাবী বা জনশ্রুতিও নাই। অন্যান্য পুরাতন দীঘির মধ্যে গ্রামের দক্ষিণাংশে স্থিত তুতুহারের আন্ধির অধিকাংশই চাষী জমিতে পরিণত হইয়াছে। খুবই অনুমান হয় এই দীঘিও বর্তমান অধিবাসীদের এখানে বসতি-স্থাপনের পূর্বে খনিত হইয়াছিল।

এ প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপ সেনের সময়ে (১২০৬—১২২০ খ্রীষ্টাব্দ) গৈলা হইতে মাত্র ২ মাইল পূর্বে রামসিদ্ধি গ্রামে 'রামসিদ্ধি পাতক' নামে তাঁহার প্রদত্ত একখানি ফলক পাওয়া গিয়াছে ও কোটালিপাড়ায় 'ঘাঘর পাতক' নামে আর একখানি অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে। গৈলা হইতে ১২।১৩ মাইল দক্ষিণ পূর্বে একান্ন পীঠস্থানের অন্যতম শিকারপুর গ্রামে ১০১৫ খ্রীষ্টাব্দের লিখিত তালপাতার পুঁথিতে সেখানকার বিখ্যাত 'তারাদেবীর' মূর্তি অঙ্কিত পাওয়া গিয়াছে। গৈলার ৬।৭ মাইল পূর্ব দক্ষিণে লক্ষ্মণকাঠি গ্রামে পাল রাজবংশের প্রথম দিকের অতিসুন্দর কারুকার্য শোভিত কৃষ্ণ প্রস্তরের মহাবিষ্ণু মূর্তি ও

গৈলা হইতে ১২।১৪ মাইল পশ্চিমে কোটালিপাড়ায় ষষ্ঠ শতাব্দীর রাজা গোপালচন্দ্রের কয়েকখানি অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে। বাজা চন্দ্র বর্মন চতুর্থ শতাব্দীতে কোটালিপাড়া জয় করিয়া চন্দ্রবর্মন কোট নামে দুর্গ নির্মান করিয়াছিলেন এবং পবে গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক নৌযুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত সেখানে তোরণ নির্মান করিয়াছিলেন। কোটালিপাড়া এক সময়ে সমুদ্রগ্রামী জাহাজের কেন্দ্রস্থল ছিল। কিন্তু উপরোক্ত অনুশাসনাদিতে আমাদের আলোচ্য ৪॥০ বর্গমাইল পরিমিত গৈলা নামে প্রসিদ্ধ ভূখণ্ডের কোনও উল্লেখ নাই।

গ্রামের প্রান্তদেশে বিজয সেনেব দীঘি ও গোকুল সেনের দীঘি ও পার্শ্ববর্তী মৌজায় আরও ৬ জন সেনদের (অশোক, যব, তরুণ, অরুণ, শ্রীদাস ও বরুণ) নামে বৃহৎ দীঘি ও অশোক সেন, যব সেন ও তরুণ সেন নামে মৌজা আছে। এই সেন মহাশয়েবা কত কাল পূর্বে এই অঞ্চলে বাস করিতেন বা কোন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিছুই জানা যায় না। তাহাদের বসতি বাড়িব কোনও চিহ্নও নাই।

সমস্ত বিবেচনা করিয়া মনে হয় 'গৈলা' নামে পরিচিত জনপদে ও তাহার পাশ্ববর্তী গ্রাম সমূহে পূর্বে (সম্ভবত হিন্দুরাজত্ব কালে) লোকের বসতি ছিল। কিন্তু তখন লোক সংখ্যা ছিল বিরল এবং গ্রামের অধিকাংশ ভূমিখণ্ড পতিত বিলাঞ্চল বা নিম্ন জমি ছিল। তাহাদের কোনও বংশধরও গ্রামে বসতি করেন না। বর্ত্তমান অধিবাসীদের পূর্বপুরুষেরা সম্ভবত সেই সব পতিত ভূখণ্ডেই বসতি নির্মান করিয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সেন বংশের পতনের পর এবং নূতন মুসলমান সুলতানগণের রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অনেককাল দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল না। অসম্ভব নয় সেই অরাজকতার যুগে গৈলার অধিবাসী যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা গ্রাম ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিলেন। সম্ভবত পরে যখন পাঠান বংশের হোসেন শাহ (১৪৯৩—

১৫১৯) সমগ্র রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করেন তখন গ্রামে পুনরায় বসতি আরম্ভ হয় ও সেই জন্যই বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল গ্রন্থে তাহার প্রশস্তি দেখা যায়।

পরে চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়ে এবং দিল্লীর মোগল বাদসাহের রাজত্ব বাংলা দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দে এতদঞ্চলের শাসনকর্তা ছবি খাঁর শাসনকালে অনেক রাস্তা ঘাট প্রভৃতি তৈরী হয় ও দীঘি পুষ্করিণী কাটা হয় তাহাতে লোকের মনে নিরাপত্তা বোধ জাগে। ফলে বহু লোক পার্শ্ববর্তী জিলা হইতে এখানে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন।

গ্রামের প্রান্তভাগে কিছু নমশূদ্র ও মুসলমান আছে। ঐতিহাসিকদের মতে এই অঞ্চলের নমশূদ্রগণের অধিকাংশই দেশের পূর্বের আদিম অধিবাসীদের বংশধর (যদিও উত্তর পশ্চিম হইতে আগত আর্যগণের সহিত প্রচুর রক্ত সংমিশ্রণ হইয়াছে) এবং স্থানীয় কৃষিজীবী মুসলমান-গণ তাহাদের হইতে ধর্মান্তরিত। গ্রামের প্রান্তভাগে স্থিত এই সব নমশূদ্র ও মুসলমানগণেরা কি স্মরণাতীত কাল হইতেই এখানে আছে না বিগত ৪০০।৫০০ বৎসরের মধ্যে আসিয়া বসতি আরম্ভ করিয়াছে তাহা জানা যায় না।

পাদটীকা

ঐতিহাসিক তথ্য সমূহ ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত) বাংলা দেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, হইতে সংগৃহীত।

বসত বাড়ি

বলা হইয়াছে গৈলা গ্রাম বিলাঞ্চলে অবস্থিত এবং ছোট বড় অসংখ্য ছোট-খাল পরিপূর্ণ ছিল। জায়গা নিচু বলিয়া বাড়ি তৈয়ারী করিতে হইলেই মাটির প্রযোজনে পুকুর বা দীঘি কাটাইয়া জমি উঁচু করিতে হইত। প্রত্যেক বাড়িতে দরজার খণ্ডে অন্তত একটি ও ভিতরের খণ্ডে একটি পুকুর থাকিত।

সাধারণত বহু বাড়িতেই দরজার খণ্ডের পুকুরের জল স্নান ও পানের জন্য ব্যবহৃত হইত। প্রতিমা বিসর্জনও অনেক বাড়িতে এই পুকুরেই হইত। কেবল মাত্র পানীয় জলের জন্য কোনও পুকুর সংরক্ষিত (reserved) ছিল না। কেহ কেহ নিজের বাড়ির পুকুরের বা নিকটবর্তী খালের জল কয়লা বালির ফিলটারে বিশুদ্ধ করিয়া পান করিত। পরে বিভিন্ন পাড়ায় কয়েকটি নলকূপ (tubewell) বসান হইয়াছিল। তাহাতে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব কতকটা কমিয়া গিয়াছিল।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক পুকুরেই মাছ থাকিত। খাল হইতে মাছ আসার জন্য পুকুরে যান থাকিত। যাঁহারা পুকুরে যান রাখিতেন না তাহারা পোনা (রুই কাতলা প্রভৃতি বড় মাছের খুব ছোট বাচ্চা) মাছ কিনিয়া পুকুরে ফেলিতেন।

কোনো কোনো জলাশয়ের পাড়ে পাকা ঘাট আছে। ঐ ঘাটে

হিন্দুরা সন্ধ্যা বন্দনাদি কবিতেন ও "সভা খোলায়" কোনো কোনো সময় উপস্থিত মুসলমানগণ নমাজ পড়িতেন। অনেক জলাশয়ের পাড়ে পরবর্তীকালে মন্দিরাদি নির্মিত হইয়াছিল। ঐ সব মন্দিবে শিব, নারায়ণ প্রভৃতি দেবতাব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও নিত্যপূজা হইত।

বাড়িগুলি আয়তনে বেশ বড ছিল। সাধাবণত ভিতবেব খণ্ডে চারি ভিটিতে চারখানি মুখোমুখি ঘর (ইহাকে চতুঃশালা বলিত) ও রান্নাঘব থাকিত। বহুপুরুষ ধবিযা একই বাড়িতে বাস করার জন্য শেষে এই চতুঃশালা রক্ষিত হইত না। পবিবাবেব নূতন লোকেব জন্য ভিতরের বাড়িতে পাশাপাশি ঘবেব পব ঘব নির্মাণ করিতে হইত। তাহাতে যদিও প্রযোজন নিষ্পন্ন হইত কিন্তু পূবেকাব শোভা থাকিত না। বাহির খণ্ডে একখানা চণ্ডীমণ্ডপ থাকিত। সম্পন্ন গৃহস্থেব বাড়িতে ঐ ঘবের সম্মুখে একখানি আটচালা ঘবও থাকিত। অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বর্হিবাটি সম্পন্ন লোকেব বাড়িতে দবজায় বাহিবেব খণ্ডে ও চারি ভিটিতে ৪ খানা ঘব থাকিত।

এই চণ্ডীমণ্ডপে বা আটচালা ঘবে অনেক সময গ্রাম্য পাঠশালা বসিত।

বাহিবের ও ভিতরের খণ্ডেব মাঝামাঝি 'ঠাকুব ঘব' থাকিত। এই ঘরে শালগ্রাম, লক্ষ্মী, গোবিন্দ, শিব প্রভৃতিব বিগ্রহ থাকিত ও তাহাদেব দৈনিক পূজা হইত।

প্রাচীন কালে ইষ্টক নির্মিত পাকা দালানেব বিশেষ প্রচলন ছিল না। অতি অল্প বাড়িতেই ইহা ছিল। ছন বা খড দিয়া ঘবেব ছাউনী হইত, বেড়া থাকিত হোগলা পাতার। ছন বা খড ঘন করিয়া ছাতরূপে ব্যবহার হইত। এই সব ঘর বেশ শীতল ছিল কিন্তু ২।৩ বৎসর অন্তরই মেরামত দরকার হইত। আগুনের ভয় ও ছিল। কোনও কোনও বাড়িতে ঘরে গোলপাতার ছাউনী ছিল। পরে যখন টিন পাওয়া গেল তখন অগ্নিভয় নিবারণের জন্য ও বার্ষিক মেরামত খরচ এড়াইবার জন্য লোকে

টিনের ঘর নির্মাণ আরম্ভ করিল। এই ঘরেও হোগলার বেড়া থাকিত, পরে কেহ কেহ মুলীবাঁশের বেড়া দিত।

টিনের ঘর গরম হইত সেইজন্য চালের নিচে পাটাতন বা অন্য কোনও প্রকারের আচ্ছাদন ব্যবহার করা হইত। অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল অবস্থার লোকেরা হোগলা বা চাটাইয়ের আচ্ছাদন দিত; কেহ কেহ বাঁশের বা সুপারিগাছের ভারা ব্যবহার করিত। সম্পন্ন লোকেরা কাঠের পাটাতন দিত। তাহাতে ঘরখানি দোতালা ঘরের মত হইত। অনেক সময় ঐ কাঠের পাটাতনের উপর লোকেরা শয়ন করিত। সব ঘরেরই ভিত্তি হইত মাটির কিন্তু মাটির দেওয়ালের প্রচলন ছিল না।

বর্ত্তমান বাংলা শতাব্দের প্রারম্ভ হইতেই ইষ্টক নির্মিত পাকা দালান তৈয়ারী আরম্ভ হয় এবং ক্রমে ক্রমে বহু বাড়িতেই ঐ রূপ দালান নির্মিত হয়। শেষের দিকে অধিকাংশ বাড়িতেই ইষ্টক নির্মিত দালান নির্মিত হইয়াছিল।

প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই দেশি ফুলগাছ ও ফলবান বৃক্ষ ছিল। ফুলগাছের মধ্যে স্থলপদ্ম, জবা (বিভিন্ন প্রকারের), শেফালিকা, টগর, করবী, হাজরা (দোপাটি), অতসী, বক, সন্ধ্যামালতী, চাঁপা, কাঞ্চন, অপরাজিতা প্রভৃতি অনেক বাড়িতে ছিল। হাসনাহেনা ও মধুমালতী কোনও কোনও বাড়িতে দেখা যাইত। ফলবান বৃক্ষের মধ্যে আম, কাঁঠাল, বেল, গাব, নারিকেল, সুপারি, লেবু, কলা, জম্বুরা (বাতাবি), পেয়ারা ও চালতা প্রায় সব বাড়িতেই ছিল। জামরুল, তেঁতুল, জাম, বরই (কুল), জামির, আমড়া, জলপাই, লিচু, হরিতকী, আমলকী, করমচা, নইল (রোয়াইল), খেজুর ও তাল মাঝে মাঝে ছিল। দুই-এক বাড়িতে কামরাঙ্গা ও কমলা গাছও দেখা যাইত। অন্তত এক বাড়িতে তেজপাতা ও তমাল গাছ ছিল। বাড়ির সীমানা নির্দ্দেশের জন্য কাফুলা (জিওল) প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে থাকিত। বিভিন্ন

ধরণের লতা যথা বেত, কই, গুলঞ্চ (গুরুচি) প্রভৃতির অভাব ছিল না। বিভিন্ন রকমের গাছ ও লতা থাকার জন্য বাড়িগুলি বেশ সুশীতল এবং চক্ষু স্নিগ্ধ থাকিত। সুস্বাদু মুখরোচক ফলেরও অভাব হইত না।

গ্রামে কিছু কিছু প্রাচীন দালানের ভগ্নাবশেষ আছে। পূর্ব পাড়ার মঠ বাড়িতে একটি জরাজীর্ণ অশ্বত্থবৃক্ষ মণ্ডিত খিলান দালান আছে। এই বাড়িতে প্রসিদ্ধি যে বহুকাল পূর্বে ইহাদের এক পূর্বপুরুষ এই মন্দির তৈয়ার করাইয়াছিলেন। ইহার আকৃতি অনেকটা দোচালা 'জুইতের' ঘরের মতন, অর্থাৎ মধ্যভাগ বেশ উঁচু, তুই পাশ অর্ধচন্দ্রাকৃতি এবং কোণ চারিটি ভূমি হইতে ২।৩ হাত মাত্র উঁচু। দালানটি যে এককালে কারুকার্য শোভিত ছিল তাহা বোঝা যায়। দেশ বিভাগের কিছু কাল পূর্ব পর্যন্তও উহাতে বাড়ির প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর থাকিতেন ও তুর্গাপূজা হইত।

দাশের বাড়িতে বসতি খণ্ডের সম্মুখ ভাগেই একটি পাকা অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে ও বাড়ির চতুর্দিকে স্থানে স্থানে মাটির নিচে ইষ্টক নির্মিত দেওয়ালের ভিত পাওয়া গিয়াছে। কিম্বদন্তী এই যে উহাদের পূর্বপুরুষ কৃষ্ণদেব দাশ অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যখন ঐ বাড়িতে বসতি স্থাপন করেন তাহার পূর্ব হইতেই ঐখানে একটি প্রাচীন তুর্গের ভগ্নাবশেষ ছিল। আবার কেহ কেহ বলেন যে কৃষ্ণদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র 'রায়' কাশীনাথ দাশ নবাব সরকারে রাজস্ব কর্মচারী ছিলেন এবং ঐ কোঠা তিনি বৈঠকখানা রূপে ব্যবহার করিতেন। এ সম্বন্ধে সঠিক জানা যায় না তবে প্রথমোক্ত প্রসিদ্ধির সহিত দ্বিতীয়টির বিশেষ বিরোধও নাই। ইহাদের কালীমন্দির খিলান ছাদের এবং বড় হিস্যার পূর্বপুরুষ রায় কাশীনাথ দাশ কর্তৃক নির্মিত। বিগ্রহ পঞ্চমুণ্ডী আসনের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এখনও কালীর নিত্য পূজা চলিতেছে।

রামনাথ দাশ তাহার নিজ বাড়িতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সুন্দর কারুকার্য শোভিত বিষ্ণু মন্দির তৈয়ার করেন। এটি এখনও অটুট অবস্থায় আছে। সেখানে নিত্যপূজা হইত। পিপলাই বাড়িতে

(পুরান বাড়ি) রামশঙ্কর পিপলাই উকীল নির্মিত একটি ছোট খিলান ঠাকুর দালান জীর্ণাবস্থায় আছে। বাড়ির শালগ্রাম, লক্ষ্মী, গোবিন্দ প্রভৃতি বিগ্রহ ঐখানেই থাকিত। দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত ওখানে নিত্য পূজা হইত। নিমদাশদের চন্দ্রনাথ দাশের বাড়িতে পুরান খিলান-যুক্ত একটি পাকা চণ্ডীমণ্ডপ বর্তমানে অব্যবহার্য ভাবে আছে। আনন্দ ভট্টাচার্যের বাড়িতে অষ্টাদশ শতাব্দের শেষ ভাগে গদাধর ন্যায়বাগীশের নির্মিত এক চণ্ডীদালান আছে। কিছুকাল পূর্বে উহা পুন সংস্কার করা হইয়াছে।

মুনশী বাড়ির বৃহদায়তন ভদ্রাসন বাটি এবং রাজপ্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা শ্রেণী মুসলমান যুগের নবাবদের বাড়ি স্মরণ করাইয়া দেয়। তাহাদের প্রাসাদ তিন মহলে বিভক্ত। পূর্বাংশে পূজা দালান ও বাহির মহল, তৎপরে পশ্চিমে অন্দর মহল এবং তৎপশ্চাতে রন্ধন মহল। চকমিলান অট্টালিকা শ্রেণীর মধ্যস্থলে তিনটি প্রশস্ত চতুষ্কোন পাকা চত্বর। বাহির মহলের উত্তরাংশে পূজা দালান পার্শ্ববর্ত্তী দোতলার সমান উঁচু এবং সুন্দর কারুকার্য্য খচিত। সম্মুখে বিরাট থাম বা স্তম্ভরাজি দণ্ডায়মান। এই চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে বিরাট আটচালা গৃহ।

পুরাতন মঠের মধ্যে সিহিপাশা অঞ্চলের রাস্তার প্রায় শেষ সীমানায় এবং মাঠের পাশে "রামকিশোরের মঠ" নামে ডিংসাই চক্রবর্ত্তীদের এক মঠ আছে। ঐ মঠটি খুব উঁচু। দূর হইতে উহার সুউচ্চ শিখর দেখা যায়। সিহিপাশার অপর প্রান্তে রাস্তা ও খালের পারে শিবাই দাশের বাড়ির প্রাচীন-মঠটির উচ্চ চূড়া দূর হইতে গৈলা আগমনার্থীদের মনে গ্রামের সান্নিধ্য সুচিত করিয়া আশা ও আনন্দ সঞ্চার করিত।

গ্রামে সাধারণ শ্মশানভূমি ছিল না। বসতি বাড়ির দরজার খণ্ডে পুকুর বা খালের পাড়ে দাহ কার্য সম্পন্ন হইত। পূর্বকালে শ্মশানের

উপর মন্দিরাদি নির্মানের বিশেষ প্রচলন ছিল না। অনেক শ্মশান-ভূমিই খোলা থাকিত। কোথায়ও বা বট, অশ্বত্থ, বেল বা নারিকেল গাছ রোপন করা হইত।

গ্রামে পাকা দালান নির্মাণ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানের উপর নবরত্ন, পঞ্চরত্ন, মঠ প্রভৃতি বহু ইষ্টক নির্মিত স্মৃতি চিহ্নের নির্মিত হয়। এখন অনেক বাড়িতেই ঐরূপ পাকা মঠ দেখা যায়। উহার কোন কোন-টিতে শিব অথবা অন্য বিগ্রহ স্থাপিত আছে ও তাহার নিত্য পূজা হয়।

বড় খালের পার্শ্বে খোলা জায়গায় যে মঠগুলি আছে তাহা দূর হইতে বেশ সুন্দর দেখায়। পালবদি বাস্তার খালের পাশে দীঘির পাড়ের পার্বতী দত্তের বাড়ির মঠ ও কালুপাড়া সেনের বাড়িব নবরত্নটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। দাশের বাড়ির দরজায় খালের পারে তাহাদের পারিবারিক শ্মশানে অনেক নবরত্ন, পঞ্চরত্ন, মঠ প্রভৃতি ও গোলার পাড় গুপ্তদের বাড়ির দরজায় অনেক মঠ আছে।

আধুনিক কালে নির্মিত স্মৃতি চিহ্নের মধ্যে পূবসেন পাড়ার জনার্দন সেনের পত্নীর শ্মশানে ইষ্টক নির্মিত বিশাল ছাতাটি অভিনবত্বে ও নির্মাণ কৌশলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পূজাপার্বণ ও ধর্মানুষ্ঠান

গ্রামের প্রায় প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য বাড়িতে এবং কায়স্থ প্রভৃতির মধ্যে কতক বাড়িতে শালগ্রাম ও লক্ষ্মী গোবিন্দের নিত্য পূজা হইত। দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী প্রভৃতির বার্ষিক পূজা বাদ যাইত না। অনেক বাড়িতে স্থাপিত কালী, শিব ও মনসা বিগ্রহ ছিল। বিজয় গুপ্তের প্রচারিত মনসা তো বিশেষ প্রসিদ্ধ। পাড়ায় পাড়ায় খোলায় ও বাজারে রক্ষাকালী, শ্মশানকালী ও জয়দুর্গার বারোয়ারী পূজা হইত। অশুভ সম্ভাবনা দূর করার জন্য কালী, জ্বরকালী ও শীতলা পূজা হইত। অনেক খোলায় প্রতি বৎসরই শীতলা ও জয়দুর্গা পূজা হইত। শান্তি স্বস্ত্যয়ন, চণ্ডী পাঠ প্রভৃতি কোনটাই বাদ ছিল না। অনেক সময় শীতলা ও কালীর নামে থালা নামান হইত। ছড়া গান গাহিতে গাহিতে মহিলারা এই থালা নিয়া বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করিয়া পূজা সম্পন্ন করিতেন।

গোবিন্দকে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুর্জ বিষ্ণু ও লক্ষ্মীকে কমলাসনস্থা লক্ষ্মীর ধ্যানে পূজা হইত। কিন্তু অধিকাংশ বাড়িতেই গোবিন্দ মূর্তি ছিলেন দ্বিভুজ মুরলীধারী, লক্ষ্মীও পদ্মাসনা ছিলেন না। মনে হয় চৈতন্যদেবের আর্বিভাবের পর বিষ্ণু ও কৃষ্ণ কেবল যে সত্তায় ও ভাবে তাহা নয় মূর্তিতেও এক হইয়া গিয়াছিলেন।

কোনও উপলক্ষেই গৃহদেবতার পূজা প্রথমে না করিয়া অন্য দেবতার পূজা করার নিয়ম ছিল না। এই সব নিত্য পূজা অধিকাংশ ব্রাহ্মণ বাড়িতেই গৃহস্থেরা নিজেরা সম্পন্ন করিতেন। কোনও কোন ব্রাহ্মণ বাড়িতে এবং বৈদ্য প্রভৃতি অন্য সকলের বাড়িতেই বারেন্দ্র শ্রেণীর দুই তিন ঘর ব্রাহ্মণ নিত্য পূজা সম্পন্ন করিতেন। শেষের দিকে কয়েক বৎসর দারোগা বাড়ির গৃহস্থেরা (বৈদ্যজাতীয়) নিজেরাই নিত্য পূজা করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের গ্রামে স্থিতির পূর্বে সম্ভবত পুরোহিতরাই নিজ নিজ যজমান বাড়িতে নিত্যপূজা সম্পন্ন করিতেন।

সিদ্ধেশ্বরী বাড়িতে কালীমূর্তি ও কষ্টিপাথরে খোদিত সুন্দর বাসুদেব মূর্তি ও সিংহপাশ! চক্রবর্তীদের বাড়িতে কালীমূর্তি, দাশের বাড়ি বড় হিস্যায় পঞ্চমুণ্ডী আসনের উপরে স্থাপিত কালীমূর্তি, মিশ্র বাড়ির মনসা, বেজের পাড়ে পাষাণময়ী কালীমূর্তি, মধ্যের বাড়ি পাষাণময়ী কালী, শিব বাড়িতে শিব ও চৌধুরী বাড়িতে স্থাপিত কালীমূর্তি আছে। ইহাদের নিত্য পূজা হইত। কয়েকটি কালীমন্দিরে প্রতি অমাবস্যায় ছাগ বলি দেওয়া হইত।

অনেক বাড়িতে •বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে চণ্ডীপাঠ ও সারা বৈশাখ মাস ব্যাপী নারায়ণকে তুলসী দেওয়ার ও প্রতি পুর্ণিমায় নারায়ণের অভিষেকের ব্যবস্থা ছিল।

মনসা বাড়ি

গ্রামের মনসা বাড়ি বিশেষ বিখ্যাত। মনসাদেবী খুব জাগ্রত বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। বরিশাল জিলা ও পার্শ্ববর্তী ফরিদপুর, নোয়া-থালি প্রভৃতি জিলা হইতে বহুলোক প্রতি বৎসর দেবী দর্শন করিতে ও পূজা দিতে আসেন। ইহাদের অধিকাংশ বিশেষ কোনও কামনা (যেমন

পুত্রলাভ বা কোনও তুরারোগ্য ব্যাধির কবল হইতে মুক্তি) নিয়া আসেন এবং কেহ কেহ দেবী মন্দিরের সম্মুখে হত্যা দিয়া থাকেন। মন্দিরের সম্মুখেব আটচালা ঘরে ও কোন কোনও সময়ে পাশ্ববর্ত্তী খালে নৌকায় যাত্রীরা থাকিতেন।

মনসা পূজা শ্রাবণ মাসের প্রথম দিন হইতেই আরম্ভ হইয়া সংক্রান্তির দিনে শেষ হয়। সুতবাং দেবী পূজাব এই মুখ্য মাসেই লোক সমাগম বেশি হইত।

মন্দিরের মধ্যস্থলে অবস্থিত দেবীর পিতলের মূর্তিটি ২॥ (আড়াই) ফুট উঁচু স্বর্ণাভ পিতলেব পদ্মাসনেব উপবে দণ্ডায়মান। পদতলে তুইটি হংস ও বিশালকায একটি সর্প। মায়েব মুখ হাস্যোজ্জ্বল ও জীবন্ত। পশ্চাতে বৃত্তাকারে নির্মিত কারুকার্য্য মণ্ডিত পিতলের পট। পটেব উপর দেবীর মূর্তিব কিঞ্চিৎ উর্ধ্বে বৃষভারূঢ় ক্ষুদ্র মহাদেবেব মূর্তি। দক্ষিণে ও বামে অপর তুই হংসারূঢা চামরব্যজন রতা দেবীমূর্তি।

দেবীর মূর্তির সম্মুখে বিশালাকার ঘট স্থাপিত। বহুপূর্বে এই ঘটেই দেবীর পূজা হইত। পবে মৃত্তিকা নির্মিত মূর্তি তৈয়াব হয়। অনেক কাল পরে দাশের বাড়ির বড হিস্যার নীলকমল দাশ (কেহ কেহ বলেন গুরুপ্রসাদ দাশ) মাযের পিতলের মূর্তি নির্মাণ করাইযা দেন।

কিংবদন্তী এবং বহুলোকের বিশ্বাস যে স্বপ্নদর্শনের পর বিজয় গুপ্ত পবের দিন ভোর বেলা বর্তমান মনসা কুণ্ড বা দীঘির পূর্বাংশে ডুব দিয়া এই ঘট, কোশাকুশি, শঙ্খ ও ধূপচি উত্তোলন করেন এবং তদবধি এই মূল ঘটেই উপরোক্ত উপকরণ সাহায্যে পূজা হইয়া আসিতেছে। আবার ক্ষীণ একটা জনশ্রুতি এও আছে যে বিজয় গুপ্তের সময়ের পূর্ব হইতেই ঐ খানে মনসার ঘট ও পূজার ব্যবস্থা ছিল, যদিও তখন নিত্য নিয়মিত পূজা হইত না। যাহার ইচ্ছা হয় পূজা দিয়া যাইত এবং সেই ঘটই বর্ত্তমানে দেবীর সম্মুখে মূল ঘট। মুদ্রিত মনসামঙ্গল গ্রন্থে এ বিষয়ে কিছুই নাই। স্বপ্নাধ্যায় শীর্ষক পালায় আছে "হেন মতে স্বপন কথা

কহিয়া উপদেশ। নাগরথে চলি গেল আপানার দেশ॥ স্বপ্ন দেখি বিজয় গুপ্তের দূরে গেল নিন্দ। হরি হরি নারায়ণ স্মরয়ে গোবিন্দ॥ প্রভাত সময়ে প্রকাশ দশ দিশা। স্নান করি বিজয় গুপ্ত পূজিল মনসা॥ হরি নারায়ণ ভাবি নির্মল করি চিত। রচিতে আরম্ভ করে মনসার গীত॥" (প্যারীমোহন দাশগুপ্ত সংকলিত বরিশাল আদর্শ প্রেসে ১৩১৩ সালে মুদ্রিত বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল)। ইহার মধ্যে বিজয় গুপ্ত যে পুকুরে ঘট পাইয়াছিলেন তাহার কোন কথা নাই। কোথায় বা মনসা পূজা করিলেন তাহাও কিছু লিখেন নাই। বিজয় গুপ্তের পূর্ব সময় হইতেই ওখানে যদি পূজার ঘট বা পূজার অন্য ব্যবস্থা থাকিত তবে তাঁহার স্বপ্নে দেবীর দর্শন ও মনসামঙ্গল রচিত আদেশ পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ বোধ্য হয়। কিন্তু এ বিষয়ে স্মরণ করা যাইতে পারে যে মধ্যযুগে যে সমস্ত মঙ্গলগ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহার অনেক বইতেই এইরূপ স্বপ্নাদেশের উল্লেখ পাওয়া যায় ও সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা ইহা নির্ভরযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। এখন এ বিষয়ে সঠিক কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলের সময়েব পর হইতে যে ওখানে বরাবরই দেবীর পূজা চলিয়া আসিতেছে সে বিষয়ে কোনও মতভেদ নাই।

পিতলের মূর্তি নির্মাণের পর দাশের বাডির বড় হিস্যাব গুরুপ্রসাদ দাশের সহধর্মিণী দেবীর পাকা মন্দির নির্মাণ করান। এই ইষ্টক নির্মিত মন্দির প্রায় ১৩ হাত দীর্ঘ ও ৮ হাত প্রস্থ। মন্দিরের মূলকোঠার সম্মুখে সংলগ্ন বারেন্দা ও তৎসংলগ্ন প্রশস্ত পাকা পোস্তা। সামনেই আটচালা ঘর। এখানে অনেক সময় ৩।৫।৭ দিন ধরিয়া মনসার রয়ানী (পশ্চিম বঙ্গের ভাষায় 'ভাসান') গান হইত। দক্ষিণ দিকে প্রোথিত যূপকাষ্ঠ।

পাশের বড় দীঘি প্রথমে কে যে কাটান ঠিক জানা যায় না। পূর্বে ইহাকে মনসাকুণ্ড বলা হইত। প্রায় ৮০।৮৫ বৎসর পূর্বে ইহা একবার সংস্কার করা হইয়াছিল এবং গুরুপ্রসাদ দাশের পুত্র রামচন্দ্র

পুরুষদের ব্যবহারের জন্য দক্ষিণপারে ইষ্টক নির্মিত ঘাটলা (ঘাট) তৈয়ার করেন। পূর্বপারের পাকা ঘাট নির্মাণ করেন নরসিংহ দাশের বাড়ির চন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের সহধর্মিণী কামিনী সুন্দরী দেবী। পরে দীঘি ও দক্ষিণের পারের পাকাঘাট রামচন্দ্রের পুত্র বিপিন বিহারী দাশ সংস্কার করেন এবং মন্দিব সংস্কার করেন অপর পুত্র শশীভূষণ।

মন্দিরের দক্ষিণ পশ্চিমে ও মনসা দীঘির দক্ষিণ পারে প্রায় ১৫০।১৬০ হাত ব্যবধানে বিজয গুপ্তেব পরিত্যক্ত ভদ্রাসন বাটির উচ্চ ভূমিখণ্ড বিদ্যমান।

দাশের বাড়ির বড হিস্যার মালিকগণ মনসা বাড়ির মন্দিরাদির বক্ষণাবেক্ষণ কবেন ও পূজাদির তদারক করেন। তাঁহাদের কুল-পুবোহিতগণ মন্দিরেব সংলগ্ন বাড়িতে বাস কবেন ও দেবীর পূজাদি করেন। দেশবিভাগেব পবেও বড হিস্যার নারাযণ প্রসাদ পুজা অর্চনা নিযমিত ভাবে যাহাতে হয় তাহার ব্যবস্থা কবিতেছেন।

দুর্গোৎসব

বার্ষিক পূজার মধ্যে অন্যান্য স্থানেব মত এ গ্রামেও দুর্গাপূজাই প্রধান পূজা ও উৎসব ছিল। যাঁহারা পডাশুনা কি অর্থোপার্জনের জন্য বিদেশে থাকিতেন তাঁহারা প্রায় সকলেই সপরিবারে পূজার সময় বাড়ি আসিয়া আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি সহ মিলিত হইতেন। গ্রামটি তখন লোকে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। ষষ্ঠীর দিন হইতে ঢাক ঢোল, নাকারা টিকারা, সানাই প্রভৃতি বাদ্যে গ্রাম মুখরিত থাকিত। গ্রামে প্রায় ২২৫ খানার বেশি দুর্গাপূজা হইত। অনেক বাড়িতে সাধারণ ভাবে পূজা সম্পন্ন হইত, কিন্তু আত্মীয় স্বজনদের

নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান হইত। কোনও কোনও ভূম্যধিকারীর বাড়িতে প্রজারা প্রসাদ পাইত। জাতিধর্ম নির্বিশেষে লোকে আসিয়া প্রতিমা দর্শন করিত ও নারিকেলের সন্দেশ (লাড়ু), কলা, ইক্ষু প্রভৃতি অন্যান্য প্রসাদ নিত। মুসলমান প্রজারাও আসিযা কলা, সন্দেশ প্রভৃতি প্রসাদ নিতে বাধা করিত না। পূজার কয় দিন সকলেই বেশ আনন্দে কাটাইতেন।

তর্কবাগীশের বাড়ি পক্ষাবৃত্তি পূজা ছিল অর্থাৎ পূর্বেব কৃষ্ণা নবমীতে পূজা আরম্ভ হইয়া অন্যান্যদের ন্যায শুক্লা দশমীতে শেষ হইত। অধিকাংশ বাড়িতেই বৃহৎ নন্দিকেশ্বর পুবাণ মতে, কোনও বাড়িতে কালিকা পুরাণ বা দেবী পুরাণ মতে পূজা হইত। সব বাড়িতেই বলিদান (পাঁঠা) হইত (এক বাড়িতে মাত্র পাঁঠা বলি পবে বন্ধ হইযাছিল)। ৫০।৬০ বৎসব পূর্বে প্রায ২৫ বাড়িতে নবমীর দিন মহিষ বলি হইত ও ঐ উপলক্ষে ধুমধাম হইত। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। কিছুটা সে জন্য ও কতকটা আর্থিক কাবণেও কয়েক বাড়ির মহিষ বলি পরে বন্ধ হইয়াছিল। নবমীর দিন চালকুমডা, শশা, ইক্ষু ও শত্রু বলি হইত। কচুপাতার উপরে চালের গুড়া দিয়া মানুষের এক পুত্তলি গড়া হইত। উহা কাল বর্ণের বস্ত্রখণ্ড দিয়া মোড়া থাকিত। অন্য বলির পর এই পুত্তলি (শত্রু) বলি হইত।

কাঠামে দুর্গামূর্তির ডান দিকে লক্ষ্মী ও পরে কার্তিক ও বাম দিকে সরস্বতী ও গণেশের মূর্তি থাকিত। সমস্ত মূর্তিগুলিই এক কাঠামে যুক্ত থাকিত। বিনায়ক সেন বংশের দুর্গা পূজায় কাঠামে লক্ষ্মী সরস্বতী মূর্তি থাকিত না।

বিধবা স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেকে পূজার দিনে অন্ন গ্রহণ করিতেন না কেবল মায়ের প্রসাদ মিষ্ট বা দুধ কলা খাইয়া থাকিতেন। কোনও কোনও বৈদ্য বা কায়স্থ বিধবারা ব্রাহ্মণ বাড়িতে প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। সন্ধি পূজার বলিদানের চালকুমড়ায় খণ্ড অনেক

কৃষিজীবী মাঠে ফসল বৃদ্ধি হইবে এই বিশ্বাসে নিজ জমিতে ছড়াইয়া দিতেন।

নবমীর দিন রাত্রে নিম্নশ্রেণীব অনেক হিন্দুরা দলে দলে "নবমী গাইতে" অর্থাৎ মাতৃ বন্দনা গাইতে আসিতেন। পুরস্কার স্বরূপ তাহাদের একটা বা একজোড়া নারিকেল দেওয়া হইত। বন্দনা গানের প্রথমাংশ এইরূপ :

প্রথমে বন্দিলাম মোরা গণেশের চবণ
সিদ্ধিদাতা বলে যারে পূজে সর্বজন।
তাবপব বন্দিলাম মোরা শ্রীদুর্গাব চরণ
ত্রিজগতের মাতা যিনি জানে সর্বজন।

দশমীব দিন বিকাল বেলায বাটীস্থ মহিলাবা ও প্রতিবেশী স্ত্রীলোকগণ একসঙ্গে উলুধ্বনি ও ববণ বাদ্য সহযোগে মা দুর্গাব বিদায় বরণ ও আরতি করিতেন। বরণেব সময় মাব মুখে সন্দেশ ও পান ছোয়াইয়া দিতেন ও পান দিয়া প্রতিমার মুখ মোছাইয়া দিতেন। বরণান্তে রাত্রিতে নিজ নিজ পুকুরে বা পাশের খালে প্রতিমা বিসর্জন কবা হইত। প্রতিমা বিসর্জন করিতে বাহিব হওয়ার সময় অনেকে 'যাত্রা' করিয়া নিতেন। সম্বৎসব তাঁহাবা আর শুভদিন দেখিয়া যাত্রার প্রয়োজন মনে করিতেন না।

বহুকাল পূর্বে রামনাথ দাশের বাড়িতে আড়ং হইত অর্থাৎ সকলে নৌকা করিয়া নিজ নিজ প্রতিমা, ঢাক, ঢোল, বাজি ও আলো, মশাল প্রভৃতি নিয়া রামনাথ দাশের দরজায় উপস্থিত হইতেন ও সেখানে আরতি ও আনন্দ করিয়া ও বাজি পোড়াইয়া অনেক রাত্রে পুনরায় প্রতিমা সহ বাড়ি ফিরিয়া নিজ বাড়িতে প্রতিমা বিসর্জন করিতেন। পরে এই আড়ং বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর দাশের বাড়ির দরজার খালে আবার কতক কতক প্রতিমা এই ভাবে আনা হইত ও আড়ং মিলিত। বলা বাহুল্য আড়ং উপলক্ষে ছোট ছোট মেলাও বসিত।

বিসর্জনান্তে প্রণাম ও আলিঙ্গনের পালা। সকলে প্রথমে গুরুজনদের প্রণাম করিতেন। তাঁহারাও ধান ও দুর্বা উহাদের মাথায় দিয়া আশীর্বাদ ও আলিঙ্গন করিতেন এবং নারিকেলের লাড়ু ও বাতাসা হাতে দিতেন। গুরুজনদের পরে বাড়ির ও জ্ঞাতিদের বাড়ি যাইয়া এইরূপ প্রণাম ও আলিঙ্গন চলিত। কোনও কোনও বাড়িতে গুরুজনেরা প্রণামের পর সকলের কপালে চন্দন মাখাইয়া দিতেন। ইহার পর প্রশস্তি বন্দন হইত (কোনও কোনও বাড়িতে প্রশস্তি বন্দনের পর আলিঙ্গনাদি হইত)। বরণকুলার ২২টি মাঙ্গলিক দ্রব্য মন্ত্র পডিয়া উপস্থিত সকলেব মাথায় ছোয়ান হইত। পরে সম্পূর্ণ বরণকুলা এক সঙ্গে এই ভাবে ছোয়ান হইত।

পরের দিন অর্থাৎ বারদশহরার দিন হইতে বাডিতে বাড়িতে গিয়া দেখা সাক্ষাৎ, প্রণাম ও আলিঙ্গন চলিত। প্রত্যেককেই এই সময় নারিকেলের লাড়ু, বাতাসা এবং অন্যবিধ মিষ্ট দ্রব্য ও তালশাস প্রভৃতি দেওয়া হইত। এইরূপ দেখা সাক্ষাৎ কালীপূজা পর্য্যন্ত চলিত। অনেক বাডিতে ৵পূজার পর আত্মীয় স্বজনদেব নিমন্ত্রণ কবিয়া খাওয়ান হইত।

সিহিপাশার কুম্ভকাবেরাই প্রতিমা গড়িত।

পূজার আনন্দ ভিন্ন এই সময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ছোট খাট সভা অনেক হইত। গৈলা স্কুলের বার্ষিক সাধারণ সভা শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন হইত। গার্ল্‌স স্কুলের সাধারণ সভা, কবীন্দ্র কলেজের বার্ষিক সভা ও দেবালয় সমিতি, বাল্যাশ্রম, বালক সমিতি প্রভৃতি পাড়ার ছোট খাট অনেক সভার বার্ষিক অধিবেশন এই সময় অনুষ্ঠিত হইত। বিভিন্ন পাড়ায় যুবকেরা কোনও কোনও বৎসর নাট্যাভিনয় করিত। পরের দিকে নাট্যানুষ্ঠান অনেক কমিয়া গিয়াছিল। মাঝে মাঝে কোনও বাড়িতে যাত্রা গান হইত।

দেশ বিভাগের ফলে বহু লোক গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতা অঞ্চলে

চলিয়া আসেন। অনেকে প্রথম কয়েক বৎসর কোনও 'লোক পাঠাইয়া বা অন্যের নিকট টাকা পাঠাইয়া বাড়ির পূজা রক্ষা করিতেন কিন্তু মনিঅর্ডার পাঠাইবার অসুবিধার জন্য, ১৯৫০ সালের দাঙ্গা হাঙ্গামার পর এবং সবোপরি পুনরায় কোনও কালে দেশে ফিরিয়া যাওয়া সম্বন্ধে হতাশার জন্য ক্রমে ক্রমে বাড়ির পূজাপার্বণাদি বন্ধ করিয়া দেন। এখন গ্রামে কয়েক বাড়ি মাত্র দুর্গাপূজা হয়। গৈলার প্রায় ১০।১২ বাড়ির লোক কলিকাতায় নিজেদেব বাড়িতে এখন পুজা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।

অন্যান্য পূজাপার্বণ

দুর্গা পূজার পরের পুর্ণিমাতে প্রতি হিন্দু ঘরেই লক্ষ্মীপুজা অনুষ্ঠিত হইত। গৃহকর্ত্রীরা এবং বধুগণ উপবাসী থাকিয়া রাত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিতেন। ঘটের উপব পুজা হইত। অবশ্য অনেক সময় লক্ষ্মীর শরা এবং একখানা ছোট প্রতিমা থাকিত। অনেক বাড়িতে পাঁঠা বলি হইত। এই পুজায় নলটুঙ্গি ও সুন্দিফুল আবশ্যিক বিবেচিত হইত।

দীপান্বিতা কালীপুজায় ঘরের প্রতি কোণে, চারিদিকে এবং সমগ্র বাড়িতে মৃত্তিকা নির্মিত 'মুছিতে' প্রদীপ জ্বালান হইত। কলা-গাছের ভেলায় রঙ্গীন কাগজ দিয়া নৌকা বা জাহাজ তৈরী করিয়া মশাল, মোমবাতি ইত্যাদি আলো দ্বারা সাজাইয়া পুকুরে বা বাড়ির পাশের ছোট খালে ভাসাইয়া দেওয়া হইত। কোনও কোনও বাড়িতে ছাগের পরিবর্তে মেষ বলি দেওয়া হইত।

জগদ্ধাত্রী বা বাসন্তী পুজা খুব অল্প সংখ্যক বাড়িতেই সম্পন্ন হইত।

কার্ত্তিক পুজায় কিছুদিন পুর্বে মূল ঘট স্থাপনের জায়গার চতুর্দিকে ধানের বীজ রোপন করা হইত। পুজা অন্তে ঐ সব ধানের চারা বা 'হাজা' বসতি ঘরের খুঁটি বা অন্য কোন ও স্থানে বাঁধিয়া রাখা হইত।

সরস্বতী পূজাতে বাড়িতে প্রতিমা অনেকক্ষেত্রেই আঁনা হইত না, ঘটের উপর পূজা হইত। শেষের দিকে প্রতিমার চল হইয়াছিল। গৈলা স্কুলে, কবীন্দ্র কলেজে ও বেজের পাড়ের টোলে প্রতিমা আনা হইত এবং সমারোহ সহকারে পূজা সম্পন্ন হইত। অনেক সময় ঐ সব প্রতিষ্ঠানে যাত্রা গানও হইত। সবস্বতী প্রতিমা বিসর্জন করা হইত না, ঘরে রাখিয়া দেওয়া হইত।

দোলযাত্রায় সময় কোনও কোনও বাড়ি হইতে লক্ষ্মী গোবিন্দ দোলায় করিয়া আত্মীয় স্বজনের বাড়ি নেওয়া হইত। অনেক বাড়িতেই ফাল্গুনী পুর্ণিমায় না হইয়া পরের পঞ্চমী তিথিতে দোলপূজা সম্পন্ন হইত। সাধারণত মাটি দিয়া দোলমঞ্চ নির্মাণ করা হইত। কোনও কোনও বাড়িতে ইষ্টক নির্মিত পাঁকা দোলমঞ্চ ছিল। দোলপূজার পূর্ব রাত্রে নারিকেলের শুকনা 'বাইল' (ডাল সহ পাতা) দিয়া 'বুড়ীর ঘর' নির্মাণ করিয়া তাহা পোড়ানো হইত।

চৈত্র মাসের শেষে নীল পূজা হইত। সাধারণত ইহা বৈদ্যদের বাড়িতেই সম্পন্ন হইত। চারিদিন ধরিয়া এই পূজা হইত। প্রথমে 'শিকার', গৃহসন্ন্যাস, বাজার (বা হাট) সন্ন্যাস, পরে চৈত্র সংক্রান্তির দিনে শিব ও কন্দর্প পূজা করিয়া শেষ করা হইত। হাট বা বাজার সন্ন্যাসের দিন হাট বা বাজারে গিয়া বাদ্য বাজনা সহকারে উৎসব করা হইত। 'বালারা' নানা রকম গান করিত ও নৃত্য করিত ও বাড়ি বাড়ি গিয়া নীলের ছড়া আবৃত্তি এবং শিবের কাছে গৃহস্থদের জন্য মঙ্গল কামনা করিত।

চৈত্র সংক্রান্তির দিন রামনাথ দাশের বাড়ির দরজায় বড় মেলা বসিত এবং অনেক লোক সমবেত হইত। ইহাকে স্থানীয় ভাষায় 'থোল' বলা হইত। বাজারে ও নরসিংহ দাশের বাড়ির দরজায়ও থোল বসিত। রামনাথ দাশের বাড়ির কর্তৃপক্ষ কয়েক বৎসর থোলে আগত প্রত্যেক ব্রাহ্মনকে ১ পয়সা করিয়া 'থোল' খরচ দিতেন। চৈত্র সংক্রান্তির দিন.

প্রত্যেক বাড়িতেই অভিভাবক ও গুরুজনেরা সকলকে (মায় গুরু পুরোহিত এবং চাকর) থৌল খরচ বাবদ কিছু কিছু টাকা বা আনা বা পয়সা দিতেন। থৌল কিন্তু চৈত্রসংক্রান্তির দিনেই শেষ হইত না। পরের দিন ১লা বৈশাখ সকাল বেলায়ও থৌল হইত। এই মেলায় চুন, রান্নার নানা রকম মশল্লা ও নানাবিধ সাংসারিক প্রয়োজনের জিনিস ও জিলিপি বিক্রয় হইত। ইহার পরে গ্রামের অনেক বাড়িতে দুই দিন করিয়া ঐ রূপ থৌল (একটু ছোট আকারে) হইত। সারা বৈশাখ মাস ধরিয়া কোনও না কোনও বাড়িতে এই থৌল হইত। ঢাকের বাদ্য থৌলের প্রায় অঙ্গ স্বরূপ ছিল।

পূর্বে গ্রামে রথোৎসব ছিল না। চন্দ্রকুমার দাস প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে ইন্দ্রসেনের পাড়ে নিজ বাড়িতে এই উৎসব প্রবর্তন করেন। বড় রাস্তার পাশে তাঁহার নিজ বাড়ি হইতে স্কুলের সম্মুখের রাস্তা দিয়া রথ টানা হইত। সমগ্র গ্রামে এই একমাত্র রথোৎসব, কাজেই গ্রামের লোকেরা এবং আশে পাশের অনেক গ্রামের লোক এই উৎসবে যোগ দিতেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে রথে যখন প্রথম হুলুধ্বনি সহকারে আরোহন করান হইত সেই সময় হইতেই 'হরিবোল ধ্বনি' ক্রমশ চলিত। রাস্তার দুই পাশে রথ উপলক্ষে মেলা বসিত।

মনসা পূজার ঘট ১লা শ্রাবণ তারিখে স্থাপন করা হইত। সারা মাস পূজার পর সংক্রান্তি দিনে পাঁঠা বলি সহ ঐ পূজা শেষ হইত। এই সময়ে এক মাস ধরিয়া বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল স্ত্রীলোকেরা রোজই একটু একটু করিয়া পড়িয়া মাসের শেষ দিনে সমাপ্ত করিতেন।

ভাদ্র মাসে সংক্রান্তি দিন বহু বাড়িতেই বিশ্বকর্মা পূজা হইত ও দা, খন্তা, বটি, কুড়াল প্রভৃতিতে ও লোহার ও কাঠের সিন্দুকে সিন্দুরের পুতলি আঁকা হইত। কর্মকারগণ বিশেষ ঘটা ও ধুমধামের সহিত এই পূজা সম্পন্ন করিতেন।

বৈকালে রামনাথ দাশের বাড়ির দরজার খালে 'বাইচ' (নৌকা

দৌড়') হইত ও বহুলোক উহা দেখিতে সমবেত হইত। ঐ সময়ে ছোট একটি মেলাও বসিত। প্রচুর বিলাতী আমড়া ও ইক্ষু ঐ সময়ে বিক্রী হইত। 'বাইচে যে নৌকা প্রথম হইত সেই নৌকার মাঝি মাল্লারা পুরস্কার পাইত। শেষের দিকে গৈলা স্কুলের সামনের খালে গৈলা বাজারের তত্ত্বাবধায়ক 'ওমর খাঁ' বাইচ প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। এখানেও বহু লোক উপস্থিত হইত। ঐ 'বাইচ' কে 'ওমর খাঁর বাইচ' বলা হইত। ফুল্লশ্রীর প্রান্তবর্তী আগৈলঝাড়া হাটের পশ্চিম দিকের ও সোমদ্দার বাড়ির পশ্চিম দিয়া তপাদার বাড়ির উত্তর পর্যন্ত খালেও বাইচ হইত।

বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে হরিনাম সংকীর্তন (হরির লুট) হইত ও মাঝে মাঝে শনি ও সত্যনারায়ণের সিন্নি হইত। কলা, দুধ, গুড়, চাউলের গুড়া, ডাব নারিকেলের জল এবং বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে আম ও কাঠাল সংযোগে ঐ সিন্নি অতি উপাদেয় হইত। শেষের দিকে কেহ কেহ সিন্নির পরিবর্তে বাতাসার ব্যবস্থা করিতেন। উহাকে পাকা সিন্নি বলা হইত।

বসত বাড়িতে ও ভূম্যধিকারীদের তালুকদারী সম্পত্তির উপরে বাস্তু পূজা হইত। এই উপলক্ষে পাঁঠা বলি হইত। কার্তিক মাসে অনেক বাড়িতেই 'আকাশ প্রদীপ' দেওয়া হইত।

নবান্ন একটি বিশেষ আনন্দের উৎসব ছিল। অগ্রহায়ণ মাসে যখন নূতন ধান্য মাঠে কাটা ও বাড়িতে আনা হইত তখন শুক্লা পক্ষের কোনও শুভ দিনে এই উৎসব পালন করা হইত। পূর্বপুরুষদের তৃপ্তির জন্য পার্বণ শ্রাদ্ধ করা হইত। পরে নূতন চাউল গুড়া করিয়া, ডাব নারিকেলের জল, নারিকেল কোড়া ও নূতন পাটালিগুড়ে ও সম্ভব হইলে কমলার রসে মাখিয়া এক উৎকৃষ্ট খাদ্য তৈয়ার হইত। এই উপলক্ষে জ্ঞাতি ও আত্মীয় স্বজন নিমন্ত্রিত হইত। প্রথমে ঐ 'চাল মাখা' ইতর প্রাণীর প্রতি প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ কোনও দাড়কাককে খাওয়াইতে হইত। ইহাকে

'কাক বলি' বলা হইত। পরে বাড়ির ও নিমন্ত্রিত লোকেরা খাইতেন। গোড়ার দিকে সাধারণত দিনে আর ভাত খাওয়া হইত না। রাত্রে বিভিন্ন ব্যঞ্জন সহ নূতন চাউলের ভাতের নবান্ন খাওয়া হইত এবং কাঠ, পাতা প্রভৃতি দ্বারা উঁচু করিয়া আগুন জ্বালান হইত। এই পর্বটি বরিশাল জিলার নিজস্ব।

শিবরাত্রি উপলক্ষে বিধবা স্ত্রীলোকেরা ও বৃদ্ধদের কেহ কেহ দিবাভাগে উপবাস করিতেন ও রাত্রে শিব পূজা সমাপনান্তে ব্রত কথা শুনিয়া জল গ্রহণ করিতেন এবং পরের দিন কোনও ব্রাহ্মণকে পারণ করাইয়া নিজেরা উপবাস ভঙ্গ করিতেন।

স্ত্রীলোকেরা বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন ব্রত করিতেন। বিবাহেব পর প্রথমেই পঞ্চমীর ব্রত ও পবে এয়োসংক্রান্তি, ফলদান, সাবিত্রী, অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় সিন্দুর, ডোরের ব্রত, অশোকাষ্টমী, রামনবমী প্রভৃতি সব রকম ব্রতই কেহ না কেহ উদ্‌যাপন করিতেন। কেহ কেহ ব্রত সমাপন উপলক্ষে অনেক লোক খাওয়াইতেন ও পুরোহিতকে বহু জিনিস পত্র দান কবিতেন। এই ভাবে ব্রত শেষ করাকে 'ব্রত প্রতিষ্ঠা' করা বলা হইত।

কুমারীরা 'যমবুড়ী' 'থুরপোলী' 'মাঘমণ্ডল' ও 'তারা' প্রভৃতি নানাবিধ ব্রত করিত।

গ্রামের খ্রীষ্টান অধিবাসীরা পাডাস্থ ভজন গৃহে প্রতি রবিবারে সকাল বেলা সমবেত হইয়া ভজন গান করিতেন। অন্যান্য পর্বাদি উপলক্ষেও তাঁহারা ভজন গৃহে সমবেত হইতেন।

মুসলমানগণের জন্য ফুল্লশ্রীর রাস্তার পাশের মসজিদ ছিল। এখানে শুক্রবারে অনেকে একসঙ্গে ও অন্যান্য দিনও কেহ কেহ নমাজ পড়িতেন।

বিভিন্ন উপায়ে ধর্মসাধনা

ইংবেজী শিক্ষাব প্রভাবে কাহাবও কাহাবও মনে হিন্দুধর্মেব প্রচলিত আচাব অনুষ্ঠান ও বাহ্যপূজাব উপযোগিতা বিষযে সন্দেহ উপস্থিত হয় ও ভিন্নভাবে ভগবৎ সান্নিধ্য লাভেব উপায তাঁহারা চিন্তা কবিতে থাকেন। তখন ব্রাহ্মধর্মেব প্রবল আন্দোলন চলিতেছিল। কালীমোহন দাশ ঐ ধর্মে আকৃষ্ট ও দীক্ষিত হ'ন। পবে ১৮৮৮ সালে এণ্ট্রান্স পবীক্ষা দেওয়াব পব নিমদাশেব বাড়িব ললিত মোহন দাস আনুষ্ঠানিক ভাবে ঐ ধর্ম গ্রহণ কবেন।

বাল্যকালেই তিনি ববিশাল ব্রজমোহন স্কুলে নিচেব ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। তখন তিনি অশ্বিনীকুমাব দত্ত ও হেডমাষ্টার জগদীশ মুখোপাধ্যাযেব সংস্পর্শে আসেন। তাহাদেব উপদেশে ও দৃষ্টান্তে ললিত মোহনের স্বাভাবিক সত্যনিষ্ঠা ও ভগবদ্ভক্তি পূর্ণ বিকাশ লাভ করাব সুযোগ পাইয়াছিল। তাঁহাবা উভয়ই তখন ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন। প্রতি রবিবাব দিন ললিত মোহন ব্রাহ্ম সমাজের 'সানডে সার্ভিসে' যোগ দিতেন ও ধর্মসংগীতে অংশগ্রহণ কবিতেন। কীর্তন গানে তাঁহার মাঝে মাঝে এত 'ভাব' হইত যে বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া 'দশায়' পড়িতেন। তিনি ছিলেন জগদীশেব প্রিয় ছাত্র। একদিন সন্ধ্যার পর নিজ বাসায়

একান্তে নিয়া জগদীশ ললিত মোহনের হাত দুইখানা ধরিয়া বলিলেন, "ললিত, এই হাত যেন চিরদিনই ভগবানের দিকে প্রসারিত থাকে।" ইহাতে তিনি হৃদয়ে গভীর প্রেরণা অনুভব করেন এবং ভগবান লাভের তীব্র আকাঙ্খা তাঁহার প্রাণে জাগিয়া উঠে। এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পর ২০ বৎসর বয়সেই ললিত মোহন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিতে মনস্থির করেন। তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও গ্রামের ও শহরের বহু লোক, এমন কি অশ্বিনীকুমার ও জগদীশ উভয়েই তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু স্থিরসংকল্প ললিত মোহন বিচলিত হইলেন না, আনুষ্ঠানিক ভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইলেন।

দাশের বাড়ির মেজ হিস্যার মতিলাল দাশও ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। শঙ্কর গুপ্তের বাড়িব শ্যামাচরণও ব্রাহ্ম পরিবারে বিবাহ করেন। আনুষ্ঠানিক ভাবে ঐ ধর্মে দীক্ষিত না হইয়াও অনেকে ব্রাহ্মভাবাপন্ন হইয়াছিলেন।

কেহ কেহ কুলগুরু ত্যাগ করিয়া সাধু সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। বৈদিক পাড়ার শীতল সাবর্ণ সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হ'ন ও শ্রীবেদানন্দ স্বামী নাম গ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রাম জিলার পটিয়া হইতে ৭ মাইল দূরে করালডাঙ্গা পাহাড শ্রেণীর মধ্যে শ্রীশ্রীচণ্ডী বর্ণিত মেধা মুনির আশ্রমস্থান নির্দেশ করেন ও সেখানে শ্রীশ্রীদুর্গার মন্দির ও মূর্তি নির্মাণ ও সেবা পূজার ব্যবস্থা করেন। বকশী বাড়ির কৈলাস চন্দ্র দাশের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীভো॰ানন্দ গিরি মহারাজের নিকট দীক্ষিত হইয়া শ্রীবৈদ্যনাথানন্দ গিরি নাম গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি গিরিমহারাজ প্রতিষ্ঠিত লালতারাবাগ আশ্রমে আছেন। শঙ্কর গুপ্তের বাড়ির শান্তিরঞ্জন গুপ্ত রামকৃষ্ণ মিশনে সন্ন্যাসী হ'ন ও শ্রীঅচ্যুতানন্দ স্বামী নাম গ্রহণ করেন। তিনি বর্তমানে কাশীধামে আছেন। ফুল্লশ্রীর নগেন্দ্র নাথ দাশ 'জয়গুরু ধর্মের' দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন। ইহা ভিন্ন গুরুনাথ সেন প্রবর্তিত 'সত্যধর্ম' ও শ্রীশ্রীচরণদাস বাবাজী ও ফরিদপুরের শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু প্রচারিত নাম কীর্তনও কাহাকে কাহাকে আকৃষ্ট করে

শিক্ষার বিবরণ

বহুকাল ধরিয়া গৈলায় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য প্রভৃতি মধ্যবিত্ত নানাশ্রেণীর লোকের বাস। তাহাদের চেষ্টায় শিক্ষাক্ষেত্রে গৈলা গ্রাম যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, অবশ্য প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল সংস্কৃত ও সাধারণ বাংলা শিক্ষা। মৌলভীদের নিকট ফারসী ভাষা শিক্ষারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

কলাপ ব্যাকরণের 'কাতন্ত্র পরিশিষ্ট' নামক বিখ্যাত টীকা রচয়িতা ত্রিলোচন দাশ কবীন্দ্রের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই টোল ও চতুষ্পাঠীতে এই কলাপ ব্যাকরণ শিক্ষার প্রচলন আছে। সঙ্গে সঙ্গে ত্রিলোচন দাশের টীকাও সর্বপ্রদেশে পঠিত ও সমাদৃত হয়।

দাশদের মধ্যে প্রসিদ্ধি যে বিক্রমপুর হইতে ত্রিলোচন দাশ প্রথমে বর্তমান যুগল দাশের বাড়ির কোনও পূর্বপুরুষের কাছে টোলে পড়িতে আসিয়াছিলেন। এই কথা যদি সত্য হয় তবে বুঝিতে হইবে যে, সে যুগে এখানকার টোল এত প্রসিদ্ধ ছিল যে বিক্রমপুর হইতেও লোকে এখানে সংস্কৃত পড়িতে আসিত। ত্রিলোচন দাশের কাল সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা হইয়াছে। ত্রিলোচনের পুত্র জানকীনাথ কবিকণ্ঠহার ও পৌত্র ভবানীনাথ দাশ সার্বভৌম ও প্রপৌত্র রঘুনাথ কবিকণ্ঠাভরণ বিশেষ সম্মানিত পণ্ডিত ছিলেন।

ত্রিলোচনের ভাগিনেয় কবিবর বিজয় গুপ্ত এবং তাঁহার প্রণীত মনসা-

মঙ্গলের বিষয়ে অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহার পূর্বে গ্রামে বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার কোনও প্রমাণ আমাদের নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি দাশের বাড়ির বড় হিস্যার পূর্বপুরুষ রায় কাশীনাথ দাস ও রামনাথ দাশের বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা রামনাথ দাশ ফারসী ভাষা শিক্ষা করিয়া নবাব সরকারের চাকরি করেন। রামশংকর পিপলাই ফারসী ভাষা শিক্ষা করিয়া ওকালতী করেন। কিন্তু কোথায় তাঁহারা ঐ ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন জানা যায় না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে কালুপাড়া সেনদের একজন পূর্বপুরুষ ইন্দ্রনারায়ণ নিজ বাটীতে টোল প্রতিষ্ঠা করেন। বেজের পাড়ে উহার পূর্ব হইতেই টোল ছিল। রামনাথ দাশের দত্তক পুত্র রামপ্রসাদ ঐ টোলে অধ্যয়ন করিতেন।

পূবপাড়ার শুকদেব সেন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও কবিরাজ ছিলেন। এতদ্ভিন্ন কাশীনাথ সেন ও রামভদ্র সেন ও গুপ্ত বংশীয় রামচন্দ্র কবিকণ্ঠহার বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। বৈদ্যজাতির মধ্যে পূর্বে যে সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার ছিল তাহা তাহাদের পূর্বপুরুষদের অনেকের নামের উপাধিতে সুচিত করে। ভট্টাচার্য বংশীয় গদাধর ন্যায়বাগীশ ও শ্যামকিশোর তর্কভূষণ প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ব্রাহ্মণ বংশের অনেকের পূর্বপুরুষের তর্কবাগীশ, ন্যায়ালঙ্কার, স্মৃতিরত্ন, বিদ্যারত্ন ইত্যাদি উপাধি তাহাদের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার সাক্ষ্য দেয়।

সংস্কৃত শিক্ষা

(উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী)

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাণেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন তাঁহার নিজ বাড়িতে (বর্তমান কৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্যের বাড়ি) এক টোল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ও তাঁহার পুত্রগণ সুপ্রসিদ্ধ রাধামোহন তর্কভূষণ, রূপচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, চন্দ্রনারায়ণ সিদ্ধান্ত ও রাজনারায়ণ বিদ্যাবাচস্পতি এই টোলে অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহাদেব মৃত্যুর পর এই টোল বন্ধ হইয়া যায়।

কবীন্দ্র বাড়ির মদনমোহন দাশ কবীন্দ্র আযুর্বেদ ও ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়ার জন্য উনবিংশ শতাব্দের প্রথমার্ধে নিজ বাড়িতে টোল স্থাপন করেন। দেশ বিদেশ হইতে বহুছাত্র তাঁহার নিকট শিক্ষার জন্য আসিত। কবীন্দ্র মহাশয়েব পরলোক গমনেব পব তাঁহার পুত্র ও বংশধরেরা ঐ টোল রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। এই টোলে প্রসিদ্ধি যে কলিকাতার বিখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন ও কৈলাশচন্দ্র সেন এবং ঢাকার কালী কবিরাজ এখানে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে ললিতমোহন দাশ কবিসাগরের বিশেষ চেষ্টায় ঐ টোল কলেজে পরিণত হয় এবং দেশবিভাগ পর্যন্ত বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা, ত্রিপুরা ও সুদূর শ্রীহট্ট প্রভৃতি জিলার বহু ছাত্র এখানে সংস্কৃত শিক্ষার সুযোগ লাভ করে। (কবীন্দ্র কলেজের বিস্তৃত বিবরণ পরে দেওয়া হইল।)

পূর্বেই বেজের পাড়ের টোলের বিষয় উল্লেখ হইয়াছে। কিন্তু তাহা বরাবর চলিয়া আসিতেছিল কিনা ঠিক জানা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে নিজ বাড়িতে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যাপনার জন্য কাশীনাথ ন্যায়ালঙ্কার টোল খোলেন এবং তদবধি তাঁহার বংশধরগণ ১৯৪৭ সন পর্য্যন্ত এই টোল চালাইয়া আসিয়াছেন এবং দেশ বিদেশের বহু ছাত্র

এখানে থাকার ও শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাইয়াছে। (ইহার বিস্তৃত বিবরণ পরে দেওয়া হইয়াছে।)

উপরোক্ত প্রসিদ্ধ টোল দুইটি ব্যতীত ছোট ছোট আরও টোল বিভিন্ন সময়ে বিদ্যমান ছিল। বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিমের বাড়ির কানাই বিদ্যাভূষণ ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যাপনার জন্য নিজ বাড়িতে টোল খোলেন। দুহিসেনের বাডিতে ব্যাকবণ ও কবিবাজী শিক্ষার জন্য হরকুমার সেনের টোল ছিল। বৈদিক পাডার পীতাম্বর বিদ্যাভূষণ নিজ বাডিতে টোল খুলিয়া বহু ছাত্রকে ব্যাকরণ শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। বিষ্ণু ন্যায়রত্ন নিজ বাডিতে ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। বেজেব পাড়ে কালীপ্রসন্ন তর্কচূডামণি নিজ বাডিতে স্মৃতিশাস্ত্র পড়াইতেন। তর্ক-বাগীশের বাডির প্রসন্নকুমার তর্করত্ন নিজ বাডিতে ন্যায়শাস্ত্র পডাইতেন ও রামচরণ শিরোরত্ন স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেন। মঠবাডিব নীলমণি বাচস্পতির টোল ছিল এবং বিংশ শতাব্দীতে শ্রী ঃসন্ন কাব্যতীর্থ নিজ বাড়িতে কিছুদিন ছাত্রদেব পডাইতেন। তর্কবাগীশের বাডির ভূদেব সাংখ্যতীর্থ অনেক বৎসব নিজ বাডিতে টোল খুলিয়া ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন।

এই সব টোলের অধ্যাপকগণ সাধারণত নিজ নিজ বাডিতে শিক্ষার্থীদের আহাব ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতেন। অনেক সময়ে গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে ছেলেরা থাকার ও আহারের ব্যবস্থা যোগাড় করিয়া নিত। প্রতি টোলে ছাত্র সংখ্যা খুব বেশী থাকিত না। ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের সংগে সংগে গ্রামের লোকের সংস্কৃত শিক্ষার আগ্রহ কমিতে লাগিল এবং শেষের দিকে কুলগুরু বংশ, পৌরোহিত্য ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ ও আয়ুর্বেদ শিক্ষার্থী ছাত্র ব্যতীত অপরে টোলের শিক্ষা গ্রহণ করিতে আগ্রহান্বিত ছিলেন না। গ্রামের লোকের বিদেশী ছাত্রদের বাড়িতে রাখার আগ্রহও হ্রাস পাইয়াছিল।

গ্রামে প্রথমে সংস্কৃত পরীক্ষার কেন্দ্র ছিল না তাহাতে ছাত্রদের খুব

অসুবিধা হইত। পরে গ্রামে "বাকলা আর্য সম্মিলনী সভা" স্থাপিত হয় ও তাহার চেষ্টায় কবীন্দ্র কলেজে প্রথম আদ্য, মধ্য ও পরে স্মৃতি ও দর্শন ভিন্ন অন্য সব বিষয়ের উপাধি পরীক্ষা গৃহীত হইত।

কবীন্দ্র কলেজ

পূর্বেই বলা হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ললিতমোহন দাশ কবিসাগর তাঁহার স্বনামধন্য পূর্বপুরুষ মদন কবীন্দ্র প্রতিষ্ঠিত টোলকে কলেজে পরিণত করেন। ইনি ছিলেন বিরাট পণ্ডিত। যখন প্রতি টোলে ছাত্রসংখ্যা কমিয়া গেল তখন তিনি নিজ বাড়িতেই সংস্কৃতের বৃহৎ শিক্ষায়তন গড়ার জন্য উদ্যোগী হ'ন। অন্যান্য টোলের অধ্যাপকগণও তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হ'ন। প্রসন্ন তর্কতীর্থ ও রামচরণ শিরোরত্ন নিজ নিজ টোল বন্ধ করিয়া দিলেন। বেজের পাড়ের টোলের মধুসূদন স্মৃতিরত্ন নিজ বাড়িতে কেবল স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যাপনা নিয়া থাকিলেন। কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায় ও আয়ুর্বেদ প্রভৃতি কবীন্দ্র কলেজে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। কালীকৃষ্ণ শিরোমণি ও জগদ্বন্ধু বিদ্যারত্ন এই নূতন কলেজে যোগ দিলেন। এইভাবে ইংরেজী ১৮৯৬।৯৭ সালে কবীন্দ্র বাড়ির পুরাতন টোল কবীন্দ্র কলেজ নামে অভিহিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। কলেজ সৃষ্টির সময়ে নিমদাশের বাড়ির দুর্গামোহন দাশ ও বসন্ত দাশ চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি কতক আসবাব পত্র দান করিয়াছিলেন। বক্শী বাড়ির রজনীকান্ত দাশ, চৌধুরী বাড়ির অন্নদাচরণ গুপ্ত, শ্যামাচরণ সিমলাই প্রভৃতি ঐ সময় হইতেই কলেজের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হ'ন। শ্যামাচরণ সিমলাই তাঁহার মৃত্যুকাল (১৯৪০) পর্যন্ত ঐ কলেজ কমিটির সভাপতি ছিলেন। গ্রামের অনেক বাড়ির লোকেরা নিজেদের বাড়িতে কলেজের ছাত্রদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

প্রথমে ললিত কবিসাগর, কালীকৃষ্ণ শিরোমণি, জগদ্বন্ধু বিদ্যারত্ন ও

কিছু পরে শ্রীপ্রসন্ন কাব্যতীর্থ ও হরেন্দ্র স্মৃতিতীর্থ অধ্যাপনা করিতেন। শ্রীপ্রসন্ন কাব্যতীর্থ ও হরেন্দ্র স্মৃতিতীর্থ অল্পকাল পরেই কলেজ ত্যাগ করেন। তখন নলচিড়া গ্রামের বজনী বিদ্যারত্নকে অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। ছাত্র সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তখন উপযুক্ত ভাবে প্রতিষ্ঠানটি চালাইবাব জন্য অর্থেব প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এ অবস্থায় ঐ বাড়িব ভুবনমোহন দাশগুপ্ত কবিচূড়ামণির বিশেষ চেষ্টায় গভর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক সাহায্য ১০০৲ মঞ্জুর হয় এবং কবিসাগর মহাশয়েব চেষ্টায় ত্রিপুবার মহারাজা হইতে মাসিক ১০০৲ বৃত্তির ব্যবস্থা হয়। ফলে কলেজের কর্তৃপক্ষগণ নিজ বাড়িতে বহু বিদেশী ছাত্রকে আহার ও বাসস্থান দিয়া বাখিতে লাগিলেন এবং অপেক্ষাকৃত বেশি বেতন দিয়া বিদেশ হইতে ভাল পণ্ডিত অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদেব মধ্যে পূর্ণচন্দ্র তর্কতীর্থ, উপেন্দ্রনাথ তর্কাচার্য, শশী তর্কতীর্থ, অমরেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ ও হাবাণ স্মৃতিতীর্থ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ভুবনমোহন কবিচূড়ামণিব বিশেষ চেষ্টায় পরে গ্রন্থাগার কক্ষ (Library Hall) ও ছাত্রনিবাস (Boarding House) করার জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রচুর অর্থসাহায্য পাওয়া যায় এবং সুন্দর বোর্ডিং গৃহ নির্মিত হয়। তাহাব পবে বিদেশ হইতে নানা শ্রেণীর বহু ছাত্র এখানে শিক্ষালাভ করিতে আসে এবং কলেজ নামকরণ সার্থক করে। এই কলেজের বহু কৃতী ছাত্রের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর আশুতোষ শাস্ত্রী এম-এ, পি-এইচ-ডি, পি-আর-এস, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ নলিনীরঞ্জন সেন তর্কতীর্থ, সংস্কৃত কলেজের ন্যায়ের প্রধান অধ্যাপক মধুসূদন তর্কতীর্থ প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কলেজের উন্নতির জন্য যেমন ললিতমোহন দাশ কবিসাগরের দান অপরিসীম তেমনি গভর্ণমেণ্ট হইতে অর্থ সাহায্য পাওয়ার জন্য ভুবন-

মোহন দাশ কবিচূড়ামণির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার চেষ্টায় পরে লোকাল বোর্ডের সাহায্যে কবীন্দ্র বাড়ি হইতে গ্রামের মধ্যের নূতন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মিত হয় এবং উহার ফলে গ্রামের অপর প্রান্ত হইতে কলেজে আসার পথ সুগম হয়। রাস্তা নির্মাণ ব্যাপারে ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হইতে সাহায্য লাভ করিতে প্রিয়নাথ গুপ্ত (শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি) তাঁহাকে বিশেধ সাহায্য করিয়াছেন।

কালক্রমে দেশের অবস্থা পরিবর্তনে গভর্ণমেণ্ট ও আগরতলার বৃত্তি বন্ধ হইয়া যায় এবং ছাত্র-সংখ্যাও অনেক কমিয়া যায়। কিন্তু দেশ বিভাগ পর্যন্ত কলেজের কাজ চলিয়াছিল।

বেজের পাড়ের টোল

পূর্বে উল্লেখ হইয়াছে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যাপনার জন্য কাশীনাথ ন্যায়ালঙ্কার নিজ বাড়িতে টোল খোলেন। পরে তাঁহার ভ্রাতা মহেশ তর্কালঙ্কার এই টোলে অধ্যাপনায় যোগ দেন। তাহার পর তাঁহাদের ভ্রাতা নন্দকুমার তর্কসিদ্ধান্ত ভাটপাড়ায় মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বাড়ি আসিয়া এই টোলে পড়াইতে আরম্ভ করেন। চতুর্থ ভ্রাতা ঈশান শিরোমনি পরে ব্যাকরণ পড়াইতে আরম্ভ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কাশীনাথের পুত্র রামচন্দ্র শিরোমণি ব্যাকরণ অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ঐ শতাব্দীর শেষ দশকে মধুসূদন স্মৃতিরত্ন স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। তিনি এই শাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। এই জিলায় ও মাদারিপুর মহকুমায় তাঁহার অত্যন্ত সুখ্যাতি ছিল এবং আমরণ তিনি ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর (১৯৪১) তাঁহার ভ্রাতা জনার্দন ন্যায়বাগীশ ছেলেদের ব্যাকরণ পাঠ দিতেন। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ঐ টোলের অস্তিত্ব ছিল।

গভর্ণমেণ্ট এই টোলে মাসিক ১৫৲ সাহায্য দিতেন। প্রায় ৫০ বৎসব কাল এই টোল ভূদেব বৃত্তি (বার্ষিক ৫০৲) ও প্রায ১৫ বৎসর গৌরীপুবেব জমিদাব প্রদত্ত বিশ্বেশ্ববী বৃত্তি (বাষিক ৫০৲) সাহায্য পাইয়াছিল।

বহু ছাত্র এই টোলে শিক্ষা লাভ কবেন। তন্মধ্যে গৈলার রামচরণ শিরোরত্ন, প্রসন্নকুমাব তর্কবত্ন, কালীপ্রসন্ন তর্কচূডামণি, ফুল্লশ্রীর মনোরঞ্জন স্মৃতিতীর্থ, টুবিযার বিশ্বেশ্বব তর্কপঞ্চানন প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

এই টোলে তালপাতাব ও তুলট কাগজেব অনেক পুঁথি ছিল। তাহাদেব অধিকাংশই স্মৃতি, যাজনিক ক্রিযা ও মন্ত্রার্থ বিষযে। ইহাব কযেকখানা পুঁথি ঢাকা বিশ্ববিত্যালযে দেওযা হইযাছিল।

বাংলা শিক্ষা

(পাঠশালা ও ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয়)

সাধারণত পঞ্চমবর্ষে 'হাতে খডি' হইযা বাংলা শিক্ষা আবম্ভ হইত। গুরু বা পুরোহিত আসিযা বালকের হাত ধরিয়া পাথবের উপব খডি (চক) দিয়া প্রথম অক্ষর লিখাইযা দিতেন। ইহাকেই 'হাতে-খডি' বলা হইত।

প্রথমে তালপাতাব উপব স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণেব সব অক্ষরগুলি লোহার শলা দিয়া দাগ দিয়া লেখা হইত। পবে বালক "খাগেব" কলম মুট করিয়া (মুষ্টিবদ্ধ ভাবে) ঐ লেখার উপর মক্স করিত।

বাংলা লেখা পডা আরম্ভ হইত পাঠশালায়। গ্রামে অনেক পাঠশালা ছিল। বাড়ির দরজায় আটচালা ঘরে অথবা চণ্ডীমণ্ডপে এই পাঠশালা বসিত। পাঠশালার গুরু মহাশয়দিগকে সহজ কথায় সকলে 'মশায়'

বলিত। গ্রামে এক বাড়ির (মধ্য গৈলার ডাঃ চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীর বাড়ি) নাম ছিল 'মশায়ের' বাড়ি, কারণ ঐ বাড়িতে দুর্লভ মশায়, কালীকুমার, রামকুমার, পাঁচকড়ি ও হরকুমার মশায় প্রভৃতি গুরুমহাশয়দের বাড়ি।

সাধারণত 'মশায়' পাঠশালা ঘরে টুল বা উঁচু কোন কাষ্ঠাসনে বসিতেন। ছেলেরা পাঠশালায় বসার জন্য নিজ নিজ বাড়ি হইতে ছোট ছোট পাটি বা মাদুর নিয়া আসিত। 'মশায়' তালপাতার উপর অক্ষর প্রথম আঁকিয়া দিতেন। পরে উহার উপর মক্স হইত। অভ্যাস হইয়া গেলে পরে ছেলেরা 'আখাড়ায়' অর্থাৎ অক্ষর না আঁকা তালপাতায় লেখা অভ্যাস করিত। ক্রমশ ঐ ভাবে সব অক্ষরের সঙ্গে বানান ও ফলা লেখা হইত। অক্ষব (বানান ও ফলা সহ) লিখন শিক্ষা শেষ হইয়া গেলে কলাব পাতায় কডা, গণ্ডা প্রভৃতি লিখিত। তাহার পর শ্লেট ও সর্বশেষ কাগজে লিখিতে আরম্ভ করিত।

পাতায় যে কালি ব্যবহার করিত তাহা ছিল সাধারণত কেরোসিন লেম (Lamp) এর উপরে মেটে শরা ধরিলে যে শিষ পড়িত তাহা দিয়া তৈরী। বেশ কাল কালি হইত কিন্তু ধুইলেই উঠিয়া যাইত।

কাগজে লিখিবাব সময় পালকের কলম (Pen) ব্যবহার হইত। পাঠশালায় নিবের প্রচলন ছিল না।

পাঠশালা সকালে ও বৈকালে বসিত। পাঠশালা ভঙ্গের পূর্বে সকলে মিলিয়া উচ্চস্বরে 'নামতা' মুখস্থ করিত। 'মশায়' বা উপরের শ্রেণীর কেহ বলিয়া দিত ও সকলে মিলিয়া উহা পুনরাবৃত্তি করিত। পাঠশালায় পড়ান হইত প্রাইমারী পর্যন্ত। প্রথমে নিম্ন প্রাইমারী, পরে উচ্চ প্রাইমারী। আগেকার দিনে প্রথম বই পড়ান হইত রামসুন্দর বসাকের 'বাল্যশিক্ষা'। তৎপরে মদন মোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা'। সঙ্গে সঙ্গে 'ধারাপাত'। পরে 'বিবিধ শিক্ষা'। তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট চিঠি লেখার প্রণালীও ছিল। অঙ্কও থাকিত। পরে 'বোধোদয়'।

গুরু মহাশয়দের মাহিয়ানা ছিল অতি সামান্য। যে বাড়িতে পাঠশালা বসিত সে বাড়ির মালিক কিছু ও ছেলেরা নাম মাত্র কিছু কিছু মাহিয়ানা দিত। কোনও কোনও পাঠশালায় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের একটি গ্র্যাণ্ট থাকিত। ছেলেদের কোনও কোনও গুরুমহাশয়দের জন্য একটু তামাক আনিতে হইত।

গ্রামে চলাচলের তত সুবিধা না থাকার জন্য পাঠশালার সংখ্যা ছিল অনেক। এক পূব পাড়াতেই বিভিন্ন সময়ে ১০।১২টি পাঠশালা ছিল।

তখনকার গুরুমহাশয়গণ ও অভিভাবকেরা "দশবর্ষানি তাড়য়েৎ" এই ব্যাক্যে খুব বিশ্বাসী ছিলেন এবং বেশি করিয়া মারধর না করিলে উপযুক্ত শিক্ষা হয় না এই ছিল সকলের বিশ্বাস। গুরুমহাশয়দের সকলের হাতেই বেত থাকিত। অনেক সময় পাঠশালায় আসিয়াই প্রথমে ছাত্রদের মনে ভীতি ও পড়ার উৎসাহ সৃষ্টি করার জন্য সকলকেই ২।১ ঘা বেত মারিয়া পরে গুরুমহাশয় আসন গ্রহণ করিতেন। নৃশংস ভাবে মারার চল ছিল। এক রকম শাস্তি ছিল এইরূপ—ছেলে মাটির উপর চিৎ হইয়া পা দুটি গুটাইয়া উপরের দিকে রাখিত ও দুই পায়ের জানুর সন্ধির নিচ দিয়া হাত নিয়া আসিয়া উভয় কান ধরিতে হইত। এই প্রকার শাস্তির নাম ছিল 'কাছিম চিৎ'। কোনও সময়ে হাতে দড়ি দিয়া বাধিয়া গায়ে 'লাসার' (এক রকম লাল রঙের পিপড়া যাহার কামড়ে খুব জ্বালা করিত) বাসা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইত। লাসাগুলি সর্বগাত্রে দংশন করিত, কিন্তু বালক কোন প্রতিকার করিতে পারিত না। অনেক পাঠশালা ঘরের চাল হইতে দড়ি টানান থাকিত। ঐ দড়ির সঙ্গে হাত এমন ভাবে বাঁধিয়া দেওয়া হইত যে কোনও প্রকারে পায়ের বুড়া আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া মাটির উপর অথবা নারিকেলের আচির (মালার) উপর ছেলেরা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিত। পরে তাহাকে বেত মারা হইত। এইরূপ নানাবিধ নৃশংস শাস্তির প্রথা ছিল। এ অবশ্য বিংশ শতাব্দীর আরম্ভের সময় বা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে যাহা প্রচলিত ছিল তাহার কথা লিখিতেছি।

এই ধরনের শাস্তির ফলে বালকেরা অনেক সময় পাঠশালায় আসিত না। অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেদের অনুপস্থিত ছেলেদের ধরিয়া আনিতে পাঠান হইত। তাহারা গিয়া খোঁজ করিয়া নিয়া আসিত। একান্ত অনিচ্ছুক ছাত্রকে একজনে দুই হাত ও একজনে দুই পা ধরিয়া উঁচু করিয়া নিয়া আসিত। দীর্ঘপথ মাত্র দুই জনে এভাবে আনিতে পারিত না, সে জন্য এই দলে অন্তত ৪।৫ জন থাকিত। এই ভাবে ধরিয়া উঁচু করিয়া আনিবার নাম ছিল "শূয়ারডুলি" করিয়া আনা।

পাঠশালায় ছেলে ও মেয়ে উভয়েই পড়িত। এত মারধর সত্ত্বেও 'মশায়' ছাত্র-ছাত্রীদিগকে বেশ ভাল বাসিতেন ও তাঁহার সাধ্যানুসারে শিক্ষা দিতে ত্রুটি করিতেন না। প্রাইমারী পরীক্ষার পূর্বে অনেক ছাত্রকে গুরুমহাশয়ের বাড়িতে গিয়া রাত্রিতে পড়িতে হইত।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, সব পাঠশালার ছাত্র ছাত্রীদের একটা বেতন (যদিও খুবই কম) দেওয়ার নিয়ম ছিল। পরে বেজের পাড় কালী বাড়িতে কৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্য প্রভৃতিব উদ্যোগে যে পাঠশালা হইয়াছিল উহাতে কোন বেতন দিতে হইত না। গুরুমহাশয়ের বেতন বাবদ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে কিছু সাহায্য ছিল এবং উদ্যোক্তারা নিজ হইতে বাকীটা দিতেন। ফলে ছাত্র সংখ্যা প্রায় ১০০ হইয়াছিল।

শেষের দিকে ছোট ছোট পাঠশালা উঠিয়া সমগ্র গ্রামে ৩।৪টি বড় বড় পাঠশালা হইয়াছিল। ইহাতে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহায্যের পরিমাণ বেশি ছিল। পূব পাড়ায় এই পাঠশালা রামনাথ দাশের বাড়ির দরজার হাটখোলায় ছিল।

উপরে 'মশায়ের' বাড়ির গুরুমহাশয়দের নাম করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন আরাধন বঙ্গবাস (পশ্চিমের বাড়ি), বিপিন দত্ত (দক্ষিণ গৈলা), কেদার চাটুয্যে (ভগবান চাটুয্যের বাড়ি), পূব সেন পাড়ার কান্ত মশায় (চন্দ্রকান্ত সেন), শরৎ চাটুয্যে (দক্ষিণ গৈলা) ও অনন্ত দাশ-গুপ্তের (বৈদ্যের বাড়ি) শিক্ষক হিসাবে বেশ নাম ছিল।

উচ্চমান পর্যন্ত শিক্ষার জন্য ছাত্রবৃত্তি স্কুল ছিল তিন পাড়ায় তিনটি। দাশের বাড়ি, মুনশী বাড়ি ও মজুমদার বাড়িতে। পরে দাশের বাড়ির ছাত্রবৃত্তি স্কুল ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার জন্য মাইনর স্কুলে পরিণত হয়। গৈলা স্কুল স্থাপনের পূর্বে গ্রামে ইহাই ছিলে ইংরেজী শিক্ষার একমাত্র বিদ্যালয়।

ইংরেজী শিক্ষা

(গৈলা স্কুল স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত)

১৮৪২ সালে বরিশাল শহরে ইংরেজী শিক্ষার জন্য জিলা স্কুল স্থাপিত হয়, কিন্তু ১৮৭৩ সালের পূর্বে এই স্কুল গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত ছিল না। বরিশালে প্রথম কলেজ হয় ১৮৮৯ সালে। অথচ ইতিমধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ জাগিয়া উঠে। গৈলায় তখন ইংরেজী শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত ছিল না। ইংরেজী শিখিতে যাইতে হইত বরিশাল শহরে অথবা ঢাকা বা কলিকাতায়। শহরের সঙ্গে গ্রামের যোগের সূত্র ছিল ক্ষীণ। নৌকাই ছিল একমাত্র অবলম্বন। কলিকাতা যাইতে হইলে খুলনা হইয়া যাইতে হইত। কিন্তু ১৮৮৪ সালের পূর্বে বরিশাল হইতে কোন ষ্টীমার পথ ছিল না। এই বৎসরে প্রথম খুলনা পর্যন্ত ষ্টীমার লাইন খোল হয়। ঢাকা ষ্টীমার লাইন আরও কয়েক বৎসর পরে খোলা হয়। নৌকায় খুলনা পৌছিতে ৩।৪ দিন লাগিত। ঢাকা যাইতে হইলে টরকি বন্দর হইতে বারুজীবীদের পানের নৌকায় ৭।৮ দিন ধরিয়া যাইতে হইত। পথও ছিল বিপদ সংকুল। এই সব অসুবিধা সত্ত্বেও গ্রামের কতক যুবক বরিশাল, ঢাকা ও কলিকাতা গিয়া ইংরেজী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন।

রজনীকান্ত দাশ (বক্‌শী বাড়ি) বিদেশ হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া পরে ওকালতী পাশ করেন ও বরিশাল শহরে ওকালতী আরম্ভ করেন। চন্দ্রকুমার দাশ (নবসিংহ দাশেব বাড়ি) ১৮৬৫ সালে বি-এ পাশ করেন। বরিশাল জিলার প্রথম দুই জন গ্রাজুয়েটের তিনি ছিলেন অন্যতম। পবেব বৎসব তিনি বি-এল পরীক্ষা পাশ কবেন। তৎপরে তিনি মুনসেফ পদে নিযুক্ত হ'ন। শ্রীনাথ গুপ্ত (গোলার পাড়) ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকবি পান। ১৮৮৩ সালে বিশ্বেশ্বব সেন (কালুপাড়া উত্তরের বাড়ি) এম-এ পাশ কবেন। তিনিই গ্রামের প্রথম এম-এ। তাঁহার পাশেব সংবাদ শুনিযা গ্রামেব ও পার্শ্ববর্তী বহু গ্রামের লোক তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। ১৮৮৫ সাল হইতে গৈলা স্কুল স্থাপনেব পূর্ব (১৮৯২ সাল) পর্যন্ত গ্রামে ১৩ জন গ্রাজুয়েট হ'ন। তন্মধ্যে ৮ জন অনার্স পাইয়াছিলেন। পবে ৪ জন এম-এ, ৪ জন বি-এল ও ১ জন বি-ই পরীক্ষা পাশ কবেন, ৯ জন এণ্ট্রান্স ও ৩ জন এফ-এ পরীক্ষায় বৃত্তি পান। তন্মধ্যে ১ জন উভয় পবীক্ষায় প্রথম শ্রেণীব বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম ও বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

১৮৮৫ সাল হইতে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত গ্রাজুয়েটদের নাম ও বিবরণ (সময়ানুক্রমে) ঃ

নাম ও বাড়ি	সরকারী বৃত্তি প্রাপ্ত	বি-এ পাশের বৎসর	পরের ডিগ্রী
শ্যামাচরণ সিমলাই, সিমলাই বাড়ি।	এণ্ট্রান্স ও এফ-এ	অনার্স ১৮৮৫	বি-এল

নাম ও বাড়ি	সরকারী বৃত্তি প্রাপ্ত	বি-এ পাশের বৎসর	পরের ডিগ্রী
গোবিন্দ চন্দ্র দাশ (১), মজুমদার বাড়ি।		অনার্স ১ম বিভাগ, ১৮৮৬	এম-এ (প্রথম বিভাগে প্রথম)
বিপিন বিহারী দাশ, দাশের বাড়ি, বড় হিস্যা।	এণ্ট্রান্স বিভাগীয় বৃত্তি	অনার্স ১৮৮৬	এম-এ ও বি-এল
শ্যামাচরণ গুপ্ত, শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি।		অনার্স ১৮৮৭	
গোপাল গোবিন্দ গুপ্ত, কানাই গুপ্তের বাড়ি।	এফ-এ (ঢাকা ডিভিসনে প্রথম হন)	অনার্স ১৮৮৭	বি-এল (প্রথম বিভাগ)
মতিলাল দাশ, দাশের বাড়ি, মেজ হিস্যা।		অনার্স ১৮৮৮	
ললিত চন্দ্র দাশ গুপ্ত, নরসিংহ দাশের বাড়ি।	এণ্ট্রান্স ও এফ-এতে প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি	অনার্স ১৮৮৯	

(১) গোবিন্দ চন্দ্রের পৈতৃক বাড়ি নলচিড়া। তিনি মজুমদার বাড়ির দৌহিত্র, স্কুল ও কলেজের পাঠকালে মাতুল বাড়ি প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহার নাম এই তালিকায় দেওয়া হইল।

নামও বাড়ি	সরকারী বৃত্তি প্রাপ্ত	বি-এ পাশের বৎসর	পরের ডিগ্রী
ভূবনমোহন গুপ্ত, গোলার পাড়।	এণ্ট্রান্স	পাশ কোর্স ১৮৮৯	বি-এল
কৈলাস চন্দ্র সেন, মজুমদার বাড়ি।		পাশ কোর্স ১৮৮৯	
রেবতীকান্ত দাশ, কেরাণী বাড়ি।	এণ্ট্রান্স	অনার্স ১৮৯০	এম-এ
রাজকুমার সেন, তুহিসেনের বাড়ি।	এণ্ট্রান্স	পাশ কোর্স ১৮৯২	
ললিত মোহন দাস, নিমদাশের বাড়ি।	এণ্ট্রান্স	পাশ কোর্স ১৮৯২	এম-এ ১৮৯৩
মধুস্থদন সেন গুপ্ত, কালুপাড়া, উত্তবের বাড়ি।	এণ্ট্রান্স বিভাগীয় বৃত্তি	শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বি-ই পরীক্ষায় প্রথম (স্থবর্ণ পদক প্রাপ্ত) ১৮৯২	
চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী (২), মধ্য গৈলা।	এণ্ট্রান্স		

গৈলা গ্রামে প্রথম অনার্স পাশ শ্যামাচরণ। প্রথম ইঞ্জিনিয়ার মধুস্থদন। গোবিন্দ চন্দ্র বি-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ পাশ

(২) চন্দ্রকান্ত ১৮৯২ সালে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের উচ্চতম ক্লাসে পড়িতে-ছিলেন। ১৮৯৩ সালে এল-এম-এস পরীক্ষায় পাশ করেন। ইনি গ্রামের প্রথম মেডিক্যাল গ্রাজুয়েট।

করেন ও ১৮৮৭ সালে ঢাকা কলেজ হইতে বিজ্ঞানে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হ'ন। গ্রামে প্রবাদ যে পরীক্ষার ফল বাহির হওয়ার কিছু পূর্বে ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল কলিকাতা আসিয়া জানিতে পারেন যে বিজ্ঞানে সকল বিষয় একত্র করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজেব রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী সর্ব্বোচ্চ নম্বর পান। তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়েব কর্তৃপক্ষকে বলেন "আমাব গোবিন্দ দ্বিতীয় হইতে পাবে না" ("My Gobinda cannot stand second") এবং এই নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষের সহিত বাদানুবাদ হয়। পরে সেই বৎসবই বিজ্ঞান বিষয়কে দুই গ্রুপে ভাগ করা হয় এবং যে যে পেপারে রামেন্দ্র সুন্দর বেশি নম্বর পাইয়াছিলেন তাহা নিয়া প্রথম গ্রুপ ও যে যে পেপারে গোবিন্দ চন্দ্র প্রথম হইয়াছিলেন তাহা নিয়া দ্বিতীয় গ্রুপ কবা হয় ও প্রথম গ্রুপে রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীকে ও দ্বিতীয় গ্রুপে গোবিন্দ চন্দ্রকে প্রথম ঘোষণা করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে দেখা যায় যে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত এম-এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানকে Natural and Physical Science বলিত ও উহার মধ্যে কোনও গ্রুপ বা বিভাগ ছিল না। ১৮৮৭ সালে দুই গ্রুপ হয় ও প্রথম গ্রুপে থাকে Chemistry, Electricity, Magnet'sm এবং দ্বিতীয় গ্রুপে Electricity, Magnetism, Heat and Elements of Molecular Physics. রামেন্দ্রসুন্দর প্রথম গ্রুপে প্রথম ও গোবিন্দ দ্বিতীয় গ্রুপে প্রথম হ'ন। পরের বৎসর ১৮৮৮ সাল হইতে ঐ রূপ গ্রুপ আর থাকে না। Chemistry ও Physics এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। ইহা হইতে উপবোক্ত প্রবাদের মূলে সত্য আছে মনে হয়।

উপরোক্ত যুবকগণের মধ্যে গোবিন্দ চন্দ্র ও ললিত চন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হ'ন। যাঁহারা বি-এল পাশ করিয়াছিলেন তাঁহারা ওকালতী আরম্ভ করেন এবং অন্যেরা অন্য চাকরি নেন।

এই সব দৃষ্টান্তে লোকের ইংরেজী শিক্ষার জন্য প্রবল আগ্রহ হয় ও গ্রামেই ইংরেজী স্কুল স্থাপনেব প্রয়োজনীয়তা অনেকে অনুভব করিতে থাকেন। ১৮৯৩ সালের জানুয়ারী মাসে গৈলা স্কুল স্থাপিত হয়।

গৈলা স্কুল

এই উচ্চ ইংরেজী স্কুলের প্রথম পরিকল্পনা করেন বরিশালের তখনকার প্রখ্যাত উকীল, বকশী বাড়ির রজনীকান্ত দাশ। তাঁহারই উৎসাহে ও উদ্যোগে ও আর কয়েকটি যুবকের সহযোগিতায় বরিশাল শহরে দুর্গাচরণ পিপলাইয়ের বাসায় ও তাঁহার সভাপতিত্বে গৈলাগ্রাম বাসীদের এক সভা ডাকা হয়। আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে দাশের বাড়ির মাইনর স্কুল, মজুমদার বাড়ির ও মুনশী বাড়ির ছাত্রবৃত্তি স্কুল একত্র করিয়া দাশের বাড়ির বহির্বাটীতে একটি হাই ইংলিশ স্কুল (H. E. school) স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য দাশের বাড়ির বড় হিস্যার রামচন্দ্র দাশকে সেক্রেটারী, রজনীকান্ত, কানাই গুপ্তের বাড়ির গোপাল গোবিন্দ গুপ্ত ও নরসিংহ দাশের বাড়ির নবীন চন্দ্র দাশ গুপ্তকে এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী ও গ্রামের আর ১১ জন গণ্যমান্য লোক নিয়া এক কমিটি গঠিত হয়। এই ১৫ জন সভ্যের মধ্যে দাশের বাড়ির ও মুনশী বাড়ির স্কুলের প্রতিনিধি ছিলেন ৫ জন করিয়া, ফুল্লশ্রী স্কুলের ছিলেন ৩ জন ও ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের ২ জন।

প্রারম্ভিক খরচ বাবদ রামচন্দ্র দাশ, কৃষ্ণসুন্দর দাশ (মেজ হিস্যা), নবীন চন্দ্র দাশ (রাম মোহন দাশের বাড়ি) প্রত্যেকে ১০০৲, রজনীকান্ত ৫০৲ ও দুর্গাচরণ পিপলাই ৪০৲ ও আরও কয়েক জন (তাঁহাদের নাম বা দানের অঙ্ক সংগ্রহ করা যায় নাই) কতক টাকা দিতে স্বীকৃত হ'ন। এই ভাবে সর্বমুদ্ধ অনধিক ৭৫০৲ প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছিল।

শেষোক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ১০০৲ দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন।

শিক্ষকতা করার জন্য কয়েকটি যুবক অগ্রসর হন ও যতদিন স্কুল স্বাবলম্বী না হয় ততদিন হারাহারি মতে অল্প বেতন নিতে স্বীকৃত হ'ন। ইহাদের মধ্যে প্রথমেই নাম করিতে হয় হেডমাষ্টারের জন্য মনোনীত মজুমদার বাড়ির কৈলাশচন্দ্র সেনের। তিনি তখন গভর্ণমেণ্টের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। সরকারী চাকরির নিশ্চিত বেতন ও ক্রমিক পদোন্নতি ও গৌরবের মায়া তুচ্ছ করিয়া তিনি সদ্য স্থাপিত গ্রামের স্কুলের অনিশ্চিত ও অল্প বেতনের চাকরি স্বীকার করেন ও গ্রামের ছেলেদের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ৩৭ বৎসর কাল হেডমাষ্টার স্বরূপে সুষ্ঠুভাবে এই স্কুল পরিচালনা করিয়া কৈলাস চন্দ্র বিশিষ্ট হেডমাষ্টার বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন ও স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। ছাত্রদের প্রতি গভীব স্নেহ অথচ কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণতা দ্বারা এই স্কুলের তথা গ্রামের যে উপকার তিনি করিয়া গিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত বিরল।

ফুল্লশ্রীর চন্দ্রকান্ত চূড়ামনি, দাশের বাড়ির চৌধুরী হিস্যার বৈকুণ্ঠ চন্দ্র দাশ, রামনাথ দাশের বাডির অশ্বিনী কুমার দাশ, শ্যামাচরণ সিমলাই বি-এল ও রজনীবাবুর জামাতা কোটালিপাড়া নিবাসী বিলাসচন্দ্র সেন এবং সম্ভবত শঙ্কর গুপ্তের বাড়ির দুর্গাচরণ গুপ্ত এবং তৎকালীন মাইনর স্কুলের চণ্ডী পণ্ডিত (ভিন্ন গ্রামের) এই ভাবে স্কুলের শিক্ষকতা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে কয়েক মাস মধ্যেই স্কুল স্বাবলম্বী হইয়াছিল এবং শিক্ষকগণ পুরা বেতন পাইতে আরম্ভ করেন এবং বিলাস চন্দ্র ও শ্যামাচরণ পরে শিক্ষকতা ত্যাগ করিয়া ওকালতী ব্যবসা আরম্ভ করেন।

আনুষ্ঠানিক ভাবে গৈলা স্কুল খোলা হয় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে জানুয়ারী। ঐ দিনই ১২২জন ছাত্র স্কুলে ভর্তি হয়। বরিশাল শহরের ব্রজমোহন

স্কুল হইতে গৈলা স্কুলে যে সব ছেলে ভর্তি হওয়ার জন্য ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়াছিল অশ্বিনীকুমার দত্ত তাহাদের নিকট হইতে কোন ট্রানস্ফার ফি নেন নাই। সরকারী চাকরি হইতে অবসর নিয়া কৈলাস বাবু উদ্বোধন দিবসে পৌঁছাইতে পারেন নাই। দুই এক মাস পরে কাজে যোগদান করেন। এই সময় প্রথম কয়েক দিন বিলাসবাবু ও পরে এসিস্ট্যান্ট হেডমাষ্টার শ্যামাচরণ সিমলাই হেডমাষ্টারের কার্য্য চালান।

১৮৯৪ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রথম ছাত্র পাঠান হয়। প্রেরিত ১২ জন ছাত্রের মধ্যে ৪ জন উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ১৯৪২ সন পর্যন্ত এই স্কুল হইতে ১০০৫ জন এনট্রান্স ও ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

১৮৯৯ সালে এই স্কুল হইতে শৌলাকর নিবাসী রাই চরণ গুপ্ত প্রথম সরকারী বৃত্তি পায়। পরে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত আরও ১২ জন ছাত্র বৃত্তি পায়, তন্মধ্যে নলিনবিগরী সেন (কালুপাড়া) বিভাগীয় বৃত্তি লাভ করে।

ক্রমেই ছাত্র সংখ্যা বাড়িতে থাকে এবং দাশের বাড়ির দরজার স্কুলের গৃহে স্থানাভাব দেখা দেয়। তখন রজনীকান্তের প্রচেষ্টায় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের খাল ও আমবৌলা রোডের পশ্চিমপার্শ্বে পতিত জমির মালিক-গণ (দাশের বাড়ির ৪ হিস্যা) এই জমি স্কুলের নামে নামমাত্র খাজানায় পাট্টা দেন। স্কুলের তহবিল হইতে প্রচুর অর্থব্যয়ে পুকুর কাটাইয়া ও অন্যস্থান হইতে মাটি আনিয়া ঐ জমি ভরাট করা হয় ও স্কুলের জন্য দুই পার্শ্বে খোলা বারান্দা যুক্ত বড় টিনের ঘর নির্মিত হয় এবং ১৯০৯ সালে এই নূতন জায়গায় স্কুল স্থানান্তরিত হয়।

ইহার পর ছাত্র সংখ্যা ক্রমশই বাড়িতে থাকে। কয়েক বৎসরের মধ্যে ছাত্র সংখ্যা ১০৪০ জনে দাঁড়ায়। এই ভাবে ছাত্র বাড়িতে থাকিলে এই জায়গায় নূতন নূতন গৃহ নির্মাণ সত্ত্বেও নূতন ছাত্র ভর্তি করা এক সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। তখন হেডমাষ্টার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে পূব পাড়ায় রাম-

নাথ দাশের বাড়ির দরজায় ও ফুল্লশ্রী মজুমদার বাড়িতে দুইটি ব্রাঞ্চ স্কুল ক্লাস ফোর পর্যন্ত (চতুর্থ শ্রেণী) খোলা হয়।

ইহার কয়েক বৎসরের মধ্যে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অনেক নূতন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপরে অসহযোগ আন্দোলনের ফলে স্কুলের ছাত্র সংখ্যা অনেক কমিয়া যায়। তখন পূব পাড়ার ব্রাঞ্চটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং ফুল্লশ্রীব স্কুলও বন্ধ করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কৈলাস বাবুর অবসর গ্রহণ করার পর দুইজন ভিন্নগ্রামবাসী হেডমাষ্টাব আসেন। তাহাদের জন্য বাসগৃহ ও বিদেশী হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের জন্যে বোর্ডিং গৃহ নির্মিত হয়। ছেলেদের খেলার জন্য স্কুলের পাশের জমি পাট্টা নিয়া খেলার মাঠে পরিণত করা হয়। স্কুল নূতন স্থানে আসার প্রায় ৩০ বৎসর পরে স্কুলের তদানীন্তন সেক্রেটারী কুঞ্জবিহারী গুপ্তের (কানাই গুপ্তের বাড়ি) উদ্যোগে স্কুল ঘরের চারিদিকের ভিত্তি পাকা করা হয় এবং বাঁশের বেড়ার পরিবর্তে ইষ্টক নির্মিত পাকা দেওয়াল তৈরি করা হয়। কোনও কোনও ঘরের মেজেও পাকা করা হইয়াছিল।

গ্রামটি খুব বড় বলিয়া দূর প্রান্ত হইতে ছোট ছোট মেয়েরা একা স্কুলে আসিতে অসুবিধা বোধ করিত। সে জন্যে ১৯১৩ সালে পূবপাড়ায় মেয়েদের জন্য একটি ইংরেজী বিদ্যালয় খোলা হয়। পশ্চিম পাড়ার মেয়েদের জন্যও একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল কিন্তু সেখানে শিক্ষার সুবন্দোবস্ত না থাকায় গৈলা স্কুল গৃহে সকাল বেলায় মেয়েদের জন্যে ভিন্ন সেক্সন খোলা হয়। কয়েক বৎসর এইভাবে চলার পর ১৯৪৪ সাল হইতে স্কুলের মেয়েদের শাখা হইতে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে অনুমতি পাওয়া যায় এবং ঐ সময় হইতেই প্রতি বৎসর স্কুল হইতে মেয়েরা পরীক্ষা দিতে থাকে। তখন পূবপাড়ার গার্লস স্কুলের উচ্চ ক্লাসগুলি এই স্কুলের সহিত মিলাইয়া দেওয়া হয়। ছাত্রীদের সংখ্যা ১৫০ পর্যন্ত হইয়াছিল।

স্কুলে গভর্নমেণ্টের কোনও মাসিক সাহায্য ছিল না। সাময়িকভাবে সাজ সরঞ্জামাদি ও শিক্ষকদের বোনাস ভাবে কিছু কিছু সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। বিপিন বিহারী দাশ গুপ্ত (দাশের বাড়ি, বড় হিস্যা) সেক্রেটারী থাকার সময়ে তাঁহার চেষ্টায় একবার শিক্ষকদের বোনাস স্বরূপ ১৭০০৲ পাওয়া গিয়াছিল। এত বড স্কুল এক মাত্র ছাত্র বেতন দ্বারাই পরিচালিত হইত।

১৯৩৯।৪০ সালে গভর্নমেণ্টের স্কীম অনুসারে স্কুল গৃহেব একাংশে গুরু ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হয়। ৫।৬ বৎসর উহা এইখানেই ছিল।

স্কুলের আনুষঙ্গিক লাইব্রেরীটি বেশ বড ছিল। স্কুলের পাঠ্য পুস্তক ছাড়া Encyclopedia Britannica, Book of Knowledge প্রভৃতি ইংরেজী ভাষায় অনেক বই ছিল। গৈলার অনেকে নূতন ও পুরাতন নানা রকমের পুস্তক দানে এই লাইব্রেরী সমৃদ্ধ করিয়াছেন। গ্রামের সকলেই এই লাইব্রেরী হইতে বই নিয়া পডিতে পারিতেন।

স্বদেশী যুগে কাপড বোনা শিক্ষা দেওয়ার জন্যে অনেক তাঁত কেনা হইয়াছিল ও একজন তাঁত চালক শিক্ষকও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে ছাত্রদের উৎসাহের অভাবে উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় টাইপ রাইটিং শিক্ষা দেওয়ারও অনুরূপ চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু উহা বিশেষ ফলবতী হয় নাই।

স্কুলের প্রথম দিকের শিক্ষক, দাশের বাড়ির চৌধুরী হিস্যার সীতানাথ দাশ গুপ্ত (শীতল বাবু) ছেলেদের নৈতিক শিক্ষা দানের জন্যে সান্‌ডে সার্ভিস নামে একটি ক্লাস প্রতি রবিবারে পরিচালনা করিতেন। তিনি সরকারী চাকরি নিয়া স্কুল ছাড়িয়া গেলে ঐ ক্লাস বন্ধ হইয়া যায়। পরে Literary Club নামে এক সাহিত্য সভা খোলা হয়। প্রতি সপ্তাহে তাহার অধিবেশন হইত। বহুদিন ইহা চলিয়াছিল। পরে অনুরূপ উদ্দেশ্য নিয়া ১৯৪২ সালে 'কথাকলি সাহিত্য পরিষৎ' নামে একটি সাহিত্য চক্র খোলা হইয়াছিল।

কৈলাস বাবু একবার শারীরিক অসুস্থতার জন্য দীর্ঘকাল ছুটি নিয়াছিলেন। সেই সময় প্রথমে বিশ্বেশ্বর মজুমদার ও পরে নিশিকান্ত চক্রবর্তী হেড মাষ্টার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কৈলাস বাবুর অবসর গ্রহণের পর সুরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, শচীন্দ্র নাথ' বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়বন্ধু গুপ্ত (চৌধুরী বাড়ি), অসিতা রঞ্জন ভট্টাচার্য, যতীন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত (পূব সেন পাড়া) ও হাবাণচন্দ্র দাস (দক্ষিণ গৈলা) ক্রমিক হেড মাষ্টার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

স্কুলের বহু ছাত্র উত্তর কালে নানাভাবে কৃতিত্ব অর্জন করেন। তাঁহাদের সকলের, এমন কি বিশিষ্টদেরও নাম করা সম্ভব হইল না।

এই স্কুলেব একটি বৈশিষ্ট্য ইহাব জেনারেল কমিটি বা সাধারণ সভা। স্কুল স্থাপনের সময়ে (১৮৯৩) বড বড বাডির এবং সংলগ্ন ছোট ছোট কয়েকটি বাডি হইতে এক বা একাধিক সভ্য নিয়া জেনারেল কমিটি নামে এক কমিটির সৃষ্টি হয়। প্রথমে ইহার সভ্য সংখ্যা ছিল ৪৫। পরে নিয়ম হয় যে উপরোক্ত সভ্য বা তাঁহাদের স্থলাভিষিক্তগণ ভিন্ন গ্রামের যাঁহাবাই এম-এ পরীক্ষায় পাশ হইবেন তাঁহারা নির্দিষ্ট চাঁদা দিলে এই কমিটির সভ্য হইতে পাবিবেন। ইহাতে সভ্য সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায়। আরও পরে ছাত্রদের সকল অভিভাবককে জেনারেল কমিটির সভ্য গণ্য করা হইত। প্রথম হইতেই প্রতি বৎসব ৺পূজার পরের শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন এই সভার অধিবেশন হইত। কোনও কাজে বা কারণে ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। এই কমিটিতে স্কুলের আয় ব্যয়, অভাব অভিযোগ, নূতন বৎসরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট, ইউনিভারসিটি ও ক্লাসের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল ইত্যাদি স্কুল সংক্রান্ত সর্ববিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হইত। আলোচনার সুবিধার জন্য পূর্ব বৎসরের রিপোর্ট ছাপাইয়া সভার অন্তত সাত দিন পূর্বে সভ্যদের মধ্যে বিতরণ করা হইত।

কার্য নির্বাহক সভা জেনারেল কমিটির মতের উপর বিশেষ গুরুত্ব

আরোপ করিতেন এবং ইহার সিদ্ধান্ত যথা সম্ভব কার্যে পরিণত করিতেন। নূতন বা ব্যয়বহুল কোনও পরিকল্পনা আরম্ভ করার পূর্বে সাধারণত এই কমিটির পরামর্শ নিতেন। ইহার ফলে সকলেই স্কুলকে নিজের মনে করিতেন এবং ইহার উন্নতিকামী ছিলেন।

স্কুল স্থাপনের পর ১৯০৭ সাল পর্যন্ত কার্যনির্বাহক সভার কোনও পরিবর্তন হয় নাই। এই দীর্ঘকাল রজনীকান্তই স্কুল পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব কার্যত বহন করিয়া আসিতেছিলেন। এই সময়ে সেক্রেটারী রামচন্দ্র পরলোক গমন করেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য রজনীকান্তও আর কার্য নির্বাহক সভায় থাকিতে রাজী হইলেন না। তখন নূতন কার্যনির্বাহক সভা গঠিত হয় ও প্রেসিডেণ্টের নূতন পদ সৃষ্টি হয়। জেনারেল কমিটিই ঐ সভার সভ্য নির্বাচন করেন ও প্রতি তিন বৎসর অন্তর উহা নির্বাচন করিয়া আসিতেছেন।

১৮৯৩ সাল হইতে এই স্কুল গৈলা গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জনসমূহের মধ্যে শিক্ষার সুযোগ দিয়া ইংরেজী শিক্ষার প্রভূত প্রসার সাধন করিয়াছে। ইহার জন্যে স্কুলের পরিকল্পনাকারী ও পরিচালনা কমিটির মধ্যমণি স্বরূপ রজনীকান্ত ও বিচক্ষণ হেডমাষ্টার কৈলাস চন্দ্রের নিকট গ্রামবাসীদের ঋণ অপরিশোধ্য। স্কুলের সর্বাঙ্গীন উন্নতির মূলে ছিলেন তাঁহারা দুই জন।

ইংরেজী শিক্ষা

(গৈলা স্কুল স্থাপনের পরে)

গৈলা স্কুল স্থাপিত হওয়াব পবে স্কুলের শেষ পরীক্ষা এণ্ট্রান্স পর্যন্ত ছেলেবা গ্রামে থাকিয়াই পডাশুনা কবিতে পারিত। যাহাদের আথিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল তাহাবা স্কুলে বিনা বেতনে বা অর্ধ বেতনে পডাব সুযোগ পাইত। কলেজে শিক্ষাব জন্য তাহার পর শহরে যাইতে হইত। সেখানে কেহ কেহ আত্মীয়দেব বাসায় থাকিত কেহ বা ছাত্র পডানোব পরিবর্তে কোনও বাসায় আহার ও বাসস্থানেব যোগাড় কবির্যা লইত। এই ভাবে কলেজের উচ্চশিক্ষা ক্রমে বিস্তৃত হইতে থাকে। ছেলেবা প্রথম দিকে সাধারণত বি-এ, এম-এ, বি এল প্রভৃতি সাধারণ বিভাগে বেশি পডিত। বি-ই বা এম-বি'র দিকে যাইত না। পবে তাহারা এই সব দিকে আকৃষ্ট হয়।

১৮৯৯ সালে আশুতোষ দাশ গুপ্ত (কবিরাজ বাড়ি) বি-এ ইংরেজী অনার্স পবীক্ষায প্রথম বিভাগে প্রথম হ'ন। তাঁহার পূর্বে গ্রামের আর কেহ এ সম্মান পান নাই। ১৯০১ সালে তিনি প্রথম বিভাগে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন।

বিংশ শতাব্দের প্রথম দশকে নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত (গোলার পাড) কৃষিবিদ্যা শিক্ষাব জন্য বিলাত যান এবং গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ঐ বিষয়ে বি-এস-সি ও পরে আমেরিকা হইতে ডক্টরেট ডিগ্রী (পি-এইচ-ডি) লাভ কবেন। ইনিই শিক্ষালাভেব জন্য প্রথম ইংল্যাণ্ড গমন করেন ও ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

মেয়েরাও কলেজে ভর্তি হইতে আরম্ভ করে। তটিনী গুপ্ত (শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি) এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় ও আই-এ পরীক্ষায় প্রথন স্থান অধিকার করেন। পরে বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেন। ইনি গ্রামের প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট। পরে

তিনি লণ্ডন হইতে টি-ডি ডিপ্লোমা পান ও বেথুন কলেজের অধ্যাপিকা ও প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হ'ন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এস-সি, এম-কম প্রভৃতি কোর্স খোলা হইলে বহু ছাত্র সে দিকে আকৃষ্ট হয়।

১৯২০ সালে সুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত (কবীন্দ্র বাড়ি) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাচ্যদর্শনে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী ও ১৯২২ সালে কেম্ব্রিজ হইতে পাশ্চাত্য দর্শনে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ইনি গ্রামের প্রথম কলিকাতা ও কেম্ব্রিজের পি-এইচ-ডি। তিনি আমেরিকায় শিকাগো, হার্ভার্ড ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে নানা বক্তৃতা দেন। তিনি রোম, মিলান, ব্রেসলিউ, কনিগস্বার্গ, বার্লিন, বন, কোলন, জুরিচ প্যারিস, ওয়ারস ও ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর (Visiting Professor) হিসাবে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞানের গভীরতায় ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া বিদেশী বিদ্বৎ সমাজ তাঁহাকে নানাভাবে সম্মান ও সমাদর করেন। ভিয়েনা শহরে তাঁহার একটি প্রতিমূর্তি তাঁহাকে উপহার দেওয়া হইয়াছিল। ওয়ারসতে তাঁহাকে তত্রত্য "একাডেমী অব সাইন্স" ও "রয়াল সোসাইটি অব লিটারেচার"-এর সভ্য মনোনীত করা হইয়াছিল। প্যারিসে তাঁহাকে বিশেষ সম্বর্ধনা জানান হইয়াছিল ও রোম নগরীতে তাঁহাকে অনারারী 'ডি-লিট' ডিগ্রীতে ভূষিত করা হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে একটি আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি নেপলস ও হার্ভার্ড আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে ভারত গভর্নমেণ্টের ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। এ দেশে তিনি 'ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের' সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জর্জ ফিফথ্ প্রফেসর অব ফিলসফি' নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দর্শন শাস্ত্র বিষয়ে তিনি অনেক বই

লিখিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস' গ্রন্থ (৫ খণ্ডে) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইহার পর ক্রমশ উচ্চশিক্ষার জন্য অনেক ছাত্র ইংল্যাণ্ড, জার্মানী ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যান ও সেখানকার সাধারণ বিভাগে ও ডাক্তারী প্রভৃতি বিষয়ে ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা ও কেহ কেহ সেখানকার ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

নলিন বিহারী সেন (কালুপাড়া) কলিকাতা হইতে বি-এস-সি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর অনার্স লাভ করিয়া ইংলণ্ডের সেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হ'ন ও ধাতুবিদ্যা বিষয়ের বি-এস-সি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করেন। দেশে ফিরিয়া তিনি জামসেদপুরে টাটা কোম্পানির চিফ্ কেমিষ্ট, পরে 'টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার ও সর্বশেষে ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভারতীয় বিজ্ঞান সভার 'ধাতুবিদ্যা' শাখায় তিনি সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

যোগেশ চন্দ্র গুপ্ত (শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি) জার্মানি হইতে (গ্রামের প্রথম) এম-ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ইনি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ।

অমিয় কুমার দাশ গুপ্ত (বকশী বাড়ি) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইকনমিক্‌সে (অর্থনীতি) বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হ'ন। পরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টর ও ইণ্টারন্যাশন্যাল মনিটারি ফাণ্ডের (International Monetary Fund) চিফ অব দি ডিভিসন (Chief of the Division) ছিলেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসরের (Visiting Professor) গৌরব তিনি লাভ করিয়াছেন। বর্তমানে তিন নয়া দিল্লীতে স্কুল অব ইণ্টারন্যাশন্যাল ষ্টাডিজের অর্থনীতি বিভাগের ডিরেক্টর।

এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাজুয়েট ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট প্রায় সব বিভাগেই গ্রামের প্রচুর ছেলে মেয়ে পড়িতে থাকে। তাহাদের মধ্যে ১৭ জন এম-এ ও এম-এস-সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হ'ন। তন্মধ্যে ৭ জন প্রথম হইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে সাধনা সেন গুপ্ত (পূব সেন পাড়ার জিতেন্দ্র নাথ সেন গুপ্তের কন্যা) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ও অলকানন্দা দাশ গুপ্ত (বকশী বাড়ির অমিয় কুমার দাশ গুপ্তের কন্যা) বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। অনেকে গবেষণা করিয়া এখানকাব বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। একই বৎসর (১৯৩৭) সুরেশ চন্দ্র সেন গুপ্ত (রতন সেনের বাড়ি) কলিকাতা হইতে ও সুনীল বিহারী সেন গুপ্ত (কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি) ঢাকা হইতে ডি-এস-সি ডিগ্রী প্রাপ্ত হ'ন। ইঁহারাই গ্রামের প্রথম ডি-এস-সি। পরে সংযুক্তা গুপ্ত (গোলার পাড়ের যতীশ চন্দ্র গুপ্তের কন্যা) বিশ্বভারতী হইতে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী পান। ইনিই ডক্টরেট ডিগ্রীপ্রাপ্ত গ্রামের প্রথম মেয়ে। সম্প্রতি জয়ন্তী গুপ্ত (শঙ্কর গুপ্তের বাড়ির ডক্টর যোগেশ চন্দ্র গুপ্তের কন্যা) বেলফাষ্ট (আয়ারল্যাণ্ড) হইতে চিকিৎসাশাস্ত্রে পি-এইচ-ডি ও কানাই গুপ্তের বাড়ির সুধাংশু গুপ্তের কন্যা মঞ্জুশ্রী গুপ্ত (সেন) কলিকাতা হইতে ডি-ফিল ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন।

ঝরণা সেন গুপ্ত (ভুটি বাড়ির যোগেশ চন্দ্র সেন গুপ্তের কন্যা) ইংল্যাণ্ড হইতে ডি-আর-সি-ও-জি ডিপ্লোমা পান।

পূর্বে বলা হইয়াছে প্রথম দিকে ছেলেরা ওকালতি বেশি পড়িত, পরে ডাক্তারী ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দিকে আকৃষ্ট হয়। দেশ স্বাধীনতা অর্জন করার পরে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে বহু ছেলে ভর্তি হয়। এই সময়ে উচ্চ শিক্ষার জন্যে নানাবিধ বৃত্তির ব্যবস্থা হওয়ায় তাহার সুযোগও অনেকে গ্রহণ করে।

গৈলা স্কুল স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত যে অল্প লোক সংখ্যক গ্রাজুয়েট হইয়াছিল তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর ক্রমশ গ্রামের সর্বশ্রেণীব লোকের মধ্যেই উচ্চ শিক্ষা সবিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। সুতরাং জেনারেল লাইনে এম-এ, এম-এম-সি এম-কম, বি-এল প্রভৃতির বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। এতৎসহ যাহারা এম-এ, এম-এস-সি ও বি-ই পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টরেট ডিগ্রী, ডাক্তারী বিশেষজ্ঞের ডিপ্লোমা, চার্টার্ড-একাউন্ট, মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রাজুয়েটের ডিগ্রী পান ও মেযেদের মধ্যে যাহারা এম-এ ও এম-এস-সি ও বি-এ ও বি-এস-সি পরীক্ষায় অনার্স পাইয়াছেন মাত্র তাঁহাদের নাম পবিশিষ্টে দেওয়া হইল। (ইহাদের মধ্যে জীবিত ও মৃত উভয় শ্রেণীর নাম আছে।)

এই সব তালিকা হইতে ও পরবর্তী অধ্যায়ে ইংরেজী শিক্ষিতদেব জীবিকার বিররণ হইতে গ্রামে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারেব কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে।

পরিশিষ্ট (ক)

১৮৯৩ সাল হইতে এম-এ ও এম-এস-সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের বর্ণানুক্রমিক তালিকা ঃ

(ক) যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হইয়াছেন তাঁহাদের নামের পর (১) লেখা হইল।

(খ) কলিকাতা ভিন্ন অন্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যাঁহারা উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহাদের নামের পর সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম লেখা হইল।

	নাম	বাড়ি
১।	অনিল কুমার ভট্টাচার্য (১)	ভবেন্দ্র ভট্টাচার্যের বাড়ি
২।	অমিয় কুমার দাশ গুপ্ত (১) ঢাকা	বকশী বাড়ি
৩।	অমূল্য রতন গুপ্ত	শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি
৪।	অলকানন্দা দাশ গুপ্ত (১) বারাণসী	বকশী বাড়ি
৫।	অশ্রুকুমার দাশ গুপ্ত	মুনশী বাড়ি
৬।	আশুতোষ দাশ গুপ্ত	কবিরাজ বাড়ি
৭।	তটিনী গুপ্ত	শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি
৮।	তপন কুমার গুপ্ত	চৌধুরী বাড়ি
৯।	দীনেশ চন্দ্র তপাদার (১)	তপাদার বাড়ি, ফুল্লশ্রী
১০।	দেবকুমার গুপ্ত	শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি
১১।	ফণীভূষণ গুপ্ত (১)	গোলার পাড়
১২।	বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য (১) বারাণসী	পশ্চিমের বাড়ি
১৩।	ব্রজনাথ ভট্টাচার্য বারাণসী	পশ্চিমের বাড়ি
১৪।	মনোরঞ্জন গুপ্ত	শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি
১৫।	শচীন্দ্রনাথ গুপ্ত	শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি (এম-এস, আমেরিকা)

	নাম	বাড়ি
১৬।	সাধনা সেন গুপ্ত (১) ঢাকা	পূব সেন পাড়া
১৭।	হীরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত	নরসিংহ দাশের বাড়ি

পরিশিষ্ট (খ)

১৮৯৩ সাল হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের বর্ণানুক্রমিক তালিকা :

	নাম	বাড়ি
১।	দীপক গুপ্ত	শঙ্কর গুপ্তের বাডি
২।	নিখিল কুমার দাস	বান্ধাবাড়ি
৩।	নিরঞ্জন সেন গুপ্ত (গ্রাসগো)	ভুটি বাড়ি
৪।	শচীন্দ্র নাথ গুপ্ত	শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি
৫।	সমীব গুপ্ত	কানাই গুপ্তের বাডি

পরিশিষ্ট (গ)

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রী প্রাপ্ত ব্যক্তিদের বর্ণানুক্রমিক তালিকা :

	নাম ও বাড়ি	ডিগ্রী	বিশ্ববিদ্যালয়
১।	অজয় কুমার গুপ্ত, শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি।	পি-এইচ-ডি	ব্রিষ্টল (ইংল্যাণ্ড)

নাম ও বাড়ি		ডিগ্রী	বিশ্ববিদ্যালয়
২।	অজিত কুমার দাশ গুপ্ত, দাশের বাড়ি, ছোটহিস্যা।	পি-এইচ-ডি	পুনা
৩।	অমলেন্দু দাস, ফুল্লশ্রী।	ডি-ফিল	কলিকাতা
৪।	অনাদি গুপ্ত, শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি।	পি-এইচ-ডি	খড়্গপুর
৫।	অবিনাশ চন্দ্র দে, চণ্ডী দের বাড়ি, ফুল্লশ্রী।	ডি-ফিল	কলিকাতা
৬।	অমিয় কুমার দাশ গুপ্ত. বকশী বাড়ি।	পি-এইচ-ডি	লণ্ডন
৭।	অমূল্য কুমার দাশ গুপ্ত, দাশের বাড়ি, ছোটহিস্যা।	পি-এইচ-ডি	শিকাগো (আমেরিকা)
৮।	অশ্রুকুমার দাশ গুপ্ত, মুনশী বাড়ি।	পি-এইচ-ডি	ওহায়ো
৯।	ইন্দুভূষণ চাটার্জি ভগবান চাটুয্যের বাড়ি।	ডি-এস-সি	কলিকাতা
১০।	কালিদাস সেন গুপ্ত, দুহিসেনের বাড়ি।	পি-এইচ-ডি	ক্যালিফোর্ণিয়া
১১।	চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী, কালীকান্ত ঠাকুরের বাড়ি।	পি-এইচ-ডি এম-ডি	ফিলাডেলফিয়া উইসকনসিন (আমেরিকা)

	নাম ও বাড়ি	ডিগ্রী	বিশ্ববিদ্যালয়
১২।	চিন্ময়ী দত্ত, (ডক্টর দিগ্বিজয় দত্তের স্ত্রী) দক্ষিণ গৈলা।	ডি-ফিল	কলিকাতা
১৩।	জয়গোপাল সেন গুপ্ত, ভুহিসেনের বাড়ি।	পি-এইচ-ডি	যাদবপুর
১৪।	জয়ন্ত কুমার দাশ গুপ্ত, দাশেব বাড়ি, ছোটহিস্যা।	পি-এইচ-ডি	লণ্ডন
১৫।	জয়ন্তী গুপ্ত, (ডক্টর যোগেশ চন্দ্র গুপ্তের কন্যা) শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি।	পি-এইচ-ডি (মেডিসিন)	বেলফাষ্ট (আয়ারল্যাণ্ড)
১৬।	দিগ্বিজয় দত্ত, দক্ষিণ গৈলা।	ডি-ফিল	কলিকাতা
১৭।	দীনেশ চন্দ্র তপাদার, তপাদার বাড়ি, ফুল্লশ্রী।	ডি-ফিল	কলিকাতা
১৮।	নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত, গোলার পাড়।	পি-এইচ-ডি	আমেরিকা
১৯।	নির্মল কুমার দাশ গুপ্ত, কবিরাজ বাড়ি।	এম-ডি	কলিকাতা
২০।	প্রশান্ত কুমার সেন গুপ্ত। কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি।	ডি-ফিল	কলিকাতা

	নাম ও বাড়ি	ডিগ্রী	বিশ্ববিদ্যালয়
২১।	বিরাজ মোহন গুপ্ত, শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি।	পি-এইচ-ডি	লণ্ডন
২২।	বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, পশ্চিমের বাড়ি।	পি-এইচ-ডি	কেম্ব্রিজ
২৩।	বিশ্বনাথ সেন, কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি।	পি-এইচ-ডি	উইসকনসিন (আমেরিকা)
২৪।	বিশ্বপতি দাশ গুপ্ত, কবীন্দ্র বাড়ি।	পি-এইচ-ডি	লণ্ডন
২৫।	বেলা দাশ গুপ্ত, (পরেশ চন্দ্র দাশ গুপ্তের স্ত্রী) ভরদ্বাজ বাড়ি।	পি-এইচ-ডি	বিশ্বভারতী
২৬।	ব্রজনাথ ভট্টাচার্য, পশ্চিমের বাড়ি।	পি-এইচ-ডি	আমেরিকা
২৭।	মঞ্জুশ্রী গুপ্ত (সেন) (সুধাংশু গুপ্তের কন্যা) কানাই গুপ্তের বাড়ি।	ডি-ফিল	কলিকাতা
২৮।	মাণিক সেন গুপ্ত, রামমোহন দাশের বাড়ি।	ডি-ফিল	কলিকাতা
২৯।	মিথিল রঞ্জন গুপ্ত, শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি।	ডি-ফিল	কলিকাতা

	নাম ও বাড়ি	ডিগ্রী	বিশ্ববিদ্যালয়
৩০।	মিনতি গুপ্ত, (সমীর গুপ্তের স্ত্রী) গোলার পাড়।	পি-এইচ-ডি	লণ্ডন
৩১।	যোগেশ চন্দ্র গুপ্ত, শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি।	এম-ডি	কোলোন (জার্মানি)
৩২।	রমেন্দ্রনাথ সেন শর্মা, পূব সেন পাড়া।	ডি-ফিল	কলিকাতা
৩৩।	সংযুক্তা গুপ্ত, (যতীশ গুপ্তের কন্যা) গোলার পাড।	পি-এইচ-ডি	বিশ্বভারতী
৩৪।	সমীর দাশ গুপ্ত, বকশী বাড়ি।	পি-এইচ-ডি	আমেরিক'
৩৫।	সুধীরবঞ্জন দাশ গুপ্ত, দাশেব বাডি, চৌধুরী হিস্যা।	পি-এইচ-ডি	ঢাকা
৩৬।	সুনীল বিহারী সেন গুপ্ত, কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি।	ডি-এস-সি	ঢাকা
৩৭।	সুরমা দাশ গুপ্ত, (ডক্টর সুরেন্দ্র নাথ দাশ গুপ্তের স্ত্রী) কবীন্দ্র বাড়ি।	পি-এইচ-ডি পি-এইচ-ডি	কলিকাতা কেমব্রিজ
৩৮।	সুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত, কবীন্দ্র বাড়ি।	পি-এইচ-ডি পি-এইচ-ডি ডি-লিট (অনারারী)	কলিকাতা কেমব্রিজ রোম

	নাম ও বাড়ি	ডিগ্রী	বিশ্ববিদ্যালয়
৩৯।	সুরেশ চন্দ্র সেন গুপ্ত, রতন সেনের বাড়ি।	ডি-এস-সি	কলিকাতা
৪০।	হীরেন্দ্র নাথ দাশ গুপ্ত, নরসিংহ দাশের বাড়ি।	ডি-এস-সি	কলিকাতা

পরিশিষ্ট (ঘ)

এম-ডি বা ডাক্তারী শাস্ত্রে পি-এইচ-ডি বাদে অন্যান্য চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের বর্ণানুক্রমিক তালিকা ঃ

	নাম ও বাড়ি	ডিপ্লোমা
১।	কুলভূষণ সেন গুপ্ত, কালুপাড়া, দক্ষিণের বাড়ি।	এম-আর-সি-পি
২।	জ্যোতির্ময় গুপ্ত, দেবী গুপ্তের বাড়ি।	ডি-ও (লণ্ডন)
৩।	ঝরণা সেন গুপ্ত, ভুটি বাড়ি।	ডি-আর-সি-ও-জি
৪।	দুর্গাদাস সেন, দুহিসেনের বাড়ি।	এফ-আর-সি-এস
৫।	ননী গোপাল গুপ্ত, শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি।	এম-ও (কলিকাতা)
৬।	শান্তিরঞ্জন দাশ গুপ্ত, দাশের বাড়ি, চৌধুরী হিস্যা।	ডি-ও-এম-এস (কলিকাতা)

নাম ও বাড়ি	ডিপ্লোমা
৭। শচীন্দ্র কুমাব সেন গুপ্ত, কালুপাড়া, উত্তবের বাড়ি।	ডি-এল-ও
৮। শৈবাল কুমার গুপ্ত শঙ্কর গুপ্তেব বাড়ি।	এফ-আর-সি-এস (লণ্ডন ও এডিনবরা)
৯। সমীর গুপ্ত, গোলার পাড়।	এম-আর-সি-পি
১০। সুধীন্দ্র নাথ সেন, সত্য সেনেব বাড়ি।	এম-আর-সি-পি
১১। সত্যব্রত দাশ গুপ্ত, নরসিংহ দাশের বাড়ি।	ডি-এল-ও

পরিশিষ্ট (ঙ)

চার্টাড´ একাউণ্ট্যাণ্টদের বর্ণানুক্রমিক তালিকা :

নাম	বাড়ি
১। তুহিন কান্তি সেন গুপ্ত	তুহিসেনের বাড়ি।
২। প্রফুল্ল চন্দ্র সেন গুপ্ত	কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি।
৩। সোমেশ দাশ গুপ্ত	যুগল দাশের বাড়ি।
৪। স্বদেশ কুমার গুপ্ত	গোলার পাড়।

পরিশিষ্ট (চ)

এম-ডি ও বিশেষজ্ঞ ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত বাদে মেডিক্যাল গ্রাজুয়েটদের বর্ণানুক্রমিক তালিকা:

	নাম	বাড়ি
১।	অমিতাভ সেন গুপ্ত	কালুপাড়া, দক্ষিণের বাড়ি।
২।	অশোক কুমার দাশ গুপ্ত	দাশের বাড়ি, মেজ হিস্যা।
৩।	অশোক কুমার সেন গুপ্ত	পূব সেন পাড়া।
৪।	উপেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী	মধ্য গৈলা।
৫।	কনকলতা সেন	মজুমদার বাড়ি।
৬।	কার্তিক চন্দ্র গুপ্ত	গোলাব পাড়।
৭।	কার্তিক প্রসন্ন দাশ গুপ্ত	দারোগা বাড়ি।
৮।	কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য (ডি-টি-এম এ্যাণ্ড-এইচ)	ভবেন্দ্র ভট্টাচার্যের বাড়ি।
৯।	ক্ষিতীশ চন্দ্র সেন গুপ্ত	কালুপাড়া, দক্ষিণের বাড়ি।
১০।	চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী (এল-এম-এস)	মধ্য গৈলা।
১১।	চিত্তরঞ্জন দাশ গুপ্ত	নাজির বাড়ি।
১২।	জিতেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত	পূব সেন পাড়া।
১৩।	জ্যোতিপ্রসাদ গুপ্ত	গোলার পাড়।
১৪।	দেবব্রত দাশ গুপ্ত	নরসিংহ দাশের বাড়ি।
১৫।	নগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য	ভবেন্দ্র ভট্টাচার্যের বাড়ি।
১৬।	নলিনাক্ষ সেন গুপ্ত (বারাণসী)	মজুমদার বাড়ি।
১৭।	নির্মলেন্দু দাশ গুপ্ত	দাশের বাড়ি, মেজ হিস্যা।

	নাম	বাড়ি
১৮।	ফণীন্দ্র নাথ গুপ্ত	শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি।
১৯।	বিমান বিহারী সেন গুপ্ত	কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি।
২০।	ভুবনেশ্বর সেন গুপ্ত	কালুপাড়া, দক্ষিণের বাড়ি।
২১।	মৃণাল দত্ত	পার্বতী দত্তের বাড়ি।
২২।	রঞ্জিত কুমার গুপ্ত	ছোট নয়া গুপ্তের বাড়ি।
২৩।	রেণু ভূষণ গুপ্ত	গোলার পাড়।
২৪।	লীনা সেন গুপ্ত	পূব সেন পাড়া।
২৫।	শঙ্কর সেন গুপ্ত	পূব সেন পাড়া।
২৬।	শরৎ চন্দ্র দাশ গুপ্ত	নরসিংহ দাশের বাড়ি।
২৭।	শরৎ চন্দ্র সেন গুপ্ত (এল-এম-এস)	গণের ভিটা।
২৮।	সত্যপ্রিয় গুপ্ত	কানাই গুপ্তের বাড়ি।
২৯।	সুধাংশু ভট্টাচার্য	বামাচরণ ভট্টাচার্যের বাড়ি।
৩০।	সুনীল দাশ গুপ্ত	দাশের বাড়ি, ছোট হিস্যা।
৩১।	সুরঞ্জন সেন গুপ্ত	ভুটি বাড়ি।
৩২।	সুরেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত	কালুপাড়া, দক্ষিণের বাড়ি।
৩৩।	সুশীলচন্দ্র দাশ গুপ্ত	কবিরাজ বাড়ি।

পরিশিষ্ট (ছ)

১৮৯৩ সাল হইতে গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ারদের বর্ণানুক্রমিক তালিকা (প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ বাদে) :

	নাম	বাড়ি
১।	অজিত কুমার গুপ্ত	ছোট নয়া গুপ্তের বাড়ি।
২।	অঞ্জন দাশ গুপ্ত	ভরদ্বাজের বাড়ি।
৩	অতুল চন্দ্র সেন	কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি।

	নাম	বাড়ি
৪।	অনিল কুমার দাশ গুপ্ত	রাজমোহন দাশের বাড়ি।
৫।	অমিয় কুমার সেন	কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি।
৬।	অমূল্য কুমার গুপ্ত	ছোট নয়া গুপ্তের বাড়ি।
৭।	অরুণ দাশ গুপ্ত	যুগল দাশের বাড়ি।
৮।	অরূপ মুখার্জি (এম-এস-সি, ষ্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, গ্লাসগো)	চণ্ডী মুখার্জির বাড়ি
৯।	অশোক কুমার গুপ্ত	শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি।
১০।	কানুভূষণ গুপ্ত	গোলার পাড়।
১১।	কানু সেন গুপ্ত (এম-ই)	সত্য সেনের বাড়ি।
১২।	তপন গুপ্ত	ছোট নয়া গুপ্তের বাড়ি।
১৩।	তমাল সেন গুপ্ত	কালুপাড়া, দক্ষিণেব বাড়ি।
১৪।	তরুণ দাশ গুপ্ত	যুগল দাশের বাড়ি।
১৫।	তরুণ গুপ্ত	গোলার পাড।
১৬।	তুষারকান্তি দাশ গুপ্ত	যুগল দাশের বাড়ি।
১৭।	তুষারকান্তি সেন গুপ্ত	তুহিসেনের বাড়ি।
১৮।	দিলীপ কুমার গুপ্ত (১)	শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি।
১৯।	দিলীপ কুমার গুপ্ত (২)	শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি।
২০।	দেবব্রত দাশ গুপ্ত	যুগল দাশের বাড়ি।
২১।	দেবব্রত গুপ্ত	কানাই গুপ্তের বাড়ি।
২২।	নিখিল কুমার গুপ্ত	চৌধুরী বাড়ি।
২৩।	পরিমল কুন্দগ্রামী	গোপাল পুরোহিতের বাড়ি।
২৪।	পরেশ সেন গুপ্ত	কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি।
২৫।	প্রণব সেন	কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি।
২৬।	প্রবীর গুপ্ত	কানাই গুপ্তের বাড়ি।
২৭।	বাণীভূষণ দাশ গুপ্ত	যুগলদাশের বাড়ি।

	নাম	বাড়ি
২৮।	বিপিনবিহারী দাশ গুপ্ত	রাজমোহন দাশের বাড়ি।
২৯।	বিশ্বদীপ সেন	কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি।
৩০।	মাখন লাল দাশ গুপ্ত	যুগল দাশের বাড়ি।
৩১।	মাধব লাল দাশ গুপ্ত	যুগল দাশেব বাড়ি।
৩২।	মিহির কুমাব দাশ গুপ্ত	দাশের বাড়ি, ছোট হিস্যা।
৩৩।	মিহির প্রকাশ গুপ্ত	গোলাব পাড, গুপ্তের বাড়ি।
৩৪।	রেবতী মোহন গুপ্ত	শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি।
৩৫।	শাস্তিরঞ্জন কুন্দগ্রামী	গোপাল পুরোহিতেব বাড়ি।
৩৬।	শাস্তিরঞ্জন সেন গুপ্ত	কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি।
৩৭।	সত্যব্রত গুপ্ত	শঙ্কব গুপ্তের বাড়ি।
৩৮।	সলিল কুমার দাশ গুপ্ত	বাজমোহন দাশের বাড়ি।
৩৯।	সুধীন্দ্র নাথ গুপ্ত	শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি।
৪০।	সুধীর কুমার দাশ গুপ্ত	দাশের বাড়ি, ছোটহিস্যা।
৪১।	সুপ্রবুদ্ধ সেন	কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি।
৪২।	সুশীল চন্দ্র ভট্টাচার্য	ভবেন্দ্র ভট্টাচার্যের বাড়ি।
৪৩।	হিরণ্ময় সেন গুপ্ত	কালুপাড়া, দক্ষিণের বাড়ি।

পরিশিষ্ট (জ)

এম-এ পাশ (ডক্টরেট ডিগ্রীপ্রাপ্ত বাদে) মেয়েদের বর্ণানুক্রমিক তালিকা :

	নাম	বাড়ি
১।	অণিমা সেন গুপ্ত (এম-এড)	পূব সেন পাড়া
২।	অনুপা সেন	কালুপাড়া, উত্তবের বাড়ি
৩।	অরুনা গুপ্ত	চৌধুরী বাড়ি

নাম	বাড়ি
৪। অরুনা সেন ("সঙ্গীত প্রভাকর")	কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি
৫। অলকানন্দা দাশ গুপ্ত	বকশী বাড়ি
৬। অশোকা দাশ গুপ্ত (চৌধুরী)	দাশের বাড়ি, ছোটহিস্যা
৭। আরতি সেন	কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি
৮। আরতি সেন	মজুমদার বাড়ি
৯। ইরা দাশ গুপ্ত	মুনশী বাড়ি
১০। উমা দাশ গুপ্ত (ডাবল এম-এ)	রামনাথ দাশের বাড়ি
১১। কনক দত্ত	পার্বতী দত্তের বাড়ি
১২। কমলা দাশ গুপ্ত	রামনাথ দাশের বাড়ি
১৩। কমলা সেন গুপ্ত	ভুহিসেনেব বাড়ি
১৪। কল্যাণী গুপ্ত	শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি
১৫। কুঙ্কুম সেন	মজুমদার বাড়ি
১৬। কৃষ্ণা সেন	মজুমদার বাড়ি
১৭। গায়ত্রী গুপ্ত	শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি
১৮। গীতা গুপ্ত	শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি
১৯। গীতা সেন গুপ্ত	ভুহিসেনের বাড়ি
২০। জয়তি সেন গুপ্ত (বধূ)	পুরান বাড়ি
২১। ঝরণা দাশ গুপ্ত	যুগলদাশের বাড়ি
২২। তটিনী গুপ্ত (দাশ)	শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি
২৩। তরু চ্যাটার্জি (গাঙ্গুলী)	প্রসন্ন চ্যাটার্জির বাড়ি
২৪ তৃপ্তি গুপ্ত (সেন গুপ্ত)	আনন্দ সেনের বাড়ি, পূব সেন পাড়া
২৫। দীপিকা দাশ গুপ্ত	যুগল দাশের বাড়ি
২৬। দীপ্তি সেন গুপ্ত	আনন্দ সেনের বাড়ি, পূব সেন পাড়া

	নাম	বাড়ি
২৭।	নীলা দাশ গুপ্ত	বকশী বাড়ি
২৮।	পুরবী সেন গুপ্ত	পুরান বাড়ি
২৯।	প্রতিমা সেন গুপ্ত	পুরান বাড়ি
৩০।	বাণী দাশ গুপ্ত	কবিরাজ বাড়ি
৩১।	ভারতী সেন	মজুমদার বাড়ি
৩২।	মায়া দাশ গুপ্ত (১) (এম-এড)	দাশেব বাড়ি, মেজ হিস্যা
৩৩।	মায়া দাশ গুপ্ত (২)	নিমদাশের বাড়ি
৩৪।	মীনা দাশগুপ্ত	লালুদাশের বাড়ি
৩৫।	যমুনা গুপ্ত	ছোট নয়া গুপ্তের বাড়ি
৩৬।	রত্না দাশ গুপ্ত	দাশেব বাড়ি, ছোট হিস্যা
৩৭।	রমা দাশ গুপ্ত	কবিবাজ বাড়ি, ফুল্লশ্রী
৩৮।	রেণু সিমলাই	সিমলাই বাড়ি
৩৯।	লীলা দাশ গুপ্ত (বিভ্রান্ত)	দাশের বাড়ি, ছোট হিস্যা
৪০।	সবিতা গুপ্ত (সেন গুপ্ত)	শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি
৪১।	সাধনা সেন গুপ্ত	পূব সেন পাড়া
৪২।	সান্ত্বনা সেন গুপ্ত	পূব সেন পাড়া
৪৩।	সীমা সেন গুপ্ত (বধূ)	কালুপাড়া, দক্ষিণের বাড়ি
৪৪।	সুকান্তা সেন	কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি
৪৫।	শেফালি সেন গুপ্ত	তুহিসেনের বাড়ি
৪৬।	স্নিগ্ধা দাশ গুপ্ত	রাজমোহন দাশের বাড়ি
৪৭।	স্নেহ দাশ গুপ্ত	দাশের বাড়ি, ছোট হিস্যা

পরিশিষ্ট (ঝ)

বি-এ ও বি-এস-সি (অনার্স) পাশ মেয়েদের (এম-এ নহে) বর্ণানুক্রমিক তালিকা :

	নাম	বাড়ি
১।	অরুণা দাশ গুপ্ত	বকশী বাড়ি
২।	কৃষ্ণা দাশ গুপ্ত	ভগবান দাশের বাড়ি
৩।	গীতি গুপ্ত	শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি
৪।	চন্দনা ব্যানার্জি	পাঠক বাড়ি
৫।	চিত্রা দাশ গুপ্ত (বধূ)	বকশী বাড়ি
৬।	জয়শীলা গুপ্ত	শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি
৭।	জয়শ্রী গুপ্ত (রায়)	শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি
৮।	জুঁই সেন গুপ্ত	তুহিসেনের বাড়ি
৯।	ঝরণা গাঙ্গুলী (বধূ)	ললিত গাঙ্গুলীর বাড়ি
১০।	নীলিমা গুপ্ত (বধূ)	ছোট নয়া গুপ্তের বাড়ি
১১।	প্রতিমা দাশ গুপ্ত	দাশের বাড়ি, বড় হিস্যা
১২।	বন্দনা দাশ গুপ্ত	দাশের বাড়ি, বড় হিস্যা
১৩।	ব্রততী দাশ গুপ্ত	বকশী বাড়ি
১৪।	ভারতী দাশ গুপ্ত	কবীন্দ্র বাড়ি
১৫।	মঞ্জুশ্রী দাশ গুপ্ত	কবীন্দ্র বাড়ি
১৬।	মনোবীণা গুপ্ত	ছোট নয়া গুপ্তের বাড়ি
১৭।	মহাশ্বেতা দাশ গুপ্ত	বকশী বাড়ি
১৮।	রূপশ্রী দাশ গুপ্ত	নরসিংহ দাশের বাড়ি
১৯।	লীলা দাশ গুপ্ত	বকশী বাড়ি
২০।	বীথি গুপ্ত	শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি
২১।	সিপ্রা দাশ গুপ্ত	রাজমোহন দাশের বাড়ি

	নাম	বাড়ি
২২।	সুজাতা গুপ্ত (দাশ গুপ্ত)	শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি
২৩।	সুধা দাশ গুপ্ত (চক্রবর্তী)	আলোক গুপ্তের বাড়ি
২৪।	সুধা পিপলাই (চাটার্জি)	পিপলাই বাড়ি

গার্লস স্কুল

গৈলা গ্রামে ছেলেদেব জন্যে হাই ইংলিশ স্কুল খোলা হয় ১৮৯৩ সালে, কিন্তু মেয়েদের ইংরেজী শিক্ষাব বন্দোবস্ত ছিল না। যাঁহারা চাকরি বা অন্য কারণে শহরে থাকিতেন তাঁহাদের মেয়েবা সেখানকার ইংরেজী স্কুলে পডিত। শঙ্কব গুপ্তেব বাডির শ্যামাচরণ গুপ্তের কন্যা তটিনী ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ইউনিভাবসিটিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার কবেন। এই সব কারণে গ্রামে মেয়েদেব মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রবল আগ্রহ দেখা দেয়। কিন্তু গ্রামটি খুব বড এবং মাঝখানে প্রকাণ্ড বাজার থাকায় ছোট ছোট মেয়েদের একস্থানে একত্র হইয়া স্কুলে অধ্যয়নে বিশেষ অসুবিধা হয়।

এই অবস্থায় স্থির হয় যে আপাতত পূব পাড়ায় ও পশ্চিম পাড়ায় মেয়েদের জন্যে দুইটি পৃথক মাইনর স্কুল স্থাপন করিয়া তাহাদের শিক্ষার পথ সুগম করা হইবে। তদনুসারে নিমদাশের বাড়ির ললিত মোহন দাস কলিকাতায় পূব পাড়া গার্লস স্কুলের পরিকল্পনা করেন। শঙ্কর গুপ্তের বাড়ির ননীভূষণ গুপ্ত এই কার্যে তাঁহার বিশেষ সহায়তা করেন। ৺পূজার সময় গৈলায় পূর্ব পাড়া বাসীদের এক সভায় এইরূপ স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ছোট নয়া গুপ্তের বাড়ির দরজায় স্কুল প্রথমে বসিতে আরম্ভ করে।

১৯১৩ সালের ৩১শে মে তারিখে রামনাথ দাশের বাড়ির দরজায় বাঁধান জায়গায় জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ষ্ট্রং (Mr. Strong) সাহেব

আনুষ্ঠানিক ভাবে স্কুল খোলেন। শঙ্কর গুপ্তের বাড়ির রাসবিহারী গুপ্ত হেড পণ্ডিত নিযুক্ত হন। সেক্রেটারি নিযুক্ত হন কালুপাড়ার বৃন্দাবন সেন এবং এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি হ'ন চৌধুরী বাড়ির প্রিয়বন্ধু গুপ্ত।

ছোট নয়া গুপ্তের বাড়ির রামচরণ গুপ্ত, বিশ্বেশ্বর গুপ্ত ও আশুতোষ গুপ্ত তাঁহাদের দরজার জমি স্কুলের নামে নাম মাত্র খাজনায় পাট্টা দেন। পরে ঐ নিচু জায়গা বাঁধাইয়া সুন্দর ও বড় টিনের ঘর করিয়া ওখানে স্কুল বসিতে থাকে। জায়গা ভরাট করার ও স্কুল গৃহ নির্মাণ করার ব্যয়ের প্রধান অংশ বহন করেন কালুপাড়ার বৃন্দাবন সেনের পরিবার। পাড়ার লোকেও চাঁদা দেয়। স্কুল গৃহের একটি বড় কামরা বৃন্দাবন ও মধুবাবু প্রভৃতির মাতা ৺মনোরমা দেবীর নামে মনোরমা হল নামে অভিহিত হয়। স্কুল পরিকল্পনা কার্যকরী করার প্রধান কৃতিত্ব বৃন্দাবন বাবুর।

স্কুলে প্রথমে ৬০।৬২ জন ছাত্রী ছিল এবং বহুদিন সংখ্যা বিশেষ বাড়ে নাই। ইংরেজী মাইনর ক্লাসের মান পর্যন্ত পড়ান হইত।

প্রথম দিকে মেয়েদের নিকট হইতে কোনও বেতন গ্রহণ করা হইত না। পাড়ার লোকের চাঁদা হইতেই শিক্ষকদের বেতন প্রভৃতি দেওয়া হইত। কলিকাতায় ললিতবাবুই চাঁদা আদায় করিতেন। বাহিরের চাঁদা সেক্রেটারি সংগ্রহ করিতেন। পরে স্কুল ইন্‌স্পেক্টরের পীড়া-পীড়িতে বেতন নেওয়া আরম্ভ হয়। কিন্তু পাড়ার লোকের চাঁদা বহু বৎসর পর্যন্ত চলিয়াছিল। ললিতবাবুর চেষ্টায় ঢাকার নবাব পরিবারের আক্তার বানু বেগম সাহেবা এই স্কুলের জন্য ৫০০৲ এককালীন দান করেন এবং গ্রামবাসীদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেন। সাহায্য বাবদ গোড়া হইতেই ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে মাসিক ১৫৲ টাকা পাওয়া যাইত। ১৯১৫ সাল হইতে গভর্ণমেণ্ট বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হারে মাসিক সাহায্য দিতেন। শঙ্কর গুপ্তের বাড়ির সুবোধ চন্দ্রের স্ত্রী ইন্দুপ্রভা বি-এ কোনও বেতন না নিয়া এই স্কুলে কিছু কাল পড়াইয়াছিলেন। এ বাড়ির প্যারী-

মোহন গুপ্ত চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গ্রামে বাস করার কালে ইংরেজী শিক্ষা দানের জন্য কিছুকাল মাসে ১৫৲ করিয়া সাহায্য দিতেন।

১৯৪২।৪৩ সালে পাড়ার কয়েকটি শিক্ষিত যুবক স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া উঁচু ক্লাসের মেয়েদের ম্যাট্রিক পরীক্ষার উপযুক্ত করার জন্য শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। ১৯৪৩ সালে এইভাবে এই স্কুল হইতে প্রাইভেট (Private) ভাবে পাঁচ জন মেয়ে পাশ করে। ১৯৪৪।৪৫ সালেও কয়েকটি পাশ করে। ১৯৪৪ সালে গৈলা স্কুল মেয়েদের জন্য ম্যাট্রিক পরীক্ষার অনুমোদন পাইলে পরে এই স্কুল হইতে ম্যাট্রিক দেওয়ার জন্য শিক্ষা দেওয়া বন্ধ করা হয়।

প্রতি তিন বৎসর অন্তর অন্তর পাড়ার সকলে একত্র হইয়া ম্যানেজিং কমিটি, সেক্রেটারি ও প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করিতেন। বৃন্দাবন বাবু স্কুল সৃষ্টির সময় হইতে জীবিত থাকা পর্য্যন্ত সেক্রেটারি ছিলেন। পরে প্রিয়বন্ধু গুপ্ত (চৌধুরী বাড়ি) ও রমণী গাঙ্গুলী সেক্রেটারি হইয়াছিলেন।

উপরে লিখিত ব্যক্তি বাদে শঙ্কর গুপ্তর বাড়ির শশীকান্ত গুপ্ত, প্রিয়নাথ গুপ্ত, ছোট নয়া গুপ্তের বাড়ির অক্ষয় কুমার গুপ্ত স্কুলের জন্য বরিশালে গভর্ণমেণ্ট ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহায্য পাইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

খেলাধূলা

বিগত শতাব্দীতে হা-ডু-ডু প্রভৃতি দেশী খেলার প্রচলন ছিল। ইংল্যাণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনারোহণের হীরক জুবিলির অল্প পরেই কয়েকজন যুবকের উদ্যোগে ও ছাত্র সম্মিলনী সভার তৎকালীন সভাপতি গোবিন্দ চন্দ্র সেনের (কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি) উৎসাহে ঐ সভার তত্ত্বাবধানে পাশ্চাত্য ক্রীড়ার জন্য ভিক্টোরিয়া ডায়মণ্ড জুবিলি, সংক্ষেপে ভি-ডি-জে ক্লাব স্থাপিত হয়। এই খেলার দলের প্রথম ক্যাপটেন ছিলেন মধুসূদন সেন গুপ্ত (কালুপাড়া, দক্ষিণের বাড়ি) ও প্রেসিডেণ্ট ছিলেন বিপিন বিহারী গুপ্ত (শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি)। ইঁহাদের ক্রীড়া প্রাঙ্গন ছিল কালুপাড়ার সেনদের দরজার মাঠ। কয়েক বৎসর ইঁহারা ক্রিকেট খেলিতেন। উঁহারা মাদারিপুর ও অন্যত্র খেলিতে যাইতেন ও নিজেদের মাঠে পার্শ্ববর্তী গ্রামের দলদের খেলিতে আহ্বান করিতেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই ক্রিকেটে ইঁহাদের উৎসাহ কমিয়া যায় ও ইঁহারা ফুটবলের দিকে আকৃষ্ট হন। ঐ সময়ে পশ্চিমপাড়া ও ফুল্লশ্রীতে স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব নামে এক খেলার দল গঠিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিত। খেলার মান উন্নত করার জন্য ভি-ডি-জে ক্লাব প্রতিযোগিতা মেডাল ম্যাচ প্রবর্তন করেন। বিজয়ী দলকে মেডাল পুরস্কার দেওয়া হইত। ঐ প্রতিযোগিতায় মাদারিপুর ও বরিশাল জিলার অনেক গ্রামের দল অংশ গ্রহণ করিত। ফলে

লোকের ফুটবল খেলায় খুব উৎসাহ সঞ্চার হইয়াছিল এবং খেলার জন্যে গ্রামে ছোট ছোট বহু দল সৃষ্টি হইয়াছিল।

কিছুকাল পরে ভি-ডি-জে ক্লাবের প্রথম উদ্যোক্তারা কর্মব্যপদেশে গ্রাম ছাড়িয়া গেলে এই ক্লাবের তৎপরতা কমিতে থাকে। আরও কিছু পরে গৈলা স্কুলের সংলগ্ন মাঠে গ্রামের বহু ছাত্র খেলিতে আরম্ভ করে। ইহার পর ভি-ডি-জে ক্লাব নাম মাত্রেই বাঁচিয়াছিল। তখন স্কুলের মাঠই ফুটবল খেলার প্রধান স্থান ছিল, যদিও বিভিন্ন পাড়ায় ছোট ছোট ক্লাবও ছিল।

এই সময়ে হা-ডু-ডু খেলায় আবার লোকের উৎসাহ জাগিয়া উঠে। কালুপাড়ার মাঠে ও অন্যত্র বহু স্থানে ঐ খেলা হইত। হা-ডু-ডু খেলার প্রতিযোগিতা ম্যাচও হইত ও বহুলোক অংশ গ্রহণ করিত। ভিন্ন গ্রামের দলও খেলিতে আসিত কিন্তু ভি ডি-জে ক্লাবের ইহার সঙ্গে কোনও যোগ ছিল না।

কালুপাড়ার দরজার মাঠের উপরস্থ মালিক ছিলেন কালুপাড়া সেনের উত্তরের বাড়ি ও দাশের বাড়ির চার হিস্যা। এই মালিকদের অধীনে এই মাঠে ভি-ডি-জে ক্লাবের খেলার স্বত্ব বিগত ক্যাডাষ্ট্রাল সার্ভের (Cadastral Survey) সময়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। কোনও গ্রাম্য খেলার দলের নিজেদের নামে মাঠে খেলার স্বত্বের সরকারী ভাবে স্বীকৃতির দৃষ্টান্ত বিরল।

পরে বিদেশে খেলায় যাঁহারা বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে রেণু সিমলাইয়ের (সিমলাই বাড়ির বেণীমাধবের কন্যা) নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁহার পিতার সহিত এলাহাবাদে থাকেন ও উত্তর প্রদেশের মেয়েদের ভলিবল (Volley-ball) খেলার দলের ক্যাপটেন হিসাবে প্রতিযোগিতা খেলিতে মস্কো (রাশিয়া) গিয়া খুব সুখ্যাতি অর্জন করেন।

আর্থিক অবস্থা

গ্রামের আর্থিক অবস্থাকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়—ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের পূর্ববর্তী সময়ের আর্থিক অবস্থা এবং ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের পরবর্তী সময়ের আর্থিক অবস্থা। প্রথমে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের পূর্ববর্তীকালের আর্থিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হইল।

গৈলার ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদের অধিকাংশের এবং কায়স্থ ও কর্মকারদের অল্প সংখ্যকের বসত বাটি খারিজা তালুক অন্তর্ভূক্ত অর্থাৎ তাঁহারা নিজ নিজ বাড়ির জন্য গভর্ণমেণ্টকে খাজনা দিতেন। এই সমস্ত খারিজা তালুক অধিবাসীদের পূর্বপুরুষের নামে। প্রায় প্রত্যেক তালুকেই বসত বাটি ও গ্রামের বহির্ভাগস্থিত পার্শ্ববর্ত্তী মৌজার চাষী জমি অন্তর্ভূক্ত। গ্রামের অধিকাংশ বংশের বিবরণ যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে প্রথম হইতেই তাঁহারা অল্পাধিক ভূমির মালিক এবং তালুকদার বলিয়া খ্যাত। সর্বাপেক্ষা বেশি জমির মালিক দাশের বাড়ির ৪ হিস্যা। মিশ্র বংশও প্রাচীন তালুকদার বলিয়া খ্যাত। (এখানে এ কথা বলিয়া রাখা দরকার যে, গৈলা বলিতে যাহা বুঝায় সে ভূখণ্ডের মধ্যে চাষী জমি এক রকম নাই, উহা গ্রামের প্রান্তভাগে ও পার্শ্ববর্ত্তী মৌজা সমূহে অবস্থিত।) অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি দাশের বাড়ির বড় হিস্যার পূর্ব পুরুষ কাশীনাথ দাশ ও রামনাথ দাশের

বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা রামনাথ দাশ নবাব সরকারে চাকরি করেন ও দেশে বহু ধনসম্পত্তির মালিক হন। ঐ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পিপলাই বাড়ির রামশঙ্কর পিপলাই ওকালতি করিয়া অনেক জমি খরিদ করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় দেশের প্রধান প্রধান সব বংশের পূর্বপুরুষদের নামেই বহু খারিজা তালুক লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। মুনশী বাড়ির রামলোচন দাশও নবাব সরকারে চাকরি করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন ও সেলিমাবাদ পরগণা ক্রয় করেন এবং তৎপরে বরিশাল জিলাস্থ সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চলের ইজারা নেন। গ্রামে তাঁহারাই জমিদার বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সর্বসুদ্ধ তাঁহার জমিদারী ছিল বিরাট, কিন্তু তাহা গৈলা হইতে বহু দূরে ছিল।

এই সব ভূম্যধিকারিগণের খামারে কোনও জমি ছিল না। সবই প্রজাপত্তনী; সেজন্য গ্রামে ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য তালুকদার ছিল। পরে কয়েকজন কিছু খাস জমি করিয়াছিলেন। তবে তাঁহারা নিজেদের খোরাকীর সংস্থানের জন্য টাকার পরিবর্তে অনেক জমি হইতে ধান্য খাজনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই ধান খাজনার নিরিখ ছিল প্রতি কানিতে ১৮ কাঠি (সাধারণত ৬০ তোলার সেরের ২৮ সেরে এক কাঠি)। ১ কানির পরিমাণ ছিল ৪ বিঘা ১৬ কাঠা, কাজেই প্রতি বিঘায় প্রায় ২ মন ধান খাজনা ছিল। নগদ খাজনা ছিল প্রতি কানিতে গড়ে ৬৲ অর্থাৎ প্রতি বিঘাতে ১।০আনা। জমি বিশেষ উর্বরা ছিল না। প্রধান কৃষি ছিল ধান ও পাট। তিল বা অন্য রবি শস্য বিশেষ জন্মিত না। কোন বৎসরে অতিরিক্ত জল হইত আবার কখনও যথেষ্ট জলের অভাব হইত। ফলে শস্যের উৎপাদন বেশি ছিল না এবং প্রজারা বিশেষ সম্পন্ন ছিল না। ভদ্রলোক শ্রেণী সকলেই কৃষিনির্ভর ছিল।

বড় বড় ভূম্যধিকারীরা প্রতিমা গড়ার জন্য কুম্ভকারদের, ক্ষৌর কর্মের জন্য নরসুন্দরদের, পূজা পার্বনাদি উপলক্ষে বাজানোর জন্য নট্টদের, কাপড় কাচার জন্য রজকদের ও বাড়ি পরিষ্কারের জন্য ভূঁইমালীদের

চাকরান জমি দিতেন। চাকরান জমিভোগীরা মনিবগণের জন্য ঐ সব কাজ সারা বৎসর করিত এবং সেজন্য জমির উপসত্ব ভোগ করিত—নগদ টাকা বিশেষ পাইত না। কিন্তু পরে যখন মনিবদের ভিতর ভাগ হইয়া নূতন প্রতিমা গড়া আরম্ভ হইল তখন সে জন্য পৃথক মজুরী কুম্ভকারদের দেওয়া হইত। অবশ্য এই সব কুম্ভকার, নরসুন্দর, নট্ট, রজক ও ভূঁইমালীরা মনিব বাড়িতে বিবাহাদি সব ক্রিয়া কর্মোপলক্ষে নানাভাবে জিনিষ পত্রাদি ও নগদ অর্থও পাইত।

অনেক বংশের গুরু ও পুরোহিতদের জন্য ব্রহ্মত্র দেওয়া ছিল।

ব্রাহ্মণদের মধ্যে তর্কবাগীশ বংশ, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য বংশ ও বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের ব্যবসা ছিল গুরুতা। তাঁহাদের অনেক শিষ্য ছিল। ডিংসাই শ্রোত্রিয়গণ ছিলেন ভবদাশ বংশের পুরোহিত এবং বঙ্গবাস বংশীয়গণের যাজনিক ছিল প্রধানত সেন ও গুপ্ত বংশের মধ্যে। ইহাদের মধ্যে মঠ বাড়ির কাহারও কাহারও শিষ্যও ছিল। কুন্দগ্রামীগণেরও যাজনিক ব্যবসাই প্রধান ছিল।

বৈদ্যদের মধ্যে প্রাচীন কালে পূব সেন পাড়ার শুকদেব সেন ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কবীন্দ্র বাড়ির মদন মোহন দাশ কবীন্দ্র বিখ্যাত কবিরাজ ছিলেন। দেশ বিদেশ হইতে তাঁহাদের নিকট চিকিৎসার জন্য লোক আসিত। কবীন্দ্র বাড়ি মদন কবীন্দ্রের পর হইতে বরাবরই কবিরাজদের বাড়ি ছিল। পরবর্তী কালে চন্দ্রকুমার দাশ কবিভূষণ ও ললিত মোহন দাশ কবিসাগর বিখ্যাত কবিরাজ ছিলেন। দুহিসেনেব বাড়ির তারিণী চরণ সেন, হরকুমার সেন ও নীল কমল সেন নাম করা কবিরাজ ছিলেন।

কায়স্থগণের কাহারও কাহারও তালুকদারী ছিল, অনেকের বাজারে দোকান ও ছোট ব্যবসায় ছিল। চাউলের ব্যবসায়ও কেহ কেহ করিত। অনেকে কৃষিজীবী ছিল এবং ৫০।৫৫ বৎসর পূর্বে কেহ কেহ নৌকাও চালাইত এবং কেহ কেহ ঘরামির কার্য্য করিত।

কর্মকারদের মধ্যে কেহ কেহ তালুকদার ছিলেন। অধিকাংশই লোহার দা, বটি, খন্তা, কুড়াল, কোদাল. খেজুর গাছ কাটা কাটারি, কাস্তে, লাঙ্গলের ফাল, লেজা, সরকি প্রভৃতি তৈয়ার করিত। প্রসিদ্ধি আছে যে তাহাদের পূর্বপুরুষগণ মুসলমান যুগে গাঁদা বন্দুক ও যুদ্ধের জন্য অস্ত্র শস্ত্র তৈয়ার করিত। কিছু সংখ্যক স্বর্ণ শিল্পীও গ্রামে ছিল। মহিমচন্দ্র কর্মকার উকীল ও বিপিন চন্দ্র কর্মকার মোক্তার হইয়াছিলেন।

কুম্ভকারেরা প্রতিমা নির্মাণ করিত এবং মাটির হাঁড়ি, কলসী প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈয়ার করিত। গোয়ালা, নরসুন্দর ও রজক প্রভৃতি নিজেদের জাতীয় ব্যবসায় করিত। নরসুন্দর জাতির মধ্যে প্রসন্ন কুমার শীল ও তারাপ্রসন্ন শীল ভাল কবিরাজ ছিলেন। মালাকারেরা প্রতিমার ও বিবাহাদি অনুষ্ঠানে শোলার ফুল, মুকুট, মালা প্রভৃতি তৈয়ার করিত।

গৈলার বাজার এতদঞ্চলে খুব বড় বাজার। বাজারে বহু দোকান ও বহু রকমের ব্যবসায়ী ছিল। এখানকার মোদকরা উৎকৃষ্ট পাতলা ফুলকা বাতাসা তৈয়ার করিত। কাঠের মিস্ত্রীগণ টুল প্রভৃতি হরেক রকম জিনিস তৈয়ার করিয়া বিক্রয়ের জন্য আনিত। উপরোক্ত দোকান ও ব্যবসায়ে মূলধন কর্জ দিয়া অনেক বিত্তশালী লোক সুদে ভাল উপার্জন করিত। ইহা ভিন্ন অনেকে নিজ নিজ প্রজাগণের মধ্যে কর্জ লগ্নী করিত। দাশের বাড়ির কৃষ্ণসুন্দর দাশ কর্জলগ্নী করিয়া প্রভূত অর্থের মালিক হইয়াছিলেন। প্রজা ও ভূম্যধিকারীদের পূর্বপুরুষেরা যে জমি অর্জন করিয়াছিলেন তাহার পর অনেকেই নূতন জমি অর্জন করিতে পারে নাই। কালক্রমে তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হওয়ার ফলে ঐ জমি উহাদের মধ্যে ভাগ হইয়া গিয়াছিল। তাহাতে ভূম্যধিকারী ও প্রজা উভয়েই গরিব হইতেছিল। অনেক প্রজাদেরই পরে নিজ পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত জমি ছিল না এবং টাকা কর্জ করা অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছিল।

কেহ কেহ জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করিতেন। নিমদাশের বাড়ির দুর্গামোহন দাশ লাকুটিয়া ষ্টেটের দেওয়ান ছিলেন। কেহ বা ওকালতি বা মোক্তারী করিত। দুর্গাচরণ পিপলাই ওকালতি করিয়া অনেক ভূসম্পত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। বকশী বাড়ির কালীকুমার দাশ ও পুরান বাড়ির দীনবন্ধু দাশ প্রভৃতি উকীল ছিলেন। রামচরণ দাশ ও রসিক চন্দ্র দাশ প্রভৃতি মোক্তার ছিলেন।

নমশূদ্র, খৃষ্টান ও মুসলমানগণ প্রধানতঃ কৃষিজীবী ছিল। নমশূদ্রদের মধ্যে অনেকে ছুতার মিস্ত্রীর কাজ করিত ও টিনের ঘর তৈয়ার করিত। ফুল্লশ্রীর মাধব মিস্ত্রী উৎকৃষ্ট আলমারি, টেবিল প্রভৃতি তৈয়ারি করিতে পারিত। নমশূদ্রদের মধ্যে অনেকে অবসর সময়ে নৌকা চালাইত। মুসলমানগণের কেহ কেহ হরেকরকম ব্যবসা করিত। বর্ষার দিনে বড় বড় গাছ কিনিয়া তাহা নৌকায় আনিয়া বাড়ি বাড়ি বিক্রী করিত। পাটের মরশুমে তাহাদের অনেকে পাটের বেপারি ও ফরিয়ার কাজ করিয়া বেশ লাভ করিত। নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে যে চাউল জন্মিত তাহা মোটা ও লালরঙের, সে জন্য বার মাসই এখানে বালাম চাউল বিক্রীর জন্য আনা হইত। ঐ সব ব্যবসায়ে কায়স্থ ও মুসলমানগণ অংশ গ্রহণ কবিত। দোকান করা বা ব্যবসা চালানো কাজে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণ অপেক্ষাকৃত কম অংশ গ্রহণ করিত।

বিদেশে ব্যবসা ও চাকরি করিয়া কম লোকেই অর্থোপার্জন করিত। লালমোহন দাশের (লালুদাশের বাড়ি) টরকি বন্দরে এবং দীঘির পারের দত্তদের কলিকাতা অঞ্চলে বড় ব্যবসা ছিল।

অধিকাংশ ভূম্যধিকারীই নিজেদের স্বল্প আয়ের তালুকদারীর উপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে গ্রামের অধিকাংশ পরিবারই মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্য-বিত্ত শ্রেণীর ছিল। অল্পসংখ্যক পরিবারেরই অবস্থা সচ্ছল ছিল। সে জন্য অনেকেরই পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ বা বিবাহাদি উপলক্ষে ধার বা কর্জ করিতে হইত। তবে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র বেশ সস্তা ছিল এবং

সংসারযাত্রাও উপকরণবহুল ছিল না। মাছ অনেকে বড়শি বা জাল দিয়া পুকুব বা খাল হইতে ধবিত। এই সব কারণে দৈনন্দিন সংসার ব্যয় সকলেবই মোটামুটি চলিয়া যাইত। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বর্তমান শতাব্দের প্রাবম্ভে গৈলাব বাজাবে প্রচলিত জিনিসের মুল্য সম্বন্ধে একটা ধারণা হইতে পাবে—

চাউল প্রতি মন		২৲—৩৲
মুসুবী ডাইল প্রতি সেব		⁄৫—⁄১০ গণ্ডা
খেসাবি	"	⁄০
বুট	"	⁄০
সবিষাব তৈল	"	।০—।⁄০
চিনি	"	⁄—।০
গুড	"	⁄১০—⁄
খেজুবি পাটালি গুড		⁄—।০
মিছরি	"	।⁄
বাতাসা	"	⁄—⁄১০
তুধ	"	⁄ (বর্ষাকালে ⁄১০—⁄১০)
ঘি (গাওয়া)	"	১।০
কেরোসিন ১ বোতল		⁄১০
পান ১ বিড়া (৮০)		⁄০—⁄০
হাসের ডিম প্রতিটি		৫
বা ৩টা—		১০

মাছ কাটিয়া বা সের দরে বিক্রী হইত না। ইলিশ মাছ প্রতিটি ⁄১০ হইতে।০ ও মাঝারি আকৃতির কইমাছ প্রতি কুড়ি (মাছের কুড়ি ২৪টায় ধরা হইত) ।⁄—॥০।

ব্যবহার্য ধুতি প্রতিজোড়া	১॥—২৲
ঐ সাড়ি ”	১৸—৩৲
চৌকা আকৃতির বড় কাগজ	
সাদা ১ দিস্তা—	৵
বালি	/১০

পেনসিল প্রতিটি ৲১০ ও পরে ৲৫। বর্তমান কালের একসারসাইজ বুকের চল ছিল না।

গৈলা স্কুলের উর্ধ্বতম ২ ক্লাসের বেতন ছিল মাসিক ১৸০।

ইংরেজী শিক্ষার যুগ

ইংরেজী শিক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিতগণ চাকরি ও ওকালতি প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং ক্রমেই এই সব চাকরিজীবী এবং উকীল ডাক্তার প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রথম দিকে অনেকেই ছিল ছোট চাকরিজীবী। কেহ কেহ কলিকাতা ও বরিশালে কণ্ট্রাক্টরী প্রভৃতি নানা ব্যবসায়ে আত্মনিযোগ করেন।

কর্মোপলক্ষে শহরে বাস করিলেও এই সব চাকরিজীবীদের এবং ব্যবসায়ীদের গ্রামের সঙ্গে ছিল ঘনিষ্ঠ সংযোগ। নিজেরা স্ত্রীপুত্রাদি সহ বিদেশে বাস করিলেও একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথার জন্য প্রত্যেকের বাড়িতে লোক থাকিত। নিজেরাও পূজার সময়ে সপরিবারে গ্রামে আসিতেন। পুত্র কন্যার বিবাহাদিও গ্রামে সম্পন্ন করিতেন। সেজন্য মাসে মাসে মনি অর্ডার করিয়া দেশে টাকা পাঠাইত ও বাস করার সুবিধার জন্য প্রথমে টিনের ঘর ও পরে পাকা বাড়ি নির্মাণ করিতে লাগিল। (পুর্বে বলা হইয়াছে বিংশ শতাব্দীতে বহু বাড়িতেই পাকা দালান নির্মিত হয়)। বাহিরের লোকেরা ঠাট্টা করিয়া বলিত, গৈলা গ্রাম মনিঅর্ডারের উপর নির্ভরশীল (money-order-fed village)। শহর হইতে

আর্থিক অবস্থা

গ্রামে চাকরি ও ব্যবসায় উপলক্ষে অর্থাগম হওয়ার ফলে গ্রামে (দোকানদার, ব্যবসায়ী, ছুতার, কর্মকার, রাজমিস্ত্রী, যোগালিয়া অধর ধুপী উৎকৃষ্ট রাজমিস্ত্রী ছিল) মজুর প্রভৃতি সব লোকের ভিতরই অনেক নূতন অর্থের আগম ও বণ্টন হইতে লাগিল। বলা যায় যে ইংরেজী শিক্ষার ফলে গ্রামের সর্বশ্রেণীর লোকেরই আর্থিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়।

পরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে কিন্তু লোকের আয় সেই অনুপাতে বাড়িল না। তাহাতে খরচ পূর্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গেল। বিদেশ হইতে আগত অর্থে উপযুক্ত ভাবে অভাব আর মিটিত না। অপর দিকে কৃষিজীবী শ্রেণীও খাদ্য মূল্য বৃদ্ধির সুযোগ পাইল না। কারণ দুই এক ঘর ব্যতীত অধিকাংশেরই নিজেদের জমির শস্যে সারা বৎসর খোরাকী চলিত না। তাহারা বিক্রী তো করিতে পারিতই না অধিকন্তু চাউল, ডাইল প্রভৃতি কিনিয়া খাইত।

পঞ্চাশ সনের দুর্ভিক্ষ

বাংলা ১৩৫০ সনে (ইং ১৯৪৩) ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ফলে গ্রামে যাহারা বরাবরই বাস করিত তাহারা খুবই কষ্টে পড়ে। দুঃস্থ লোকদের জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে ইউনিয়ন বোর্ডের মাধ্যমে লঙ্গরখানা খোলা হইয়াছিল। গ্রামেও জ্যোতিভূষণ গুপ্তের (গোলার পাড়) নেতৃত্বে অনুরূপ উদ্দেশ্যে একটী সমিতি গঠিত হইয়াছিল। সমিতি গ্রামে ও বরিশাল শহর নিবাসী গৈলার লোকদের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিত। কলিকাতায় 'গৈলা সম্মিলনী' তদানীন্তন সভাপতি কুমুদ বিহারী সেনের উদ্যোগে অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই কমিটির নিকট প্রেরণ করিয়াছিল, কিন্তু সরকারী সাহায্য ও গ্রামের লোকের সংগৃহীত অর্থ তাহাদের অভাব মিটাইতে পারে নাই। অনেকে প্রথম

দেশ ছাড়িয়া কলিকাতা প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলে নানারকম চাকরি যোগাড় করিয়া নিল। তালুকদার শ্রেণী খুবই অর্থকষ্টে পড়ে; কারণ ধান বা নগদ খাজনা আদায় একরকম বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। যাহারা লগ্নী কারবার করিত তাহাদের অধিকাংশই আর টাকা আদায় করিতে পারিতেছিল না অথচ দ্রব্য মূল্য ক্রমশই বাড়িতেছিল। এই দুর্ভিক্ষের বৎসরের পর হইতেই পূজার সময় বিদেশ হইতে গ্রামে আগমনকারীর সংখ্যা ক্রমশ কমিতে থাকে। দুর্ভিক্ষ দূর ইহলেও লোকের আর্থিক অবস্থার আর উন্নতি হয় নাই।

ইংরেজী শিক্ষিতদের জীবিকা

প্রথম হইতেই গ্রামের ইংরেজী শিক্ষিতেরা ওকালতি, ডাক্তারি প্রভৃতি ব্যবসা এবং সরকারের শাসন, বিচার, শিক্ষা, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি প্রভৃতি বিভাগে চাকরি নিতে আরম্ভ করে। শেষে পোষ্টাল, রেলওয়ে, ডিফেন্স, আর্মি, পুলিশ প্রভৃতি কোন বিভাগই বাদ পড়িল না। স্বাধীনতা অর্জনের ফলে অনেক উচ্চ পদের চাকরি, যাহা পূর্বে কেবল মাত্র ইংরেজদের অধিকারেই থাকিত, তাহাতে দেশী লোকের নিয়োগ হইতে লাগিল। গৈলা গ্রামের উচ্চ শিক্ষিতেরাও তাহার পূর্ণ সুযোগ লাভ করে। বর্ত্তমানে আই-এ-এস হইতে নিম্নতম কেরানী প্রভৃতি প্রায় সব রকম চাকরিতে ও ভারতীয় সেনা ও নৌবিভাগে গ্রামের লোক রহিয়াছে। ইহা ভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান (দেশী বা বিদেশী) এবং পূর্বকার দেশীয় রাজ্য প্রভৃতিতেও অনেকের চাকরি হয়। স্বাধীনতা অর্জনের পর সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে গ্রামের বহু ইঞ্জিনিয়ার ও ডাক্তার নিযুক্ত আছেন। ব্যবশায়েও

কেহ কেহ লিপ্ত হইয়াছেন। সকলের পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভবপর নয়। কেহ কেহ সরকারী উপাধি পাইয়াছেন। অপেক্ষাকৃত উচ্চ পদের কিছু চাকুরিয়ার ও ওকালতি, ডাক্তারি প্রভৃতি ব্যবসা অবলম্বীদের ও সরকারী উপাধি প্রাপ্তদের পৃথক তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। (এই তালিকাতে মৃতব্যক্তির নামও আছে)।

পরিশিষ্ট (১)

সরকারী চাকরি (বর্ণানুক্রমে)

চাকরি	নাম ও বাড়ি
আই-এ-এস	অমিয় কুমার সেন, কালুপাড়া, দক্ষিণের বাড়ি।
	রথীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, পুরান বাড়ি।
আইন বিভাগ, বঙ্গীয় গভর্নমেণ্ট :	
স্পেশাল অফিসার	নরেশ চন্দ্র চাটার্জি, প্রসন্ন চাটার্জির বাড়ি।
আই-পি-এস :	
ডি, সি, কলিকাতা পুলিশ	অবনী মোহন গুপ্ত, কানাই গুপ্তের বাড়ি।
ইঞ্জিনিয়ারিং :	
(ক) আণ্ডার সেক্রেটারি	মধুসূদন সেন গুপ্ত, কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি।
(খ) জয়েণ্ট সেক্রেটারি, বঙ্গীয় গর্ভনমেণ্ট ও চিফ ইঞ্জিনিয়ার	শচীন্দ্র নাথ গুপ্ত, শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি।

চাকরি	নাম ও বাড়ি
(গ) সুপারিন্টেনডিং ইঞ্জিনিয়ার	মধুসূদন সেন গুপ্ত, কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি।
	শান্তিরঞ্জন সেন গুপ্ত, কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি।
	সুধীন্দ্র নাথ গুপ্ত, শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি।
ইণ্টারন্যাশনাল মনিটারি ফাণ্ড (ইউ এন) চিফ অব দি ডিভিজন (এশিয়া ডিপার্টমেণ্ট)	ডঃ অমিয় কুমার দাশ গুপ্ত, বকশী বাড়ি।
ইণ্ডিয়ান আর্মি ঃ	
(ক) ক্যাপটেন	দীপঙ্কর দাশ গুপ্ত, কবীন্দ্র বাড়ি।
	নীহার চন্দ্র দাশ গুপ্ত, দাশের বাড়ি, ছোট হিস্যা।
	রঞ্জিত কুমার সেন, রতন সেনের বাড়ি।
(খ) ব্রিগেডিয়ার	নিরঞ্জন সেন গুপ্ত, ভুটি বাড়ি।
(গ) মেজর	নীহার দাশ গুপ্ত, দাশের বাড়ি, ছোট হিস্যা।
ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স্ বিভাগ ঃ	
এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি	যোগেশ চন্দ্র সেন গুপ্ত, ভুটি বাড়ি।

চাকরি	নাম ও বাড়ি
ইণ্ডিয়ান ডিফেন্‌স্ সাইনস্ সার্ভিস্	ধীরেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত, তুহিসেনের বাড়ি।
	বিজন কুমার দাশ গুপ্ত, দাশ ঠাকুরের বাড়ি।
ইণ্ডিয়ান নেভি :	
মেডিক্যাল	ঝরণা সেন গুপ্ত, ভুটি বাড়ি।
ইণ্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস :	
আণ্ডার সেক্রেটারি, মিনিষ্ট্রী অব ফরেন এফেয়ারস	অজয় গুপ্ত, শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি।
ইণ্ডিয়ান মিলিটারি একাউণ্টস্ :	
ডেপুটি অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কনট্রোলার	রেবতী মোহন দাশ গুপ্ত, রামনাথ দাশের বাড়ি।
ইণ্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিস	দেবকুমাব গুপ্ত, শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি।
এগ্রিকালচরাল সার্ভিস :	
জয়েণ্ট ডিরেক্টর	ডক্টর কালিদাস সেন, তুহিসেনের বাড়ি।
ডেপুটি ডিরেক্টর	ডক্টর নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত, গোলার পাড়।
কাউনসিল বিভাগ, বঙ্গীয় গর্ভনমেণ্ট :	
এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি	অনাথবন্ধু চাটার্জি, প্রসন্ন চাটার্জির বাড়ি।

চাকরি	নাম ও বাড়ি
কাষ্টমস ঃ	
এসিষ্ট্যাণ্ট কলেক্টর	দিলীপ কুমার গুপ্ত, শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি।
কেমিক্যাল এনালিষ্ট (ইউ পি) ঃ	ডঃ বিরাজ মোহন গুপ্ত, শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি।
কো-অপারেটিভ	
চিফ অডিটর (বিহার গভর্ণমেণ্ট)	প্রফুল্ল চন্দ্র সেন, কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি।
ডেপুটি রেজিষ্ট্রার	তিমির হরণ সেন গুপ্ত, কালুপাড়া, দক্ষিণের বাড়ি।
জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া ঃ	
সিনিয়র কেমিষ্ট	ডক্টর রমেন্দ্র নাথ সেন শর্মা, পূব সেন পাড়া।
ডেভেলপমেণ্ট বিভাগ ঃ	
ডেপুটি সেক্রেটারি	হিমাংশু দাশ গুপ্ত, আলোক গুপ্তের বাড়ি।
পুলিশ বিভাগ ঃ	
(ক) এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার, কলিকাতা	অমিয় কুমার গুপ্ত, কানাই গুপ্তের বাড়ি।
(খ) ডি-এস-পি	ধ্রুব কুমার দাশ গুপ্ত, নাজির বাড়ি।
পোষ্টাল বিভাগ ঃ	
সুপারিণ্টেনডেণ্ট	দ্বারকা নাথ সেন, পুরান বাড়ি।

চাকরি	নাম ও বাড়ি
পোষ্টাল বিভাগ :	
স্থপারিণ্টেনডেণ্ট	দুর্গাপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত, দারোগা বাড়ি।
	নগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত (ক্যাপটেন্), দুহিসেনের বাড়ি।
বিচার বিভাগ :	
(ক) চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট	কল্যাণ কুমার দাশ গুপ্ত, বকশী বাড়ি।
(খ) ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্স জজ	কালীপ্রসন্ন পিপলাই, পিপলাই বাড়ি।
(গ) সাব-জজ	অশ্বিনী কুমার দাশ গুপ্ত, বকশী বাড়ি।
	চন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত, নরসিংহ দাশের বাড়ি।
(ঘ) স্মল কজ কোর্ট, জজ	বিপিন বিহারী দাশ গুপ্ত, দাশের বাড়ি, বড় হিস্যা।
ব্যাঙ্কিং :	
(ক) এজেণ্ট, ষ্টেট ব্যাঙ্ক	অরুণ কুমার গুপ্ত, শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি।
	পবিত্র কুমার গুপ্ত, শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি।
মিনিষ্ট্রী অব ইনফরমেশন অ্যাণ্ড ব্রডকাষ্টিং :	
ডেপুটি সেক্রেটারি	ফণীভূষণ গুপ্ত, গোলার পাড়।

চাকরি	নাম ও বাড়ি
মেডিক্যাল :	
(ক) চিফ মেডিক্যাল অফিসার	শান্তিরঞ্জন দাশ গুপ্ত, দাসের বাড়ি, চৌধুরী হিস্যা
(খ) ডিরেক্টর অব কার্ডিওলজি, শেঠ সুখলাল কার্নানি হাসপাতাল	ডক্টর যোগেশ চন্দ্র গুপ্ত, শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি।
(গ) টি বি অ্যাডভাইজার,	সুধীন সেন, সত্য সেনের বাড়ি।
(ঘ) সিভিল সার্জন	চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী, মধ্য গৈলা। জিতেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত, পূর্ব সেন পাড়া।
রেলওয়ে বিভাগ :	
(ক) একাউন্টস্ সার্ভিস	অরুণ চন্দ্র দাশ গুপ্ত, বকশী বাড়ি।
(খ) কমিশনার অব রেলওয়ে সেফটি	অমূল্য কুমার গুপ্ত, ছোট নয়া গুপ্তের বাড়ি।
(গ) চিফ অপারেটিং সুপারিন্টেনডেন্ট	অজিত কুমার গুপ্ত, ছোট নয়া গুপ্তের বাড়ি।
(ঘ) ডি টি-এস	জিতেন্দ্র নাথ দাশ গুপ্ত, দাশের বাড়ি, মেজ হিস্যা।
(ঙ) ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার	অশোক কুমার গুপ্ত, শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি।

চাকরি	নাম ও বাড়ি
(চ) সিকিউরিটি অফিসার	অমূল্য রতন গুপ্ত, কানাই গুপ্তের বাড়ি।
শাসন বিভাগ ঃ	
(ক) আণ্ডার সেক্রেটারি	শ্রীমন্ত দাশ গুপ্ত, বকশী বাড়ি।
(খ) ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট	ললিত চন্দ্র দাশ গুপ্ত, নরসিংহ দাশের বাড়ি।
	শ্রীনাথ গুপ্ত, গোলাব পাড়।
(গ) ডেপুটি সেক্রেটারি, শ্রম বিভাগ, বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট	অনিল চন্দ্র ভট্টাচার্য, ভবেন্দ্র ভট্টাচার্যের বাড়ি।
(ঘ) সেটেলমেণ্ট অফিসার	সত্যেন্দ্র নাথ দাশ গুপ্ত, দাশের বাড়ি, মেজ হিস্যা।
শিক্ষা বিভাগ ঃ	
(ক) অধ্যাপক	মাখনলাল দাশ গুপ্ত, যুগল দাশের বাড়ি।
	শ্রীশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত, কবীন্দ্র বাড়ি।
	ডঃ সুরেশ চন্দ্র সেন গুপ্ত, রতন সেনের বাড়ি।
(খ) ইনস্‌পেক্টর অব টেকনিক্যাল এডুকেশন	অতুল চন্দ্র সেন, কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি।
(গ) ইনস্‌পেক্টর অব স্কুলস্‌	অশ্বিনী কুমার দাশ গুপ্ত, দাশের বাড়ি, ছোট হিস্যা।

চাকরি	নাম ও বাড়ি
ইনস্পেক্টর অব স্কুলস্	বিশ্বেশ্বর সেন, কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি।
	মতিলাল দাশ, দাশের বাড়ি, মেজ হিস্যা।
(ঘ) প্রিন্সিপাল ঃ সংস্কৃত কলেজ	ডঃ সুরেন্দ্র নাথ দাশ গুপ্ত, কবীন্দ্র বাড়ি।
বেথুন কলেজ	তটিনী গুপ্ত (দাস), (শঙ্কর গুপ্তের বাড়ির কন্যা)।
(ঙ) হেডমাষ্টার	শ্যামাচরণ গুপ্ত, শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি।
	জ্যোতিভূষণ গুপ্ত, গোলার পাড়। প্রভৃতি
শিপিং করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া ঃ মেরিন ইঞ্জিনিয়ার	শ্যামল কুমার গুপ্ত, চৌধুরী বাড়ি।
সার্ভে অব ইণ্ডিয়া ঃ সুপারিনটেণ্ডিং সার্ভেয়র	সুরেশ চন্দ্র চাটার্জি, প্রসন্ন চাটার্জির বাড়ি।
স্বায়ত্ব-শাসন বিভাগ ঃ বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট,রেজিষ্ট্রার	রেবতী মোহন দাশ গুপ্ত, কেরানী বাড়ি।

পরিশিষ্ট (২)

বেসরকারী চাকরি (বর্ণানুক্রমে)

চাকরি	নাম ও বাড়ি
ইঞ্জিনিয়ার :	
	রেবতী মোহন গুপ্ত, শঙ্খ গুপ্তের বাড়ি।
	পবেশ নাথ সেন, কালুপাড়া, উত্তরেব বাড়ি। প্রভৃতি
ইনসিউর‍্যান্স :	
ব্রাঞ্চ ম্যানেজাব, ওরিযেণ্টাল	বিপিন বিহারী দাশ গুপ্ত, নবসিংহ দাশের বাড়ি।
কলিয়াবি ম্যানেজার	প্রমোদ চন্দ্র গুপ্ত, শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি।
চিফ কেমিষ্ট :	
(ক) ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প	ডঃ দীনেশ চন্দ্র তপাদাব, তপাদার বাড়ি, ফুল্লশ্রী।
(খ) জেনসন ও নিকলসন	নিখিল কুমার গুপ্ত, চৌধুরী বাড়ি।
(গ) ন্যাশন্যাল টুবাকো	গোপাল চন্দ্র দাশ গুপ্ত, দাশের বাড়ি, ছোট হিস্যা।
জুট টেকনোলজিষ্ট	দেব প্রসাদ সেন গুপ্ত, কালুপাড়া, দক্ষিণের বাড়ি।

চাকরি	নাম ও বাড়ি
টেকনিক্যাল এডভাইজার :	
বার্ড এণ্ড কোং	কুমুদ বিহারী সেন, কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি।
টিটাগড় পেপার মিলস	ডঃ বিশ্বনাথ সেন, কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি।
ডিরেক্টর :	
টাটা অ্যাণ্ড কোং	নলিন বিহারী সেন, কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি।
ডেয়ারি বিশেষজ্ঞ :	
পলসন অ্যাণ্ড কোং	কেশব চন্দ্র সেন গুপ্ত, কালুপাড়া, দক্ষিণের বাড়ি।
দেওয়ান, বামড়া ষ্টেট	যোগেশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত, মুনশী বাড়ি।
পুলিশ চিফ, ত্রিপুরা রাজ্য	অক্ষয়কুমার গুপ্ত, ছোট নয়া গুপ্তের বাড়ি।
ব্যাঙ্কিং :	
এজেণ্ট, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক	বিজন বিহারী সেন, কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি।
ম্যানেজার :	
গ্যানন ডাঙ্কারলি অ্যাণ্ড কোং	মিহির কুমার দাশ গুপ্ত, দাশের বাড়ি, ছোট হিস্যা।
শিক্ষা বিভাগ :	
এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক	বেণীমাধব সিমলাই, সিমলাই বাড়ি।

চাকরি	নাম ও বাড়ি
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় :	
অধ্যাপক	মনোরঞ্জন গুপ্ত, শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি।
জর্জ ফিফথ্ অধ্যাপক (দর্শন শাস্ত্র)	ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত, কবীন্দ্র বাড়ি।
লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় :	
অধ্যাপক (দর্শন বিভাগ)	ডঃ সুরমা দাশ গুপ্ত, কবীন্দ্র বাড়ি।
বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় :	
অধ্যক্ষ, অর্নীতি বিভাগ	ড৹ অমিয় কুমার দাশ গুপ্ত, বকশী বাড়ি।
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় :	
অধ্যাপক	পরেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, ভরদ্বাজ বাড়ি।
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় :	
রিডার, ফিজিকস	ডঃ বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, পশ্চিমের বাড়ি।
প্রিন্সিপ্যাল :	
ঋষি বঙ্কিম কলেজ	ডঃ সুধীর রঞ্জন দাশ গুপ্ত , দাশের বাড়ি, চৌধুরী হিস্যা।
ক্যানিং টাউন কলেজ	পবিত্র কুমার দাশ গুপ্ত, দাশের বাড়ি, ছোট হিস্যা।
কুচবিহার কলেজ	শরৎচন্দ্র গুপ্ত, শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি।

চাকরি	নাম ও বাড়ি
প্রিন্সিপ্যাল ঃ	
বিদ্যান্ত কলেজ, লক্ষ্ণৌ	লীলা দাশ গুপ্ত (বিদ্যান্ত), দাশেব বাড়ি, ছোট হিস্যা।
বেওযা ষ্টেট কলেজ	ডঃ জযন্তকুমাব দাশ গুপ্ত, দাশেব বাড়ি, ছোট হিস্যা।
হেড মাষ্টার	কৈলাসচন্দ্র সেন, মজুমদাব বাড়ি।
	ক্ষিতীশচন্দ্র সোমদ্দাব, সিহিপাশা।
	জযন্তকুমাব দাশ গুপ্ত, দাসেব বাড়ি, চৌধুবী হিস্যা।
	বাজকুমাব সেন, তুহিসেনের বাড়ি।
	বামচন্দ্র চক্রবর্তী, পূব গৈলা।
	লক্ষ্মীচবণ দাশ গুপ্ত, দাশেব বাড়ি, মেজ হিস্যা।
	প্রভৃতি
সিনিয়র একজিকিউটিভ ঃ	
বার্ড অ্যাণ্ড কোং	নাবায়ণ প্রসাদ দাশ গুপ্ত, দাসের বাড়ি, বড হিস্যা।

পরিশিষ্ট (৩)

যাঁহারা ভারতের বাহিরে চাকরি করেন ঃ

নাম	বাড়ি
ডঃ অজিতকুমার দাশ গুপ্ত (কানাডা)	দাশের বাড়ি, ছোট হিস্যা।
ডঃ অশ্রুকুমার দাশ গুপ্ত (আমেরিকা)	মুনশী বাড়ি।
ডঃ জয়গোপাল সেন গুপ্ত (আমেরিকা)	দুহিসেনের বাড়ি।
প্রণব সেন (জার্মানি)	কানুপাড়া, উকুরের বাড়ি।

পরিশিষ্ট (৪)

স্বাধীন ব্যবসায়ী (বর্ণানুক্রমে)

উকীল

নাম	বাড়ি
অনিল কুমার দাশ গুপ্ত	নরসিংহ দাশের বাড়ি।
গোপাল গোবিন্দ গুপ্ত	কানাই গুপ্তের বাড়ি।
দুর্গাপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত	দাশের বাড়ি, ছোট হিস্যা
ভুবন মোহন গুপ্ত	গোলার পাড়।

নাম	বাড়ি
যতীন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত	সত্যসেনের বাড়ি।
রজনীকান্ত দাশ	বকশী বাড়ি।
শ্যামাচরণ সিমলাই	সিমলাই বাড়ি।
	প্রভৃতি

ডাক্তার

নাম	বাড়ি
নগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য	ভবেন্দ্র ভট্টাচার্যের বাড়ি।
সুরেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত	কালুপাড়া, দক্ষিণের বাড়ি
সুশীল কুমার দাশ গুপ্ত,	কবিরাজ বাড়ি।
	প্রভৃতি

ব্যারিষ্টার, কলিকাতা হাইকোর্ট।

নাম	বাড়ি
ভোলানাথ সেন	কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি

ব্যবসায়ী

নাম ও বাড়ি	ব্যবসায়
গোপালচন্দ্র গুপ্ত, গোলার পাড়	রং
দীনেশ চন্দ্র সেন গুপ্ত, কালুপাড়া, দক্ষিণের বাড়ি	একাধিক চাউলের কলের মালিক

নাম ও বাড়ি	ব্যবসায়
দেবীপ্রসন্ন গুপ্ত, পূব সেন পাড়া	চশমা
ননীগোপাল ভট্টাচার্য, বিধু বঙ্গবাসের বাড়ি	ঔষধ , সিনেমার মালিক
পার্ব্বতীচরণ দত্ত, দীঘির পাড়	চাউল
প্রভারঞ্জন দাশ গুপ্ত, মুনশী বাড়ি	কণ্ট্রাক্টর
বাদল দাশ গুপ্ত, দাশের বাড়ি, বড় হিস্যা	ব্যবসা
মতিলাল সেন ও হীরালাল সেন, ফুল্লশ্রী	ব্যবসা
মথুরানাথ দাস, দক্ষিণ গৈলা	ফটো , সিনেমার মালিক
রসিকচন্দ্র দাশ গুপ্ত, যুগল দাশের বাড়ি	কণ্ট্রাক্টর
ডঃ সুনীলবিহারী সেন গুপ্ত,	ঔষধ প্রস্তুত
কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি	ব্যবসা
সুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত, কবিরাজ বাড়ি	ব্যবসা
হরিশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, রাজমোহন দাশের বাড়ি	স্পোর্টিং গুডস

পরিশিষ্ট (৫)

সরকারী উপাধি প্রাপ্তদের বর্ণানুক্রমিক তালিকা।

উপাধি	নাম ও বাড়ি
বি-ই-এম	ধীরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, দুহিসেনের বাড়ি।
রায় বাহাদুর	কালীপ্রসন্ন পিপলাই, পিপলাই বাড়ি।
	চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী, মধ্য গৈলা।

উপাধি	নাম ও বাড়ি
রায় বাহাদুর	বিপিনবিহারী দাশ গুপ্ত, দাশের বাড়ি, বড় হিস্যা।
	রেবতীকান্ত দাশ গুপ্ত, কেরানী বাড়ি।
	শ্যামাচরণ সিমলাই, সিমলাই বাড়ি।
	শ্রীমন্ত দাশ গুপ্ত, বকশী বাড়ি।
রায় সাহেব	অক্ষয়কুমার গুপ্ত, ছোট নয়া গুপ্তের বাড়ি।
	অক্ষয়কুমার সেন গুপ্ত, কালুপাড়া উত্তরের বাড়ি।
	অবনীমোহন গুপ্ত, কানাই গুপ্তের বাড়ি।
	অশ্বিনীকুমার দাশ গুপ্ত, দাশের বাড়ি, ছোট হিস্যা।
	ললিতমোহন গাঙ্গুলী, যমদ্বারের পাড়।
সি-আই-ই	ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত, কবীন্দ্র বাড়ি।

রাজনৈতিক আন্দোলন

ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারেব সঙ্গে সঙ্গে দেশে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হয় এবং উহার ফলে নানাপ্রকার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই সব আন্দোলনের ঢেউ গ্রামেও আসিয়া পৌছে। গ্রামের বহু লোক কংগ্রেসের স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে যোগদান করেন। কেহ কেহ (ইহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প) বিভিন্ন বৈপ্লবিক দলের সহিত যুক্ত হন। পরবর্তীকালে অনেকে সাম্যবাদেও দীক্ষিত হন। গতি প্রকৃতির দিক দিয়া গ্রামের রাজনৈতিক আন্দোলনকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়—স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন এবং পরবর্তীকালের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা। প্রথমে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হইল।

স্বদেশী ও বয়কট যুগ

পূর্বে সমগ্র বঙ্গদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়া একটি বড় প্রদেশ ছিল। ইহাকেই বঙ্গদেশ বলা হইত। পাশ্চাত্য শিক্ষায় বাঙালীরা অধিকতর অগ্রসর হইয়াছিল এবং জাতীয়তাবাদও তাহাদের মধ্যে বেশি প্রবেশ করিয়াছিল। তাহাদের এই প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি খর্ব করার উদ্দেশ্যে তদানীন্তন বড় লাট লর্ড কার্জন বঙ্গদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সমগ্র পূর্ববঙ্গ (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগ) আসাম প্রদেশের

সহিত জুড়িয়া নূতন প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব করেন। ইহাতে তাদের সংহতি ও স্বকীয়তা নষ্ট হইবে বলিয়া সমস্ত বাঙালী জাতিই ইহার বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি করে। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এই সকল আপত্তিতে কর্ণপাত না করিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবে অবিচল থাকে। ইহার প্রতিবাদে ১৯০৫ সনের ৭ই আগষ্ট কলিকাতা টাউন হলে বিরাট এক সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয় যে বিলাতী কাপড়, চিনি, লবন ও বিলাসিতার দ্রব্য প্রভৃতি একেবারে এবং অন্যান্য জিনিষ যথাসম্ভব বর্জন করা হইবে (boycott) ও তৎপরিবর্তে ভারতে প্রস্তুত ঐ সব জিনিষ (যদিও অনেক খারাপ এবং দামও বেশি) ব্যবহার করা হইবে। ইহাকেই স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন বলা হয়।

এই আন্দোলনের ঢেউ গ্রামেও আসিয়া পৌছিয়াছিল। ঐ সময়ে গ্রামের যুবকগণ দাশের বাড়ির চৌধুরী হিস্যাব সীতানাথ দাশগুপ্ত (শীতলবাবু—ইনি তখন গৈলা স্কুলের শিক্ষক ছিলেন), ছোট হিস্যার বিমলাচরণ দাশ গুপ্ত ও কালুপাড়ার মথুরানাথ সেনের নেতৃত্বে প্রবল আন্দোলন গড়িয়া তোলে এবং কলিকাতার ও বরিশাল শহরের দৃষ্টান্তে বাজারে পিকেটিং অর্থাৎ বিলাতী জিনিষ লোকে যাহাতে না কেনে সে জন্য দোকানে দোকানে উপস্থিত হইয়া ক্রেতাদের ঐ সব জিনিষ কিনিতে নিষেধ করিতে থাকে। ৺পূজার ছুটি উপলক্ষে কলেজের ছাত্রগণও বাড়ি আসিয়া এই আন্দোলনে সর্বান্তঃকরণে যোগ দেয়। এ দিকে গর্ভনমেণ্ট ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর (বাংলা ৩০শে আশ্বিন, ১৩১২) বঙ্গভঙ্গের দিন ধার্য্য করে। কলিকাতার নেতৃবৃন্দের পরামর্শ অনুসারে ঐ দিন সমস্ত বাঙালী জাতিই অনশন করে ও কোনও গৃহে রন্ধন হয় না এবং সকলে প্রাতঃস্নান করিয়া প্রত্যেকেই অপর সকলের হস্তে ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন স্বরূপ রাখী (অর্থাৎ লালমিশ্রিত হলদে রং-এর সূতা ও ঐ রূপ সূতার বা রেশমের ফুল) বাঁধিয়া দেন। গ্রামের সর্ব শ্রেণীর লোকদের মধ্যেই এই

রাখী বন্ধনও অনশন প্রতিপালিত হইয়াছিল। বৈকালে দাশের বাড়ির দরজার স্কুলগৃহে বিরাট এক সভা হয় ও সকলে দেশী জিনিষ ব্যবহাব করিতে ও বিলাতী জিনিষ বর্জন করিতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন।

ক্রমশঃ এই আন্দোলন উপলক্ষে অনেক সভা হয়। বড় বড সভা স্কুল গৃহে ও ছোট ছোট সভা পাডায় পাড়ায় হইত। এইরূপ একটি বড সভায় অশ্বিনী কুমার দত্ত ববিশাল হইতে আসিয়াছিলেন ও বরিশালের 'স্বদেশ বান্ধব সমিতির' এক শাখা এখানে খোলা হইয়াছিল। একবার বিখ্যাত নেতা বিপিন পাল গ্রামে আসিয়া স্কুল গৃহে সভা করিয়াছিলেন। শোলকের স্বরেন মজুমদার নরসিংহ দাশের বাডিব দরজায় এক সভা করিয়াছিলেন। সাধাবণত স্কুল গৃহ হইতে প্রোসেসন বাহিব হইয়া ফুল্লশ্রীর দিকে বা বকশী বাডিব দিকে যাইত।

এই সব প্রোসেসনে স্বদেশী গান, যথা অশ্বিনী কুমার দত্তের—

'অগ্নিময়ী মা গো আজি ডাকি সকলে মা

বিরাট ভীষণ দৈত্য বংশ
এই আগুনে মা করব ধ্বংস
পাষণ্ড অসুর হীন নৃশংস
ধরায় রাখিবো না।
মা মা মা'

গান এবং বরিশাল কনফাবেন্স ভাঙ্গাব পরে কালী প্রসন্ন কাব্য বিশারদের—

'যায় যাবে জীবন চলে, বন্দে মাতরম্ বলে,

*　　*　　*

বেত মেরে কি মা ভুলাবে, আমি কি মায়ের সেই ছেলে,
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি পাশব বলে দিক্ জেলে,

(আমরা) ধন্য হব মায়ের জন্য লাঞ্ছনাদি সহিলে,

*　　*　　*

(ওদের) বেত্রাঘাতে কারাগারে ফাঁসি কাঠে ঝুলিলে ।'

ও রজনী কান্ত সেনের—

'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড মাথায় তুলে নেরে ভাই,
দীন দুঃখিনী মা যে তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই ।'

প্রভৃতি গান গাওয়া হইত এবং মুহুর্মুহুঃ 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করা হইত। গ্রামের বাহিরে মুসলমান পল্লী সেরালে একবার এই প্রোসেসন নিয়া সেখানকার 'সন্নামত বাড়ি'তে সভা হইয়াছিল ও আর একবার কয়েক মাইল দূরবর্তী নমশূদ্র পল্লী সোমাইর পাড় গ্রামে প্রোসেসন নিয়া গিয়া সভা হইয়াছিল। একবার এই রূপ এক সভায় যোগদানের জন্য গৈলা স্কুলের তদানীন্তন অস্থায়ী হেডমাষ্টার নিশিকান্ত চক্রবর্তী স্থানীয় কয়েক জন যুবককে নিয়া পালরদি গিয়াছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে নরসিংহ দাশের বাড়ির বিপিন বিহারী দাশ গুপ্ত ময়মনসিংহ এডওয়ার্ড স্কুলের হেড মাষ্টারের পদ ত্যাগ করিয়া দেশে আসিলে কালুপাড়া সেনের বাড়ির দরজার মাঠে তাঁহাকে অভ্যর্থনার জন্য বিরাট সভা হয়। তাঁহাকে তাঁহার নিজ বাড়ি হইতে প্রোসেসন করিয়া নিয়া আসা হইয়াছিল। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন তর্কবাগীশের বাড়ির রামচরণ শিরোরত্ন। কলিকাতায় জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি কিছুদিন তাহার হেডমাষ্টারের কার্য করেন। বিপিনবাবু 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার ও অরবিন্দ ঘোষের সহিত কিছুকাল যুক্ত ছিলেন।

এই সময় গৈলা স্কুলের এসিষ্ট্যান্ট হেডমাষ্টার ফরিদপুর জিলা নিবাসী যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্কুলের চাকরি ছাড়িয়া ব্যবসা করিতে চলিয়া যান। এই সব দৃষ্টান্তে ও আন্দোলনে গ্রামে স্বদেশী মনোভাব যেমন বৃদ্ধি পায় তেমন পিকেটিং-এর জন্য বিলাতী বর্জনও

প্রবল ভাবে চলিতে থাকে। এই সব ব্যাপারে গ্রামের ছেলে ও যুবকদের অনেকেই অংশ গ্রহণ করে। তন্মধ্যে বিশেষ ভাবে নাম করিতে হয় নয়দাশের বাড়ির নেপাল চন্দ্র দাশ গুপ্তের ও কালুপাড়ার দক্ষিণের বাড়ির রাম সেনের। তাঁহারা এ জন্য গভর্ণমেণ্টের কোপে পড়িয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে পিকেটিং বন্ধ করার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু তৎসত্বেও আন্দোলনেব তীব্রতা হ্রাস পায় নাই। সমগ্র ভাবে আন্দোলন খুবই সফল হইয়াছিল এবং বিলাতী কাপড়, লবন, চিনি প্রভৃতির কেনা বেচা একরকম বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

কলিকাতার 'ফেডারেশন হল' (Federation Hall) তৈয়ারীর জন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া চাঁদা আদায় করিয়া কলিকাতা পাঠান হইয়াছিল। এই সময় এক বার কলিকাতাব 'ডন সোসাইটির' (Dawn Society) বিখ্যাত সতীশ মুখোপাধ্যায় গৈলা আসিয়াছিলেন এবং দুই একদিন থাকিয়া গ্রামের সকলের প্রাণে স্বদেশীর প্রেরণা জাগাইয়াছিলেন। তিনি তখন কালুপাড়া সেনেব উত্তরের বাড়িতে অবস্থান করিতেন।

এই আন্দোলন উপযুক্ত ভাবে পরিচালনার জন্য গ্রামের নেতৃবৃন্দের সহিত যোগাযোগ রক্ষা কবিতেন কলিকাতা হইতে ললিত মোহন দাস (নিমদাশের বাড়ি) ও বরিশালের 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি'। এই সমিতিই সমগ্র বরিশাল জিলার স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব নিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমার দত্ত ছিলেন ইহার সভাপতি ও ইহার প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল বরিশাল শহর। শশিকান্ত গুপ্ত (শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি) ইহার সহ-সম্পাদক ছিলেন। ১৯০৬ সালের প্রসিদ্ধ বরিশাল কনফারেন্সেরও তিনি (শশিকান্ত) সহ-সম্পাদক ছিলেন।

এই কনফারেন্স উপলক্ষেই বাংলা দেশে প্রথমে গভর্ণমেণ্টের আইন প্রকাশ্যে অমান্য করা হয়। ঐ সময়ে বরিশাল শহরে রাস্তায় 'বন্দে মাতরম্' বলা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের প্রতিনিধিদের আগ্রহানুসারে 'রাজা বাহাদুরের হাউলী' হইতে 'বন্দে

মাতরম্' ধ্বনি করিতে করিতে রাস্তা দিয়া কনফারেন্স প্যাণ্ডেলের দিকে সকলে রওনা হইলে পুলিস রেগুলেসন লাঠি (বাঁশের ৪ হাত লম্বা লাঠি) দ্বারা তাহাদিগকে গুরুতর ভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করে। অনেকেই আহত হন ও একজনের মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া যায়। আরও অনেকে আঘাতে রক্তাক্ত কলেবর হ'ন। কিন্তু 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি কিছুতেই বন্ধ হয় নাই। পরে পুলিস সুপারিণ্টেনডেণ্ট সভা প্যাণ্ডেলে আসিয়া রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করেন ও সভা ভাঙ্গিয়া দেন ও সুরেন্দ্রনাথকে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠিতে নিয়া যান। সেখানে সরাসরি (summary) বিচারে তাঁহার ৪০০৲ জরিমানা হয়। এই ঘটনায় সকল লোক ক্ষুব্ধ ও স্তম্ভিত হয় এবং স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের বেগ আরও তীব্র হয়।

কলিকাতার সিটি কলেজের তৎকালীন অধ্যাপক ললিতমোহন দাস (নিমদাশের বাড়ি) গৈলার নেতাদের সহিত পত্রযোগে আলাপ আলোচনা করিতেন ও আবশ্যক পরামর্শ দিতেন। যখন ছুটির সময় বাড়ি আসিতেন তখন সভাসমিতি ও প্রোসেসনে যোগ দিতেন। কলেজে পাঠ্যাবস্থায় তিনি কংগ্রেসের অধিবেশনে ভলাণ্টিয়ারের কাজ করিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইলে তিনি সর্বান্তঃকরণে ইহাতে যোগ দেন। কুখ্যাত রিজলি সার্কুলার অমান্য করিয়া তিনি এই বয়কট আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেন। এই সব কারণে তাঁহার উপস্থিতি গ্রামে যুবকদের মনে উৎসাহ সঞ্চার করিত। রিজলি সার্কুলার অমান্য করার জন্য তিনি গভর্ণমেণ্টের বিরাগ ভাজন হ'ন। গৈলায় স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে তিনি যে সব চিঠি পত্রাদি লিখিয়াছিলেন তাহা গভর্ণমেণ্টের হাতে পড়ায় ললিতমোহন গভর্ণমেণ্টের আরও বিষদৃষ্টিতে পড়েন। তিনি অধ্যাপক থাকিলে পাছে গভর্ণমেণ্ট হইতে কলেজের কোনও ক্ষতি হয় এই জন্য তিনি কলেজের অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মী। সুরেন্দ্রনাথ

বন্দোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি 'নরম পন্থী' নেতাদের সহিত একত্রে কাজ করিতেন।

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে নৈতিক ও কৃষ্টিমূলক বহু ছোট ছোট সভা ও সমিতি পাড়ায় পাড়ায় স্থাপিত হইয়াছিল। এই সময়ে শরীর চর্চার দিকেও লোকেব দৃষ্টি পড়ে এবং লাঠি খেলা, মুগুর ভাজা, গুলি বাঁশ ছোড়া প্রভৃতি অভ্যাস করা হইত। ছেলেরা অধিকাংশই ইহাতে যোগ দিত এবং বয়স্কেরা ও তাহাতে উৎসাহ দিতেন। লাঠি খেলায় বিশেষ ওস্তাদ ছিলেন দীঘিব পাড়েব বিমলা দাশ গুপ্ত (ফুরকুৎ)। তাঁহার শিষ্যদের প্রধান ছিল 'গণের ভিটাব' অবিনাশচন্দ্র সেন (ছোট খঙ্গু)। সে সময়ে গ্রামে শারীরিক শক্তিব আদর্শ ছিল দাশের বাড়ির হেমন্ত দাশ, অক্ষয দাশ, আশু দাশ, আলোক গুপ্তেব বাড়ির মুকুন্দ দাশ ও পূব সেন পাডার শবৎ সেন।

এক কথায় বলিতেগেলে দেশেব অন্যান্য অংশের ন্যায় গৈলার লোকও স্বদেশী আন্দোলনে যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিল ও সামগ্রিক ভাবে গ্রামে নূতন চেতনা সঞ্চার হইযাছিল এবং বিভিন্ন প্রকারে ইহার প্রকাশ হইতে আরম্ভ কবিয়াছিল।

সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সমগ্র দেশে ও কংগ্রেসে প্রবল আন্দোলনের ফলে গভর্ণমেণ্ট ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ কবিতে বাধ্য হইয়াছিল।

অন্যবিধ রাজনৈতিক প্রচেষ্টা

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেই কলিকাতায় মানিকতলাতে বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হয় ও অরবিন্দ ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতির বিরুদ্ধে 'আলিপুর বোমার মামলা' রুজু হয়। গ্রামের কালীকান্ত ঠাকুরের পুত্র চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী এ ব্যাপারে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন কিন্তু তিনি

আত্মগোপন করেন। পুলিস বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার খোঁজ না পাওয়ায় তাহাকে ধরিয়া দিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট ৫০০৲ পুরস্কার ঘোষণা কবেন, কিন্তু তিনি আমেরিকা পলাইয়া যান। পরে সেখানকার 'গদর' পার্টিতে যোগ দেন এবং পার্টির নেতা হরদয়ালের পর তিনিই ঐ দলের নেতৃত্ব করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টেব বিরুদ্ধে আমেরিকায় কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য তিনি জার্মান গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অনেক অর্থ সাহায্য পান এবং ঐ অর্থ দ্বারা নানাবিধ ইংরেজ বিরোধী কার্যে লিপ্ত হ'ন। পরে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্ররোচনায় আমেরিকার গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ইণ্ডো-জার্মান ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার মূল আসামী বলিয়া অভিযুক্ত করে। মোকদ্দমাকালে তিনি স্বীকারোক্তি করেন ও লঘুশাস্তি পান। *

আলিপুর বোমার মামলার পরে দেশে বিপ্লব ও সন্ত্রাসবাদের ভাব ধারা ছড়াইয়া পড়ে। গ্রামের ক্ষীরোদ চন্দ্র দাশ গুপ্ত (রামমোহন দাশের বাড়ি) প্রভৃতি ইহাতে আকৃষ্ট হন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পুলিসের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন। রতন সেনের বাড়ির সুরেশ চন্দ্র সেন গুপ্ত (পরে ডি-এস-সি) ও তাঁহাব ভ্রাতা ক্ষিতীশ চন্দ্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে অন্তরীন হ'ন।

হরিপদ ভট্টাচার্য (বামাচরণ ভট্টাচার্যের বাড়ি) গ্রামে চরকা প্রচলনের জন্য আন্দোলন করিয়াছিলেন এবং ইহার জন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক প্রবর্তিত চবকা আন্দোলনের কয়েক বৎসর পূর্বেই তিনি এই আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে তখন কেহ সাড়া দেয় নাই।

* চন্দ্রকান্তের আমেরিকার কার্যকলাপের বিবরণের জন্য আমরা ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার প্রণীত 'স্বাধীনতার ইতিহাসের' নিকট ঋণী।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের কিছুকাল পরে কলিকাতা হইতে বিপিন চন্দ্র পাল ও শোলকের সুরেন মজুমদার একবার গৈলা আসেন। তাঁহারা নবসিংহদাশের বাড়ির প্রাঙ্গণে এক সভা করিয়াছিলেন ও এ বিষয়ের বর্ণনা করিয়া লোকের মনে অদ্ভুত সাড়া জাগাইয়াছিলেন।

পরে মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে বরিশালে দ্বিতীয় বার কনফারেন্স হয়। উহার যুগ্ম সম্পাদকের অন্যতম ছিলেন শঙ্কর গুপ্তের বাড়ির শশিকান্ত গুপ্ত। ললিত মোহন দাস বরাবরই কংগ্রেস সেবী ছিলেন এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি যোগ দেন এবং কারাবরণ করেন। শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি রাজনীতির সহিত যুক্ত ছিলেন।

গ্রামে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইলে পুরাতন বিপ্লবীরা ও নূতন অনেকে উহাতে যোগ দেন। এই আন্দোলনে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন চিন্তাহরণ গুপ্ত (গোলার পাড), সুধীর চন্দ্র সেন (দুহিসেনের বাড়ি), কেশব চন্দ্র সেন (পূব সেন পাড়া) ও তাঁহার ভগিনী (নবদাশের বাড়ির স্বদেশী যুগের ও ১৯০৬ সালের দুর্ভিক্ষের সময়ের নিষ্ঠাবান কর্মী নেপালচন্দ্র দাশ গুপ্তের ভ্রাতৃবধূ) চারুশীলা দাশ গুপ্ত। সে সময় একটি ভদ্র ঘরের বধূর পক্ষে ইহা খুবই দুঃসাহসিক কাজ ছিল।

বৈপ্লবিক ভাবধারার প্রসার

ইহার কিছু পরে 'দরিদ্র বান্ধব সমিতি' ও 'গৈলা ফুল্লশ্রী যুবক সমিতি' নামে দুইটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক ও বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচার। গ্রামে সাক্ষাৎ ভাবে জন সেবার কাজ করিত 'দরিদ্র বান্ধব সমিতি'। ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল যাহারা নির্বান্ধব অবস্থায় রাস্তায় বা নৌকায় যাতায়াতের সময় পীড়িত

হইয়া পড়ে তাহাদের সেবা করা। 'গৈলা ফুল্লশ্রী যুবক সমিতি' গৈলা-স্কুলের একটি উদ্বৃত্ত ঘরে নিজেদের অফিস করিয়াছিল এবং নানা রকম দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক কাগজ সেখানে আসিত। অনেক লোক ঐ ঘরে একত্র হইতেন ও পড়াশুনা করিতেন। উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান দুইটির প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সুধীর চন্দ্র সেন, সতীশ দে, অতুল চন্দ্র দাশ গুপ্ত (গণ্ডি) (দাশের বাড়ি, মেজ হিস্যা), সুশীল সেন, তারকেশ্বর সেন (কালুপাড়া) ও হরিপদ ভট্টাচার্য (বিধু বঙ্গবাসের বাড়ি)। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ ৩।৪ বৎসর চলে, পরে সুধীরচন্দ্র সেন ও কালুপাড়ার তারকেশ্বর সেনের নেতৃত্বে 'গৈলা সেবাশ্রম' গড়িয়া উঠে। ইহার তত্ত্বাবধানে নৈশ বিদ্যালয়, পাঠাগার, প্রভৃতি কৃষ্টিমূলক কাজকর্ম ও ব্যায়ামগার প্রভৃতি চলিতে থাকে, কিন্তু ইহাদের প্রধান দৃষ্টি ছিল রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার ও বৈপ্লবিক ভাবধারার প্রবর্তন ও ঐ উদ্দেশ্যে যুবশক্তির সংগঠনের দিকে। গ্রামের মুসলমান যুবকগণও এই সেবাশ্রমে যোগদান করিয়াছিলেন এবং এখনও তাঁহারা ঐ আশ্রম চালাইতেছেন। আশ্রমের প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গটি এখনও সেখানে বিরাজ করিতেছে। পরে তারকেশ্বর অন্তরীন হন ও হিজলি ক্যাম্পে বন্দী থাকা কালে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। সেই স্থান আজিও মর্মর ফলকে চিহ্নিত হইয়া আছে। ইহা এখন Indian Institute of Technology, Kharagpur-এর অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার প্রধান কর্মস্থান সেবাশ্রমের নিকটেই তাঁহার স্মরণার্থ স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে। এই স্মৃতিচিহ্ন নির্মাণে ও সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠায় সুরেন্দ্র নাথ গুপ্তের (গোলার পাড) সহায়তা ছিল। কলিকাতা কেওড়াতলা শ্মশানেও তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে ও তাঁহার উপরে খোদিত হইয়াছে :

"শহীদ তারকেশ্বর সেন গুপ্ত
জন্ম—গৈলা (বরিশাল)
১৫ই এপ্রিল, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ।

মৃত্যু—হিজলী বন্দী শিবির
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ।

হিজলী বন্দী শিবিরে ইংরেজ শাসকের গুলিবর্ষণে দেশের মুক্তি যজ্ঞে তোমাদের শৌর্যময় আত্মাহুতি শ্রদ্ধানত অন্তরে স্মরণ করি।

তোমাদের গুণমুগ্ধ
স্বদেশবাসিগণ”

গৈলা ফুল্লশ্রী যুবক সমিতির বরিশালে ও কলিকাতায় শাখা ছিল। বরিশাল শাখার প্রধান ছিলেন ইন্দু ভূষণ দাশ গুপ্ত (বকশী বাড়ি), কুঞ্জবিহারী দাস (দক্ষিণ গৈলা) ও হিমাংশু গুপ্ত। কলিকাতা শাখার নেতৃস্থানীয় ছিলেন নিমদাশের বাড়ির মনোমোহন দাশ গুপ্ত (কার্ত্তিক), বিভূতি গুপ্ত ও সতীশ দে প্রভৃতি।

মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইলে এই সমস্ত যুবক ও নূতন অনেকে তাহাতে যোগ দেন এবং সেই আন্দোলন বন্ধ হইয়া গেলে পুনরায় সন্ত্রাসবাদের দিকে ঝুকিয়া পড়েন। গৈলার পূব সেনপাড়ার সত্যেন্দ্র নাথ সেন, মুকুল চন্দ্র সেন প্রভৃতি বিপ্লবী ছিলেন এবং নিজেদের নির্দিষ্ট পথ ধরিয়া চলিয়াছিলেন।

বরিশাল শহরে নরসিংহ দাশের বাড়ির অমিয় কুমার দাশ গুপ্ত সমগ্র বঙ্গ দেশের ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা ছিলেন ও বরিশাল জিলার কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারি ছিলেন। বকশী বাড়ির জ্যোতি দাশ গুপ্ত ছিলেন কম্যুনিষ্ট পার্টির অন্যতম সেক্রেটারি। তাঁহারা অনেক নূতন যুবককে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন।

সেবাশ্রমের কর্মীদের মধ্যে বিশেষ সংগঠন শক্তির পরিচয় পরে দিয়াছেন পুব সেনপাড়ার সুকুমার গুপ্ত। আন্তর্জাতিক যুব সমিতির কলিকাতা শাখার সেক্রেটারি স্বরূপ ইনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন

এবং এই উপলক্ষ্যে বিদেশের অনেক স্থানেও গিয়াছেন। ইনি বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির একজন বিশিষ্ট সভ্য।

ইতিমধ্যে সাম্যবাদ নীতি (Communist doctrine) দেশের মধ্যে প্রচারিত হইতেছিল। গৈলার যাঁহারা দীর্ঘকাল কারার অন্তরালে ছিলেন তাঁহাদের অনেকে বাহির হইয়াই কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। বহু তরুণ ও তরুণীও সেবাশ্রমে যোগ দেন। পাড়ায় পাড়ায় ইঁহারা সাম্যবাদের নীতি প্রচার করিতেন। কৃষকদের মধ্যেও অনেকে ঐ উদ্দেশ্যে কাজ করিয়াছিলেন এবং ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের সময় ইঁহারা গ্রামে লঙ্গরখানা ও দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র খুলিয়া ও অন্য ভাবে দেশের সেবা করিয়াছেন। মহিলা কর্মীদের নেত্রী ছিলেন দুহিসেনের বাড়ির রাই কিশোরী দেবী (সুধীর সেনের জ্যেষ্ঠা ভগিনী)। ভারত রক্ষা আইনে তাঁহাকে আটক করা হইয়াছিল কিন্তু বিচারে তিনি মুক্তি লাভ করেন। তাঁহার নেতৃত্বে অনেক মেয়েরা কাজ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে পূব সেন-পাড়ার বিরাজ মোহন সেনের কন্যা রাণী সেন ও ঘটকের পাড মুখুজ্যে বাড়ির প্রিয়নাথ মুখুজ্যের কন্যা মলিনা দেবীর নাম উল্লেখ যোগ্য।

অশ্বিনী কুমার গুপ্তের (শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি) কার্যস্থল ছিল কলিকাতা। তিনিও ছাত্র ও যুব আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩৪-৩৫ সালে কলিকাতায় বামপন্থী কর্মী সম্মেলনের তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। ঐ সম্মেলনেই কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টি গঠিত হয়। ১৯৪২ সালের আন্দোলনেও তিনি অংশ গ্রহণ করেন। তিনি অনেকবার কারাবরণ করিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গ শেষ করার পূর্বে উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে ভারতভূষণ পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় আগৈলঝাড়ার কন-ফারেন্সে যোগদান করিতে ও ভেগাই হালদার প্রতিষ্ঠিত হাই ইংরেজি স্কুল দেখিবার জন্য আসিয়া গোলার পাড গুপ্তের নূতন বাড়িতে ছিলেন। তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য অনেকেই

সেখানে গিযাছিলেন এবং তাঁহাব নিকট হইতে দেশভক্তির প্রেরণা লাভ কবিযা ধন্য হইযাছিলেন। বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও (স্বামী বিবেকানন্দেব ভ্রাতা) মালবীযজীব সঙ্গে আসিয়াছিলেন এবং গৈলা স্কুলে অবস্থান কবিযাছিলেন।

দেশেব বাজনৈতিক, সন্ত্রাসবাদী, বৈপ্লবিক, অহিংস অসহযোগ ও আইন অমান্য প্রভৃতি আন্দোলনে গ্রামেব অনেক যুবকই বিভিন্ন সমযে গভর্ণমেণ্টেব কোপে পডে এবং জেলে, অন্তবীনে বা নিজগৃহে আটক থাকে। সকলেব বিভিন্ন কাজকর্ম এখানে প্রকাশ করা সম্ভব নয। নিচেব তালিকাতে ঐ ভাবে নির্যাতিত ৬৮ জন দেশকর্মীর নাম দেওযা হইল। ইহা ভিন্ন আবও অনেকে পুলিশেব হস্তে নানাভাবে লাঞ্ছিত হইযাছিলেন কিন্তু তাঁহাদের জেলে যাইতে হয নাই। তাঁহাদেব নাম এখানে দেওয়া হইল না।

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওযাব পর প্রাণকুমাব সেন (মজুমদার বাডি) ববিশালে থাকিযা কংগ্রেসেব কার্য্য কবিতে থাকেন। তিনি প্রসিদ্ধ সতীন সেনের সহকর্মী ছিলেন এবং পূর্ববঙ্গ আইন সভাব সভ্য হইযাছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার জন্য তাঁহাকে কাবাববণ করিতে হয। তাঁহাব মৃত্যুব পবে তাঁহাব চিতাভস্ম আনিয়া কলিকাতার নিকটবর্তী ব্রহ্মপুরে (গবিযাব নিকট) স্থাপন করা হয। ঐ অনুষ্ঠানে পৌবোহিত্য করেন পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেন।

ভাবত ইউনিযনে স্বদেশ কুমাব গুপ্ত (গোলাব পাড) রাজনীতির সঙ্গে অনেককাল যুক্ত ছিলেন। বিহাবের পূর্ণিযা জিলা হইতে ফনীগোপাল সেনগুপ্ত (কালুপাডা, উত্তবের বাডি) একাধিকবাব ভারতীয লোকসভার সভ্য (এম-পি) নির্বাচিত হ'ন। প্রিযনাথ গুপ্তও (কানাই গুপ্তেব বাড়ী) এম-পি নির্বাচিত হইযাছেন। ডাঃ সুশীল চন্দ্র দাশ গুপ্ত (কবিরাজ বাডি) বাংলাদেশেব আইন সভার সভ্য (এম-এল-এ) নির্বাচিত হইযাছেন।

নির্যাতিত দেশকর্মীর তালিকা (বর্ণানুক্রমে)

নাম	বাড়ি
অজিত কুমার গুপ্ত	শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি।
অতুল চন্দ্র গুপ্ত	শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি।
অতুল চন্দ্র ভট্টাচার্য	কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের বাড়ি।
অনিল কুমার সেন গুপ্ত	দীঘির পাড়।
অনু দাশ গুপ্ত	ভরদ্বাজের বাড়ি।
অমল দাশ গুপ্ত	ভরদ্বাজের বাড়ি।
অমিয় দাশ গুপ্ত (মহারাজ)	নরসিংহ দাশের বাড়ি।
অমিয় গুপ্ত	গোলার পাড, গুপ্তের বাড়ি।
অশ্বিনী কুমার গুপ্ত	শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি।
ইন্দু ভূষণ দাশ গুপ্ত	বকশী বাড়ি।
কিষাণ দাশ গুপ্ত	আলোক গুপ্তের বাড়ি।
কেশব চন্দ্র সেন গুপ্ত	কালুপাড়া, দক্ষিণের বাড়ি।
কৈশোর মুখার্জি	শিব বাড়ি।
ক্ষিতীশ চন্দ্র সেন গুপ্ত	রতন সেনের বাড়ি।
ডাঃ ক্ষিতীশ চন্দ্র সেন গুপ্ত	কালুপাড়া, দক্ষিণের বাড়ি।
ডক্টর চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী	কালীকান্ত ঠাকুরের বাড়ি।
চিন্তাহরণ গুপ্ত	গোলার পাড়, গুপ্তের বাড়ি
ডাঃ জ্যোতির্ময় গুপ্ত	দেবী গুপ্তের বাড়ি।
জ্যোতি দাশ গুপ্ত	বকশী বাড়ি।
তারকেশ্বর সেন গুপ্ত	কালুপাড়া, দক্ষিণের বাড়ি।
তারাপদ চাটার্জি	নীলমনি চাটার্জির বাড়ি।
দুরন্ত দাশ গুপ্ত	বকশী বাড়ি।
ধীরেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত	কালুপাড়া, দক্ষিণের বাড়ি।

নাম	বাড়ি
ধীরেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত	তুহিসেনের বাড়ি।
ডাঃ নগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য	ভবেন্দ্র ভট্টাচার্যের বাড়ি।
নগেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত	তুহিসেনের বাড়ি।
ননী গোপাল সেন গুপ্ত	তুহিসেনের বাড়ি।
নয়নাঞ্জন দাশ গুপ্ত	দীঘির পাড়।
নারায়ণ চন্দ্র সেন গুপ্ত	তুহিসেনের বাড়ি।
নির্মল দাশ গুপ্ত	ভরদ্বাজের বাড়ি।
নিশিকান্ত দাশ গুপ্ত	ভরদ্বাজের বাড়ি।
পান্নালাল গুপ্ত	গোলার পাড।
পুতুল দাশ গুপ্ত	দাশের বাড়ি, ছোট হিস্যা।
প্রবোধ চন্দ্র দাশ গুপ্ত	কবীন্দ্র বাড়ি।
প্রশান্ত কুমার দাশ গুপ্ত	দাশের বাড়ি, ছোট হিস্যা।
প্রাণকুমার সেন	মজুমদার বাড়ি।
ফণীগোপাল সেন গুপ্ত	কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি।
বরুণ দাশ গুপ্ত	ভরদ্বাজের বাড়ি।
বিমল গুপ্ত	চৌধুরী বাড়ি।
বিশ্বেশ্বর চাটার্জি	নীলমনি চাটার্জির বাড়ি।
মনোরঞ্জন সেন গুপ্ত	সত্যসেনের বাড়ি।
মুকুল চন্দ্র সেন গুপ্ত	পূব সেনপাড়া।
রাজ্যেশ্বর সেন গুপ্ত	কালুপাড়া, দক্ষিণের বাড়ি।
ললিত মোহন দাস	নিমদাশের বাড়ি।
শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য	কৃষ্ণ কুমার ভট্টাচার্যের বাড়ি।
শান্তি সেন গুপ্ত	তুহিসেনের বাড়ি।
শিশির কুমার গুপ্ত	চৌধুরী বাড়ি।
শ্রীশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত	দীঘির পাড়।

নাম	বাড়ি
সত্যেন্দ্র নাথ সেন	পূব সেনপাড়া।
সুজাতা গুপ্ত (দাশ গুপ্ত)	শঙ্কের গুপ্তের বাড়ি ও নরসিংহ দাশের বাড়ি।
সুধাংশু দাশ গুপ্ত	আলোক গুপ্তের বাড়ি।
সুধাংশু সেন গুপ্ত	তুহিসেনের বাড়ি।
সুধীর চন্দ্র ভট্টাচার্য	আনন্দ ভট্টাচার্যের বাড়ি।
সুধীর চন্দ্র সেন	তুহিসেনের বাড়ি।
সুনীল কুন্দগ্রামী	গোপাল পুরোহিতের বাড়ি।
সুনীল দাশ গুপ্ত	বকশী বাড়ি।
সুরেশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত	ভরদ্বাজ বাড়ি।
ডঃ সুরেশ চন্দ্র সেন গুপ্ত	রতন সেনের বাড়ি।
সুশীল কুন্দগ্রামী	গোপাল পুরোহিতের বাড়ি।
সুশীল কুমার গুপ্ত	চৌধুরী বাড়ি।
সুশীল দাশ গুপ্ত	বকশী বাড়ি।
সুশীল পিপলাই	যোগেন্দ্র পিপলাইয়ের বাড়ি।
স্বদেশ কুমার গুপ্ত	গোলার পাড়।
হরিশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত	দীঘির পাড়।
হরেন্দ্র নাথ সেন	তুহিসেনের বাড়ি।
হারাণ চন্দ্র দাশ গুপ্ত	রাজমোহন দাশের বাড়ি।
হিমাংশু দাশ গুপ্ত	আলোক গুপ্তের বাড়ি।
হৃষীকেশ গুপ্ত	আনন্দ ডাক্তারের বাড়ি।

সাহিত্য

সাহিত্য রচনার প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় বিজয় গুপ্ত ও তাঁহার রচিত মনসামঙ্গলের। কয়েকশত বৎসর পূর্বে রচিত এই মঙ্গল কাব্যখানি বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

মনসামঙ্গল রচনার পরে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের পূর্বে আর কোনও গৈলাবাসী সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। পরবর্তী কালে, ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, রসরচনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে কিছু কিছু লেখকের আবির্ভাব হইতে থাকে এবং কেহ কেহ বিশেষ খ্যাতি ও সম্মানের অধিকারী হন। কাহারও লেখা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। কেহ কেহ সংবাদ পত্র সেবায় প্রবৃত্ত হন এবং সাংবাদিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। আধুনিক যুগের এই সকল লেখক ও সাংবাদিকের বিবরণ পরে প্রদত্ত হইল।

মনসামঙ্গল

প্রথমেই মনসামঙ্গলের কথা আলোচনা করা যাইতেছে। বিজয় গুপ্ত রচিত মনসামঙ্গল গ্রন্থ বহুকাল যাবৎ সমগ্র বাঙালীজাতিকে আনন্দ ও শিক্ষা দিয়া আসিতেছে। এই গ্রন্থ দ্বারা বিজয় গুপ্ত সমগ্র বাঙালী জাতির সহিত আমাদের সংযুক্ত করিয়াছেন। আমাদের পরম গৌরবের

বিষয় যে তিনি গৈলারই অধিবাসী। একারণে আমরা এ বিষয়ে একটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিব। বইখানার বিষয়বস্তু যেমন করুণ ও হৃদয়গ্রাহী তেমনি ইহাতে তৎকালীন বঙ্গ সমাজের ও দেশের নিখুঁত চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিজয় গুপ্ত তাঁহার কাব্যে আমাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

কাব্যের বিষয় সংক্ষেপে এই ঃ—চাঁদ সদাগর শিবের ও চণ্ডীর পরম ভক্ত ছিলেন। মনসা দেবী মর্ত্যধামে তাঁহার পূজা প্রচলনের জন্য ব্যস্ত হইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে চাঁদ সদাগর তাঁহাকে পূজা না করিলে তাঁহাকে অন্যে "দেবী" বলিয়া স্বীকার করিবে না। তখন তিনি নানা ভাবে চাঁদ সদাগরকে প্রলুব্ধ করিতে ও ভয় দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু পৌরুষের প্রতিমূর্তি চাঁদ তাঁহার নিজ বিশ্বাসে অটল রহিলেন। মনসা দেবীর প্রকোপে একে একে তাঁহার ছয় পুত্র সর্পদংশনে প্রাণ হারাইল। তিনি কিন্তু দমিলেন না। সমুদ্রে তাঁহার বাণিজ্যের সপ্ত ডিঙ্গা ডুবিয়া গেল, তিনি নিজেও সমুদ্র মধ্যে পতিত হইলেন। তখন নিকটে কলাগাছের ভেলা দেখিয়া তাহাতে উঠিতে গেলেন কিন্তু দেখিলেন যে মনসা দেবীকে পূজা দিলে তাঁহার সকল বাণিজ্য তরী ভাসিয়া উঠিবে ও নিজেও প্রাণে বাঁচিতে পারিবে এই "আখরলেখা" আছে। ঐ ভেলা মনসাদেবী প্রেরিত বুঝিতে পারিয়া ঘৃণাভরে তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। পরে তাঁহার ছোটপুত্র লক্ষীন্দর মনসাদেবী প্রেরিত সর্পদংশনে বিবাহের রাত্রেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার নববিবাহিতা স্ত্রী বেহুলা তাঁহার মৃতদেহ নিয়া কলার ভেলায় ভাসিয়া বহু দুঃখ ও কষ্টের মধ্যে লক্ষীন্দরকে পুনর্জীবিত করিয়া ফিরিলেন। ইহাতে স্বভাবতই চাঁদ পুত্রবধুর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু তাহার কথা মতে মনসাদেবীর পূজা করিতে রাজী হইলেন না, এমন কি পুনর্বার লক্ষীন্দরের জীবন বিসর্জন দিতে হইলেও না। তখন দৈববাণী হইল যে, মনসা দেবী ও চণ্ডী একজনই বিভিন্নরূপে প্রকাশিত। তিনি

তখন বাম হস্তে মনসা দেবীর পূজা দিতে রাজী হইলেন। পরে যখন স্বচক্ষে দেখিলেন যে তাঁহার আরাধ্যা দেবী চণ্ডী ও দেবী মনসা একই তখনই মাত্র মনসা দেবীকে পূজা করিতে স্বীকৃত ও প্রবৃত্ত হইলেন। (প্যারীমোহন দাশ সংকলিত মনসামঙ্গল)।

চাঁদের চরিত্রের বলিষ্ঠতায় স্বভাবতই আমাদের মস্তক শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে নত হয়। বেহুলার পাতিব্রত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাংলাদেশের, বিশেষত পূর্ববঙ্গের নরনারীগণের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে ও অনুপ্রেরণা দিয়াছে। নারীরা ভক্তিভাবে তাহাকে স্মরণ করিয়া থাকে।

কবির ভাষা সরল ও হৃদয়গ্রাহী, যদিও মাঝে মাঝে অমার্জিত। এই বই খানিতেই বাংলা কাব্য সাহিত্যে প্রথমে ছন্দের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। বিজয় গুপ্তকে কবিত্বশক্তির জন্য "'ছোট বিদ্যাপতি" বলা হইত।

মনসামঙ্গল সুর লয় তাল সংযোগে গীত হইত। মনসা দেবীর গান পূর্বাঞ্চলে রয়ানী নামে খ্যাত ছিল (পশ্চিম বাংলায় মনসার ভাসান) এবং বহুলোকে মানত করিয়া ৩।৫।৭ দিন ধরিয়া এই রয়ানী গান করাইতেন। শেষের দিন সমস্ত রাত্রি ধরিয়া গান হইত এবং সেই জন্য শেষ পালাকে জাগরণ পালা বলা হইত। রয়ানীর প্রধান গায়িকা থাকিতেন একটি স্ত্রীলোক। তিনি চামর হস্তে গান গাইতেন ও দোহাররা তাহার সঙ্গে সঙ্গে গাইত।

জনপ্রিয়তার জন্য এই ভাবে গানের সময় অনেক গায়েন নিজেদের অথবা অপর কবি কর্তৃক রচিত ভনিতা মূল গ্রন্থের সঙ্গে যোগ দিতেন। তাহাতে কালক্রমে বিজয় গুপ্তের মূল বই অনেক পরিশোধিত ও পরিবর্তিত হইয়াছিল। বর্তমানে প্রচলিত মনসামঙ্গলের কতটা বিজয় গুপ্ত রচিত ও কতটা প্রক্ষিপ্ত বলা কঠিন, তবে মূল গ্রন্থ যে আকারে অনেক ক্ষুদ্র ছিল এ বিষয়ে সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা এক মত।

এই সব বিভিন্ন গায়েনদের ও অন্যান্য হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ

করিয়া ও মিলাইয়া বিজয় গুপ্তের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ সমগ্র গ্রন্থ প্রথম সংকলন করেন প্যারীমোহন দাশ গুপ্ত (দাশের বাড়ি, চৌধুরী হিস্যা)। এই কার্যে রামচরণ শিরোরত্ন (তর্কবাগীশের বাড়ি) ছিলেন তাঁহার সহায়ক। বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয় বরিশাল হইতে ১৩০৩ সালে। এই পুস্তক মুদ্রণের পূর্বে অনেকেই সমগ্র মনসামঙ্গল পাঠের সুযোগ পায় নাই। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে প্যারী বাবুর এই অবদান বিশেষ মূল্যবান। এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয় বাংলা ১৩১৩ সালে। ১৩১৪ সালে কলিকাতা বণিক প্রেস হইতে নগেন্দ্র মোহন সেন গুপ্ত (পূব সেনপাড়া) এই বইয়ের নূতন সংস্করণ বাহির করেন। পরে জয়ন্ত কুমাব দাশ গুপ্ত (দাশের বাড়ি, চৌধুরী হিস্যা) নূতন ভাবে বই সংকলন করেন ও ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়।

অনেক স্থলে এই সকল সংস্করণের মধ্যে মিল দেখা যায় না। তন্মধ্যে বইয়ের রচনা কাল সম্বন্ধে বিভিন্ন পাঠ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কারণে পুস্তকের রচনা কাল নিয়া সাহিত্যিকদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়াছে।

প্যারী বাবুর বইয়ে রচনা কাল সম্বন্ধে আছে—

"শ্রাবণ মাসের রবিবারে মনসা পঞ্চমী
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি নিদ্রা যায় স্বামী

* * *

হেন কালে বিজয় গুপ্ত দেখিলা স্বপন

* * *

আজু নিশি অবসানে এড়িয়া বসন
গীত ছন্দে রচ কিছু আমার স্তবন

* * *

প্রভাত সময়ে প্রকাশ দশ দিশা

স্নান করি বিজয় গুপ্ত পূজিল মনসা

*　　*　　*

বচিতে আরম্ভ কবে মনসাব গীত

*　　*　　*

ঋতু শূন্য বেদ শশী পবিমিত শক
সুলতান হোসেন সাহ নৃপতি তিলক"

নগেন্দ্র মোহন সেন গুপ্তেব সংস্করণে সময় জ্ঞাপক "ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক, সুলতান হোসেন সাহ নৃপতি তিলক' প্রভৃতি কয়েকটি লাইন নাই।

জয়ন্ত কুমাব দাশ গুপ্তেব সংস্করণে "ঋতু শূন্য বেদ শশী" এই পাঠের পরিবর্তে "ঋতু শশী বেদ শশী" পাঠ গৃহীত হইয়াছে।

'ঋতু শূন্য বেদ শশী' এই পাঠে ১৪০৬ শক অর্থাৎ ১৪৮৪।১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু 'নৃপতি তিলক' হোসেন সাহের বাজত্ব কাল ১৪৯৩-১৫১৯। ১৪০৬ শকেব ২২ শে শ্রাবণ পঞ্চমী তিথি সূর্যোদয়ের কিছু পরে আরম্ভ হইযাছিল সুতরাং মনশা পূজার ঐ দিন নহে। এ কারণে কোনও কোনও ঐতিহাসিক "ঋতু শূন্য বেদ শশী" এই পাঠ পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য বিভিন্ন পাঠের মধ্যে 'ঋতু শশী বেদ শশী' এই পাঠ গ্রহণ করেন। ইহাতে ১৪১৬ শক অর্থাৎ ১৪৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। হোসেন সাহ তৎপূর্বে সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন ও ২২শে শ্রাবণ তারিখ মনসা পূজার দিন ছিল। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন ও ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এই পাঠ স্বীকার করেন। ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার বিজয় গুপ্ত হোসেন সাহের রাজত্ব কালে বই লিখিয়াছিলেন এই মত গ্রহণ করেন, কিন্তু ডঃ সুকুমার সেন বিভিন্ন দিক হইতে আলোচনা করিয়া এই মত প্রকাশ করেন যে, "পঞ্চদশ

শতাব্দের শেষ দশকে (বিজয় গুপ্তের) মনসামঙ্গল রচনা আরম্ভ বা শেষ হয় এ বিশ্বাসের কোনও প্রমাণ নাই, এমন কি যুক্তিযুক্ত সংশয়েরও স্থান নাই।" তাহার মতে এই গ্রন্থ অনেক পরবর্তী কালের রচনা।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ১৪০৬ শকে বাংলা দেশের সুলতান ছিলেন জালালুদ্দিন ফাত। তিনিও নিজ নামের পরে "হোসেন সাহী" শব্দ ব্যবহার করিতেন। সে জন্য সুখময় মুখোপাধ্যায় "ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক" পাঠ অগ্রাহ্য করার কোনও কারণ নাই মনে করেন। এ সম্বন্ধে ইহাও বিবেচ্য যে ঐ শকের ২২শে শ্রাবণ সূর্যোদয়ের সময় যদিও পঞ্চমী তিথি ছিল না কিন্তু রাত্রিতে যখন বিজয় গুপ্তের স্বপ্ন দেখার বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে তখন পঞ্চমী তিথি ছিল এবং তৎপর দিন সকালে তিনি মনসা দেবীর পূজা করেন। এ হিসাবে 'ঋতু শূন্য বেদ শশী' পাঠের সহিত অমিল হয় না। কিন্তু তখনকার সুলতান জালালুদ্দিন ফাত বিখ্যাত বা বাংলা ভাষার উৎসাহদাতা ছিলেন বলিয়া জানা যায় না। সম্ভবত সেই কারণে "ঋতু শশী বেদ শশী" পাঠ গৃহীত হইয়াছে।

সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন মতের উল্লেখ করা হইল। 'বর্ত্তমান অধিবাসীবৃন্দ ও তাহাদের আগমন কাল' অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে ত্রিলোচন দাশ কবীন্দ্র আনুমানিক ৪০০ বৎসর পূর্বে গৈলা গ্রামে প্রথম আগমন করেন ও তাঁহার ভগিনী রুক্মিণী দেবীর পুত্র বিজয় গুপ্ত তাঁহার অন্তত ২৫ বৎসর পর মনসামঙ্গল গ্রন্থ রচনা করেন। এ হিসাবে এই গ্রন্থ রচনা কাল আনুমানিক ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বলা যায় না। ইহাতে 'নৃপতি তিলক' হোসেন সাহের প্রায় ১০০ বৎসর পরে দাড়ায়। যদিও মনসামঙ্গল গ্রন্থে ত্রিলোচন দাশ কবীন্দ্রের সহিত বিজয় গুপ্ত বা তাঁহার মাতার কোনও সম্পর্কের উল্লেখ নাই তবুও ভবদাশ বংশের প্রসিদ্ধি অবিশ্বাস করারও কোনও কারণ দেখা যায় না।

আরও অনুসন্ধান করিলে সম্ভবত বিজয় গুপ্তের মনসা মঙ্গলের রচনা কাল সঠিকভাবে নিরূপিত হইতে পারে।*

আধুনিক কালের সাহিত্য সাধনা

ইংরেজী যুগে রচিত পুস্তকাবলীর মধ্যে 'গৃহিনীর কর্ত্তব্য' পুস্তকখানির কথা প্রথমে উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রায় ৬০।৭০ বৎসর পূর্বে পূব সেনপাড়ার আনন্দ চন্দ্র সেন এই পুস্তক ও অন্য কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন। কলিকাতা হইতে ঐগুলি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

ফুলশ্রীর কবিরাজ বাড়ির মহেশ চন্দ্র দাশ গুপ্তও অনুরূপ সময়ে কতিপয় নাটক রচনা করেন।

বকশী বাড়ির প্যারী মোহন দাশ গুপ্ত স্যার ওয়ালটার স্কটের 'লেডী অব দি লেক' (Lady of the Lake) অবলম্বনে একখানি পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করেন।

***পাদটীকা ঃ**

উপরোক্ত তথ্য ও আলোচনার জন্য আমরা নিম্নলিখিত পুস্তকের নিকট ঋণী :—

১। মনসামঙ্গল—প্যারীমোহন দাশ সংকলিত, ১৩১৩ সালে বরিশাল হইতে মুদ্রিত (২য় সংস্করণ)।

২। মনসামঙ্গল—অক্ষয়কুমার দাশ সংকলিত, ১৯৬২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত।

৩। মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস—ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, ১৩৪৬।

৪। বাংলা দেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড—স্যার যদুনাথ সরকারের সম্পাদনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত।

৫। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন (সপ্তম সংস্করণ)।

৬। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বার্দ্ধ—ডক্টর সুকুমার সেন, ১৯৫৯।

৭। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, সুখময় মুখোপাধ্যায়, ১৯৫৮।

কালুপাড়া দক্ষিণের বাড়ির উপেন্দ্র নাথ সেনের স্ত্রী সরযূ বালা সেন (বকশী বাড়ির রজনী কান্ত দাশের দৌহিত্রী) অল্প বয়সেই কবিতা ও গল্প লিখিতে আরম্ভ করেন। ঐ সকল গল্প ও কবিতা প্রবাসী প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনিই গৈলার প্রথম মহিলা কবি ও গল্প লেখিকা। চৌধুরী বাড়ির সরোজ বাসিনী গুপ্তা সম্ভবত গ্রামের দ্বিতীয় মহিলা কবি। তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে পরলোক গমন করেন।

পরবর্তীকালে যাঁহারা বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তকাদি রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কবীন্দ্র বাড়ির ডঃ সুরেন্দ্র নাথ দাশ গুপ্তের নাম সর্ব্বাগ্রগণ্য। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বাংলা ও ইংরেজীতে কুড়িখানিরও অধিক পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ইংরেজী ভাষায় রচিত, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, পাচ খণ্ডে সম্পূর্ণ তাঁহার বিরাট গ্রন্থ 'ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস' তাঁহাকে স্বদেশে ও বিদেশে প্রভূত খ্যাতি ও সম্মানের অধিকারী করে। আদি যুগ হইতে বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাধারার বিকাশ ও পবিণতিব ইতিহাস মূল সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালি ভাষা হইতে সংগ্রহ করিয়া তিনি এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি প্রধানত দার্শনিক হইলেও তাঁহার রচিত 'Rabindranath, the Poet and Philosopher', 'রবি দীপিতা,' 'সাহিত্য পরিচয়' প্রভৃতি পুস্তক সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় বহন করে। তিনি 'নিবেদন,' 'চারণী' প্রভৃতি কবিতার বই ও প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার উপরে ইংরেজী ও বাংলায় একাধিক পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার রচিত কোনও কোনও কবিতা বিদেশে খুব প্রশংসা লাভ করিয়াছে।

ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্তের স্ত্রী ডঃ সুরমা দাশ গুপ্ত ও কন্যা মৈত্রেয়ী দেবীর নামও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ডঃ সুরমা দাশ গুপ্ত তাঁহার

স্বামীব মৃত্যুর পর 'ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের' পঞ্চম খণ্ড সহ তাঁহার স্বামীর লিখিত আরও তিনখানি পুস্তকেব রচনা সমাপ্ত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। উহাব মধ্যে একখানি ধর্ম ও একখানি ভারতীয় শিল্পকলা সম্পর্কে। সুবেন্দ্রনাথেব কন্যা মৈত্রেয়ী দেবী বচিত সুবিখ্যাত পুস্তক 'মংপুতে ববীন্দ্রনাথ' ববীন্দ্র পুবস্কাব লাভ করিয়াছে।

কানাই গুপ্তেব বাডির গোপাল গোবিন্দ গুপ্তের কন্যা (দাশের বাড়ির বড় হিস্যাব কূলভূষণ দাশের স্ত্রী) কুসুমকুমাবী দাশ গুপ্ত 'আত্মনিবেদন' নামক একখানি কবিতার বই প্রণয়ন কবেন।

ফুলশ্রীব কবিবাজ বাড়িব কার্ত্তিকচন্দ্র দাশ গুপ্ত ছিলেন প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক। যে সময়ে বাংলা সাহিত্যে শিশু ও কিশোরদের উপযোগী পুস্তকের স্বল্পতা ছিল সেই সময়ে তাঁহাব রচিত 'সাবিত্রী' 'ফুলঝুরি' 'তাই তাই' 'সাত বাজার গল্প' প্রভৃতি পুস্তক বাংলা দেশের শিশু ও কিশোবদেব মাতাইয়া রাখিত। সাহিত্য, ভ্রমণকাহিনী, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি মিলাইয়া তিনি সর্বশুদ্ধ প্রায় ৩৫ খানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। সাংবাদিক হিসাবেও তিনি 'নবশক্তিতে' কাজ করিয়াছেন। বাংলাদেশের সাহিত্যিকগণ তাঁহার ঊনআশী বৎসব পূর্ত্তি উপলক্ষে তাঁহাকে বিশেষ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

আনুমানিক ৪০ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত রামমোহন দাশের বাড়ির চন্দ্রকান্ত দাশ বচিত 'শিয়াল পণ্ডিত' ও 'বিডাল মাসী' নামক দুইখানি শিশুপাঠ্য বই ঐ সময়ে প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল।

নরসিংহ দাশের বাড়ির বিপিন বিহারী দাশ গুপ্তের বৈষ্ণব সাহিত্যে গভীর জ্ঞান ছিল। সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দ দাসের কড়চার তিনি বিরূপ সমালোচনা করেন এবং ঐরূপ কোন কড়চার আদৌ অস্তিত্ব ছিলনা এই মত প্রকাশ করেন। প্রামাণ্য হিসাবে গৃহীত এই পুস্তকখানির বিরুদ্ধে বিপিনবাবুর এই সমালোচনা সাহিত্যিক ও বৈষ্ণব মহলে সবিশেষ

আলোড়ন সৃষ্টি করে, কিন্তু স্যার যদুনাথ সরকার প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক বিপিনবাবুর যুক্তির সারবত্তা সমর্থনের ফলে তাঁহার মত গৃহীত হয়। বিপিনবাবু বৈষ্ণব ধর্মেব ভক্তিতত্ত্ব এবং স্বাদেশিকতা বিষয়ে ইংরেজী ও বাংলায় গদ্যে ও পদ্যে অনেক বই লিখিয়াছেন।

ডক্টর চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী (পূর্ব বৈদিক পাড়া) ইংরেজী ও বাংলায় স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, সমাজদর্শন, রাজনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে অনেক পুস্তক রচনা করেন। তাঁহাব "হিন্দু পলিটি" (Hindu Polity) ও "পুরাতন ভারত" (Ancient India) নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স প্রভৃতি পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসা লাভ করে।

পূব সেনপাড়ার কেশব চন্দ্র সেন গুপ্ত একাধারে সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ছিলেন। যে যুগে দারিদ্র্য বরণ না করিয়া সংবাদপত্র সেবা করা সম্ভবপর হইত না সেই যুগে তিনি বন্দেমাতরম্‌, কেশরী, ভোটরঙ্গ মাতৃভূমি, কৃষক, নতুন নায়ক, রবিবারের লাঠি প্রভৃতি দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক কাগজে কাজ কবিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাট্য সমালোচনা এককালে পাঠক মহলের বিশেষ প্রিয় ছিল। তিনি কয়েকখানি নাটকও রচনা করেন। স্ত্রী-চরিত্র বর্জিত ছেলেদের নাটক তাঁহার পূর্বে আর কেহ রচনা করেন নাই। তাঁহার রচিত 'একলব্য,' 'প্রতাপাদিত্য,' 'হলদিঘাট,' 'কর্নার্জ্জুন' প্রভৃতি নাটক খুবই খ্যাতি অর্জন করে।

হীরালাল দাশ গুপ্তের (দাশের বাড়ি, মেজ হিস্যা) কবিতা বিভিন্ন মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। তাঁহার বচিত পুস্তকাদির মধ্যে "না" নামে কবিতার পুস্তকখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ফুল্লশ্রীর কবিরাজ বাড়ির দিলীপ দাশগুপ্ত লেখক ও সাংবাদিক হিসাবে পরিচিত। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

গোলার পাড় গুপ্তের বাড়ির বিভূতি গুপ্ত গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি লিখিয়া থাকেন। প্রবাসীর পাঠক পাঠিকারা তাঁহার লেখার সহিত

পরিচিত। তাঁহার রচিত পুস্তকের মধ্যে 'এবাহ', 'বাঁধ' ও 'ফুলডোর' অন্যতম।

পাঠক বাড়ির অনিলেন্দু চক্রবর্তীর একাধিক কবিতার বই প্রকাশিত হইয়াছে। তিনিও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গল্প প্রভৃতি লিখিয়া থাকেন।

উৎকৃষ্ট শিশুসাহিত্য রচনা করিয়া সাম্প্রতিক কালে দেবদাস দাশ গুপ্ত (দাশেব বাড়ি, মেজ হিস্যা) খ্যাতি ও সম্মান লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বচিত 'আকাশ ও পৃথিবী' 'আজব কল' 'পরাভূত পৃথিবী' প্রভৃতি পুস্তকাবলীর জন্য তিনি দুইবার সাহিত্য একাডেমীর পুরস্কার লাভ করেন। 'আজব কল' কানাড়া, হিন্দী ও উর্দুতে অনূদিত হইয়াছে।

নলিনী ভূষণ দাশ গুপ্ত (বকশী বাড়ি) শিশু ও কিশোরদের জন্য কয়েকখানি পুস্তক বচনা কবেন।

সুধীরচন্দ্র ভট্টাচায্য (আনন্দ ভট্টাচার্যের বাড়ি) 'ভারতীয় বৈপ্লবিক সংগ্রামেব ইতিহাস' নামে একখানি তথ্যপূর্ণ পুস্তক সহ অন্যান্য কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

দীঘির পাড় দত্তের বাড়ির অক্ষয় কুমার দত্তও 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙ্গালী' নামে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

মাখনলাল গুপ্ত দেশপ্রেমোদ্দীপক কবিতা ও গীতিনাট্য রচনা করিয়াছেন। 'হে বীর পূর্ণ কর' তাঁহার অন্যতম পুস্তক।

নির্মল সেন গুপ্ত (পূব সেনপাড়া) আধুনিক কবিতা রচনা করিয়া থাকেন। তাহার একখানি কবিতার পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

অমিয় ভূষণ গুপ্তের (গোলার পাড়) ব্যঙ্গ কবিতা, রস রচনা প্রভৃতি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে।

ইহা ছাড়া বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় আর যাঁহাদের গল্প, কবিতা প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয় তাঁহাদের মধ্যে ভবানী প্রসাদ দাশ গুপ্ত (রামনাথ দাশের বাড়ি), প্রতিভা গুপ্ত (শংকর গুপ্তের বাড়ি), যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, প্রলয় সেন গুপ্ত (পূব সেনপাড়া) ও হিমাংশু গুপ্ত (কানাই গুপ্তের

বাড়ি) অন্যতম। মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত প্রতিভা গুপ্তের (সুধীন্দ্র গুপ্তেব স্ত্রী) আন্দামান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধসমূহ পাঠক মহলে প্রশংসা লাভ কবিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত রচিত গান 'এবাব মোরা ডাকব মা বলে, মায়ের অমল কমল চবণ যুগল ধূয়ে দেব নয়ন জলে' মুখে মুখে গীত হইত। হিমাংশু গুপ্ত লিখিত 'জ পানী ফিফ্‌থ্‌ কলম" ডিটেকটিভ উপন্যাস হিসাবে এককালে বিশেষ সমাদব লাভ কবিয়াছিল।

কৃতী সাংবাদিক হিসাবে শঙ্কর গুপ্তেব বাড়িব অশ্বিনীকুমার গুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার দিল্লী আফিসের তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন।

গৈলার আর একজন সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত (পূব সেন পাড়া) রেডিক্যাল ও জনতা নামে দুইখানি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ইহা ছাড়া সত্যযুগ, কৃষক, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, আজাদ প্রভৃতি পত্রিকায়ও তিনি কাজ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত পুস্তকাবলীর মধ্যে '১৫ই আগষ্ট" নামে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেব কাহিনী ও "ধূসব দিগন্ত" (উপন্যাস) অন্যতম।

ইহা ছাড়া আর যাহারা সাংবাদিকতাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন বা বিভিন্ন সময়ে সংবাদ পত্র সেবায় আত্ম নিয়োগ করেন তাহাদের মধ্যে দুহিসেনের বাড়ির রমেশচন্দ্র সেন (বেঙ্গলী, অমৃতবাজার), মজুমদার বাড়ির প্রাণকুমার সেন (ভোটরঙ্গ), আলোক গুপ্তেব বাড়ির প্রফুল্ল গুপ্ত (লোকসেবক, হিন্দুস্থান) বৈদিক পাড়ার কিশলয় ঠাকুর (লোকসেবক, বসুমতী, আনন্দবাজার) দুহিসেনের বাড়ির সুধীর সেন (মতামত, মঞ্জিল) বকশী বাড়ির জ্যোতি দাশ গুপ্ত ও দাশের বাড়ির প্রভাতকুসুম দাশ গুপ্ত (দৈনিক স্বাধীনতা), রামমোহন দাশের বাড়ির নিত্যানন্দ দাশ গুপ্ত (বার্ণপুর কুলটী ম্যাগাজিন) এবং গোলার পাড়ের হিরন্ময় গুপ্ত (কেশরী, কৃষক, মাতৃভূমি, হিন্দুস্থান ও পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা) অন্যতম।

চারুকলা

বিভিন্ন প্রকার শিল্প সাধনায়ও গৈলা গ্রামের অনেকে আত্ম নিযোগ করেন। নরসিংহ দাশের বাড়ির জিতেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত চিত্র শিল্পী ছিলেন। মূর্ত্তি নির্মাণেও তিনি পটু ছিলেন। রামমোহন দাশের বাড়ির চিত্রশিল্পী প্রিয়নাথ দাশ গুপ্ত অঙ্কিত 'মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব কর্ত্তৃক কুষ্ঠরোগী বাসুদেবের উদ্ধার' এবং 'শ্রীকৃষ্ণ' নামক চিত্র দুইখানি এক কালে বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। শঙ্কর গুপ্তের বাড়ির শচীন্দ্র নাথ গুপ্তের কন্যা গীতি ও কানাই গুপ্তের বাড়ির সুধাংশু গুপ্তের কন্যা মঞ্জুশ্রী ভূদৃশ্যাবলী ও অন্যান্য প্রকার সুন্দর চিত্র আকিতেন। গোলার পাড়ের অমিয় ভূষণ গুপ্তের কার্টুন ছবি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট (ব্যবহারিক শিল্পী) হিসাবে কবীন্দ্র বাড়ির শুভঙ্কর দাশ গুপ্ত দক্ষতা অর্জন করিয়াছেন।

সুদক্ষ ফটোগ্রাফার হিসাবে রামকমল দাসের বাড়ির মথুর দাসের বিশেষ খ্যাতি ছিল। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রামে একমাত্র তিনিই ফটোগ্রাফার হিসাবে নাম করেন।

মৃৎশিল্পী হিসাবে জিতেন্দ্র নাথ পূততুণ্ড খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। মাটির মূর্তি গড়িয়া তাহার প্ল্যাষ্টারের ছাঁচ লইয়া ঐ ছাঁচে তিনি ব্রোঞ্জ বা মাটির মূর্তি গড়িয়া থাকেন। মাটির মূর্তিতে পরে উপযুক্ত রং লাগান হয়। সম্প্রতি তিনি সমগ্র রামায়ণের কাহিনী রিলিফ মানচিত্রের ধরনে রূপায়িত করিয়াছেন।

দাশের বাড়ির ছোট হিস্যার পার্থসারথি দাশ গুপ্ত উৎকৃষ্ট মাটির মডেল তৈয়ারী করিতেন।

সিহিপাশার হরকুমার পাল ও অনন্তকুমার পাল দেবভাবব্যঞ্জক সুন্দর প্রতিমা গড়িতে পারিতেন।

পূব সেনপাড়ার চন্দ্রকান্ত সেন (কান্তমশায়) বাঁশ, বেত ও কাঠের সাহায্যে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য খচিত নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈয়ারী করিতে পারিতেন।

মঠবাড়ির গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় (গণ্ডী) সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন ও ভাল বাজাইতে পারিতেন। ঐ বাড়ির চন্দ্রকুমার গাঙ্গুলীর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে গভীর জ্ঞান ছিল। আকাশবাণীর শিল্পী হিসাবে আধুনিক গান, কীর্ত্তন ও অন্যান্য সঙ্গীতে কানাই গুপ্তের বাড়ির গীতা গুপ্ত (দাশ গুপ্ত), মীরা গুপ্ত (দাশ গুপ্ত) ও নাজির বাড়ির কৃষ্ণা দাশ গুপ্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পুরান বাড়ির অমিয় কুমার দাশ গুপ্ত হিজ মাষ্টারস্ ভয়েস্ ও কলম্বিয়া রেকর্ডে গান দিয়া থাকেন।

কালুপাড়া সেনদের উত্তরের বাড়ির বিজয়রতন সেনের কন্যা অরুণা সেন এলাহাবাদ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় হইতে 'সঙ্গীত প্রভাকর' উপাধি প্রাপ্ত হ'ন।

সুনীল মুখোপাধ্যায়ের (দক্ষিণ গৈলা) আধুনিক সঙ্গীতে সুনাম আছে।

বৈদ্যের বাড়ির রজনীকান্ত দাশ গুপ্তের রামায়ণ, মহাভারত ও ভগবদ্গীতার কথকতা মধুর ও প্রাণস্পর্শী ছিল।

পিপলাই বাড়ির পশ্চিমের হাউলীর অক্ষয়কুমার পিপলাই উৎকৃষ্ট বাদক ছিলেন।

নট্টদের মধ্যে রজনী নট্ট ও যোগেন্দ্র নট্ট নামকরা বাদ্যকর ছিলেন। নট্টপাড়ার অমর সানদার ভাল সানাই বাজাইতে পারিতেন।

নিমদাশের বাড়ির অজিত কুমার দাশ গুপ্ত মনিপুরী নৃত্যকলায় পারদর্শী ছিলেন।

পুরান বাড়ির সতীশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত একজন বিশিষ্ট অভিনেতা ছিলেন। ফিল্ম ডাইরেক্টর হিসাবেও তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

বিভিন্ন জনহিতকর প্রচেষ্টা

উনবিংশ শতাব্দের তৃতীয় পাদে দাশের বাড়ির বড় হিস্যার রামচন্দ্র দাশ, পিপলাই বাড়ির দুর্গাচরণ পিপলাই ও শঙ্কর গুপ্তের বাড়ির দুর্গানন্দ গুপ্ত প্রভৃতি গ্রামের রাস্তা নির্মাণ, খাল খনন এবং অনুরূপ কার্যে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন এবং তাঁহাদের চেষ্টায় গ্রামে রাস্তা ও খালের কিছু উন্নতি হইয়াছিল। মনসা বাড়ির প্রাচীন দীঘি সংস্কারও তাঁহাদের চেষ্টায় সাধিত হইয়াছিল।

পরে কালুপাড়ার বিশ্বেশ্বর সেন, শঙ্কর গুপ্তের বাড়ির প্যারীমোহন গুপ্ত ও শ্যামাচরণ গুপ্ত, পূব সেনপাড়ার আনন্দ চন্দ্র সেন ও নিমদাশের বাড়ির ললিত মোহন দাস প্রভৃতি দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে "ছাত্র সম্মিলনী সভা" নামে এক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন এবং উহার মাধ্যমে গ্রামের মধ্যে উচ্চ আদর্শ প্রচারিত হয়। সভায় তাঁহারা দেশপ্রেম প্রচার করিতেন ও স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতেন ও সামাজিক কুপ্রথার (যথা বিবাহে পণ গ্রহণ) বিরুদ্ধে মত সৃষ্টি করিতেন। সকলের

নৈতিক মান উন্নত করার চেষ্টা করিতেন ও মাদক দ্রব্য বর্জনের জন্য সচেষ্ট থাকিতেন। উহার বার্ষিক অধিবেশনে "কাপায়ে মেদিনী, কর জয়ধ্বনি, জাগিয়া উঠুক মৃত প্রাণ" প্রভৃতি গান গাহিয়া লোকের মনে চেতনা সঞ্চার কবাব চেষ্টা হইত।

পরে পাড়ায় পাডায় ছোট ছোট সভা সমিতি গড়িয়া উঠিতে থাকে। তাহাদের কার্য্যক্রম প্রায় একই রকম। সভাপতি ধর্ম ও চরিত্র সংগঠন বিষয়ে উপদেশ দিতেন। ভক্তিযোগ বা অন্য কোনও ধর্ম গ্রন্থ হইতে কিছু পাঠ হইত। ভক্তিমূলক গান খোল করতাল সহযোগে গীত হইত এবং সভ্যদের মধ্যে কেহ কেহ কিছু বলিতেন। ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ছেলেদের ধর্মবোধ জাগ্রত করা, নৈতিক মান উন্নত করা এবং কর্ত্তব্যে দৃঢ করা।

ইহার মধ্যে কোনও কোনও সভা স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বে আরম্ভ হইলেও অধিকাংশই স্বদেশী যুগের প্রভাবে ও শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়।

প্রথমে এই জাতীয় সভা হয় দাশের বাডিতে, মাহিলাড়া নিবাসী হরিচরণ সেনেব উৎসাহে। ঐ সভার নাম ছিল চরিত্রসংশোধনী সভা। পবে চৌধুরী হিস্যার সীতা নাথ দাশ গুপ্ত (শীতল বাবু) 'বালক সমিতি' নামে এক সভা কবেন। তিনি স্কুলে 'সানডে সার্ভিস' একই উদ্দেশ্যে ও কার্যধারা নিয়া স্থাপিত করেন। ফুল্লশ্রীতে বামন চন্দ্র ভট্টাচার্যের উদ্যোগে 'বাল্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠা হয়। কৈলাস বাবু হেডমাষ্টার প্রমুখ ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বকশী বাড়িতে অনন্ত গুপ্তের নেতৃত্বে 'হরিসভা' স্থাপিত হয়। মনসা বাড়ি কেন্দ্র করিয়া 'দেবালয় সমিতি' গঠিত হয়। ইহার উদ্যোক্তা ছিলেন রামমোহন দাশের রাড়ির ক্ষীরোদ চন্দ্র দাশ গুপ্ত, তুহিসেনের বাড়ির রমেশ চন্দ্র সেন ও প্রিয়নাথ দাশ গুপ্ত প্রভৃতি। ইহাদের উদ্যোগে কবি বিজয় গুপ্তের পরিত্যক্ত বাস্তু ভিটার উপর দেবালয় সমিতির গৃহ নির্মিত হয় ও সেখানে এক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পূব পাড়ায় কবীন্দ্র বাড়িকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে 'বালক সমিতি'।

নিমদাশের বাড়ির মনোমোহন দাশ গুপ্ত, হরি গুপ্তের বাড়ির বিভূতি ভূষণ গুপ্ত ও কেশব চন্দ্র সেন গুপ্ত, কবীন্দ্র বাড়ির মাখন দাশ গুপ্ত প্রভৃতি ইহার উদ্যোগী ছিলেন। কালুপাড়াকে কেন্দ্র করিয়া তারকেশ্বর সেন, সুশীল চন্দ্র সেন প্রভৃতির উদ্যোগে আর একটি 'বালক সমিতি' গঠিত হয়। সিহিপাশা আচার্য বাড়িতে ঐ অঞ্চলের ছেলেদের জন্য এক সভা গঠিত হইয়াছিল। তর্কবাগীশের বাড়িতে যোগেশ শীলের উদ্যোগে একটি সভা স্থাপিত হইয়াছিল। পিপলাই বাড়িতে বেজের পাড়ের কৃষ্ণ কুমার ভট্টাচার্য প্রভৃতির উদ্যোগে 'সানডে মর্ণিং সার্ভিস' ও ব্যায়াম সমিতি গড়িয়া উঠে। ইহার উদ্যোক্তাগণ যাতায়াতের সুবিধার জন্য বেজের পাড়ের পার্শ্ববর্ত্তী বেড় হইতে মাটি কাটিয়া লম্বা এক রাস্তা তৈরী করেন। খরচ সংকুলানের জন্য তাঁহারা পাড়ার মধ্যে মুষ্টি ভিক্ষার ঘট স্থাপন করিয়াছিলেন। ফলে এদিকে পুলিসের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় ও সেক্রেটারি কৃষ্ণ কুমার ভট্টাচার্যকে পালরদি থানায় নিয়া যাওয়া হয়। সেখান হইতে বহু চেষ্টায় তিনি মুক্তি লাভ করেন।

পরে বেজের পাড় কালী বাড়িতেও কৃষ্ণ কুমার ভট্টাচার্যের উদ্যোগে অনুরূপ এক সমিতি হয়। সমিতির সভ্যেরা লোকের অসুখে সেবা শুশ্রূষা করিতেন। ইহারা এক অবৈতনিক পাঠশালাও কালীবাড়িতে খুলিয়াছিলেন। উপরোক্ত সভা সমিতিগুলি ছেলেদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ও দেশের কাজের জন্য আগ্রহ সঞ্চার করিয়াছিল এবং পরমুখাপেক্ষী না হইয়াও নিজেদের কাজ করিতে শিখাইয়াছিল।

এই সব ছোট ছোট সভা সমিতিকে স্বদেশী আন্দোলনের এবং ইংরেজী শিক্ষার ফল বলা যায়। বাল্যাশ্রমের পরে ফুল্লশ্রী মজুমদার বাড়ির প্রেম কুমার, কালিপদ ও প্রাণকুমার সেন এবং রাজেন্দ্র চক্রবর্তী, প্রমথ দাস ও প্রফুল্ল কুমার দাশ গুপ্ত প্রভৃতির উদ্যোগে 'ফুল্লশ্রী বিজয় গুপ্ত সমিতি' নামে এক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। ক্রীড়া কৌতুক ও নাট্যানুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে লোককে সংঘবদ্ধ করা ছিল ইহার উদ্দেশ্য। ইহাদের চেষ্টায়

১৯৩১ সালে মজুমদার বাড়িকে কেন্দ্র করিয়া দাশ ঠাকুরের বাড়ি, কবিরাজ বাড়ি ও নরসিংহ দাশের বাড়ি সমূহের বহির্বাটি ও প্রশস্ত প্রাঙ্গনে ৭ দিন ব্যাপী বড এক কলাশিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উহাতে বহুবিধ কুটীর শিল্প ও চিত্রাদি সংগৃহীত হইয়াছিল এবং যুবকগণ নানারকম ক্রীড়া কৌশল দেখাইয়াছিল। বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস সেণ্টার হইতে স্বাস্থ্য বিষয়ে চলচ্চিত্র দেখান হইয়াছিল। চারিদিক হইতে বহু সংখ্যক লোক স্থল পথে ও নৌকা যোগে আসিয়া প্রদর্শনীটি সাফল্য মণ্ডিত করিয়াছিল। এই সমিতি পরে এক সমবায় প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা করিয়াছিল কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য উহা কার্যকরী হয় নাই।

গৈলা সুহৃৎ সমিতি

কালুপাড়ার বিশ্বেশ্বর সেন হুগলির এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইন্‌স্‌পেকটর অব স্কুলস থাকা কালে ১৯০২-৬ সালে কলিকাতা প্রবাসী গৈলাবাসীদের মধ্যে সৌহৃদ্য বৃদ্ধি ও সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে 'গৈলা সুহৃৎ সমিতি' নামে এক সমিতি স্থাপন করেন। মাঝে মাঝে ইহার সভা হইত। তখনকার দিনে গৈলায় অনেক বাড়িতে দুর্গাপূজার সময় মহিষ বলিদান হইত। বলির পরে মুচিরা মহিষের চামড়া ছাড়াইয়া নিয়া ধড়টা গ্রামের খালের মধ্যে ফেলিয়া যাইত। ফলে যেমন হইত জল দূষিত তেমনি চারিদিকে দুর্গন্ধ ছড়াইয়া পড়িত। গৈলা সুহৃৎ সমিতির উদ্যোগে কয়েকটি কলেজের ছাত্র পূজার সময় বাড়ি বাড়ি গিয়া বাড়ির কর্তাদের বলিয়া কহিয়া মুচিদের দ্বারা সম্পূর্ণ কাটা মহিষটা পালরদির নদীতে নিয়া ভাসাইয়া দিবার ব্যবস্থা করেন। তারপর হইতেই আর কোনও দিন গ্রামের মধ্যে মহিষের চামড়া ছাড়ান হইত না। স্বল্পায়ু সুহৃৎ সমিতি গ্রামের এই স্থায়ী উপকার করে। বিশ্বেশ্বরবাবু হুগলী হইতে বদলি হওয়ার পর বোধ হয় ১৯০৮ সালে এই সভা উঠিয়া যায়।

গৈলা স্টুডেন্টস ফাণ্ড

গ্রামে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাব পর হইতেই ছেলেদের ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়াশুনা করিতে কোন বিশেষ অসুবিধা হইত না কিন্তু কলেজের বেতন, ভর্তি বা পরীক্ষার ফিস্ সংগ্রহ করিতে অনেকে নিতান্ত অসুবিধায় পড়িত।

বিগত ১৯১১ সালে পূব সেনপাড়ার সতীশ চন্দ্র সেন নামে একটি ছেলে গৈলা স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া পড়ার জন্য কলিকাতায় আসিয়া গ্রামের ললিত মোহন দাসেব (নিমদাশের বাড়ি) নিকট নিজ দুরবস্থার কথা জানায়। তিনি তখন ঐ ছেলেটিকে সাহায্য দানের জন্য কালুপাড়াব (তৎকালীন কটকের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার) মধুসূদন সেন মহাশয়কে চিঠি দেন। উত্তরে মধুবাবু ঐ ছেলেটিকে মাসিক সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুতি দেন এবং জানান যে গৈলার ছেলেদের কলেজের পড়াব সাহায্যেব জন্য যদি কোনও স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়া হয় তিনি তাহাতে মাসিক ১০৲ হারে সাহায্য দিবেন। ললিতবাবু তখন কলিকাতাস্থ গৈলাবাসী কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনা কবেন এবং সকলের মতানুসারে ১৯১১ সালের অক্টোবর মাসে গৈলা স্টুডেন্টস ফাণ্ড (Goila Students Fund) ঐ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। সাত জন সভ্য নিয়া একটি কমিটি গঠিত হয় ও কালীপ্রসন্ন পিপলাই ইহার সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। ললিতবাবুর উপদেশ ও পরামর্শ অনুসারে সেক্রেটারি কার্য করিতেন।

ছেলেদের সাহায্য দেওয়া আরম্ভ হওয়ার কয়েক মাস পরে কোনও কারণে মধুবাবু কটক হইতে কলিকাতা আসেন এবং সেক্রেটারির কলেজ মেসে নিজ হইতে আসিয়া তাঁহার স্বীকৃত চাঁদার পরিমাণ বাড়াইয়া মাসিক ১৫৲ দিতে স্বীকার করেন এবং পরের মাস হইতে যতদিন ঐ ফাণ্ড ছিল ঐ হারে চাঁদা দিয়া আসিয়াছেন। গ্রামের অন্যান্য অনেকেও

চাঁদা দিতেন। প্রথম বৎসর চাঁদা দাতার সংখ্যা ছিল ৫৫, পরে ঐ সংখ্যা ৮০তে দাঁড়ায়। গ্রামের বিবাহাদি অনুষ্ঠানেও কিছু পাওয়া যাইত। তখন চাঁদার পরিমাণ ছিল অল্প। এই ভাবে মধুবাবুর ১৫৲ এবং গড়ে অতিরিক্ত ২৩৲ মোট মাসিক ৩৮৲ চাঁদা উঠিত। তখন সিটি, রিপন (সুরেন্দ্রনাথ), মেট্রোপলিটান (বিদ্যাসাগর) বা বরিশালের কলেজের মাসিক ছাত্র বেতন ৩ বা ৪ টাকার অধিক ছিল না। সেজন্য সাহায্যের পবিমাণ এখনকার মত দরকার হইত না। যে ৬ বৎসরেব কিছু বেশি এই ফাণ্ড চলিয়াছিল তাহাতে মোট প্রায় ২৫০০৲ ছেলেদের ভর্তি ফিস, পরীক্ষার ফিস ও মাসিক বেতন বা বই বাবদ দেওয়া হইয়াছিল। গডে প্রতি বৎসর পুবানো ছাত্রদেব নিয়া ১১।১২ টি ছেলে এই সাহায্য পাইত। সর্বমোট ৩০।৩২টি ছেলে এই সাহায্য পাইয়াছে। কাহাকেও তখন মাসিক সাহায্য পাঁচ টাকার বেশি দেওয়া হইত না। সাহায্য প্রাপ্ত কয়েকটি ছেলে পরবর্তী জীবনে কৃতিত্বলাভ করিয়াছেন।

১৯১৭ সালের শেষের দিকে গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করার প্রস্তাব হয়। তখন দুইটি প্রতিষ্ঠানে মাসিক সাহায্য উপযুক্ত ভাবে উঠিবে না মনে করিয়া ১৯১৮ সাল হইতে এই ফাণ্ডের জন্য চাঁদা আদায় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং সঞ্চিত অর্থ দ্বারা আরও কয়েক মাস সাহায্য চালান হয়।

প্রতি বৎসর কলিক তায় গৈলাবাসীদের এক সভায় পরবর্তী বৎসরের জন্য কমিটি ও সেক্রেটারি নিযুক্ত হইতেন। ললিতবাবুর বাসাতেই কমিটির ও সাধারণ সভা বসিত এবং বুদ্ধি ও পরামর্শ দ্বারা কার্যত তিনিই ইহা পরিচালিত করিতেন। প্রথম কয়েকবৎসর কালী প্রসন্ন পিপলাই, পরে শঙ্কর গুপ্তের বাড়ির মনোরঞ্জন গুপ্ত ও রামমোহন দাশের বাড়ির ক্ষীরোদচন্দ্র দাশ গুপ্ত সেক্রেটারি ছিলেন।

বর্তমান গৈলা সম্মিলনী ছাত্র ভাণ্ডার এই ফাণ্ডের আদর্শে ও অনুকরণে গঠিত হইয়াছে।

চিকিৎসা ব্যবস্থা ও হাস-পাতাল স্থাপনপ্রচেষ্টা

ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের পর গ্রামের চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী (মধ্য গৈলা) ইংরেজী ১৮৯৩ সালে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এল-এম-এস পরীক্ষায় পাশ করেন ও গভর্নমেণ্টের চাকবি নেন। তাহার অনেক পর শরৎচন্দ্র সেন (গনেব ভিটা) মেডিক্যাল কলেজ হইতে এল-এম-এস পাশ করিয়া কলিকাতায় স্বাধীন ভাবে ব্যবসা আরম্ভ করেন। ইহার পর ক্রমে ক্রমে গ্রামের কয়েকজন এম বি পরীক্ষায় পাশ করেন কিন্তু সকলেই বিদেশে ব্যবসা করিতে থাকেন, গ্রামে থাকিয়া কোনও পাশ করা ডাক্তার ব্যবসা করিতেন না। মেডিক্যাল স্কুলে কিছু পড়িয়া দাশের বাডির ললিত চন্দ্র সেন, সিহিপাশার যদুনাথ চাটার্জি, ফুল্লশ্রীর মঙ্গল চন্দ্র দাশ, চৌধুরী বাড়ির ভুবন মোহন গুপ্ত, নিমদাশের বাড়ির নগেন্দ্র নাথ দাস, নরসিংহ দাশের বাড়ির অমূল্যচরণ দাশ গুপ্ত প্রভৃতি দেশে থাকিয়া ডাক্তারি ব্যবসা করিতেন। গ্রামবাসীরা তাঁহাদের উপরই নির্ভর করিত বা কবিরাজী চিকিৎসা করাইত।

তখন পুরানো কবিরাজদের মধ্যে নীলকমল সেন ও হরকুমার সেন (দুহিসেনের বাড়ি), প্রসন্নকুমার শীল ও কানাই গুপ্তের বাড়ির দুর্গাচরণ গুপ্ত জীবিত ছিলেন না। দেশে কবিরাজি চিকিৎসা করিতেন ললিত মোহন দাশ কবিসাগর (কবীন্দ্র বাড়ি), তারা প্রসন্ন শীল ও লক্ষ্মীচরণ শীল। সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ির রামনাথ ঠাকুর বিনা অস্ত্রে ঘা ও ক্ষতের

চিকিৎসা করিতেন কিন্তু সে বাবদ কোনও পারিশ্রমিক নিতেন না। তাঁহার পুত্র মাধব ঠাকুরও ঐ চিকিৎসা করিতেন। ১৯১৭ সালে একবার এম-বি পাশ করা একজন ডাক্তার গ্রামে বসাইয়া ডিসপেনসারি খোলার প্রস্তাব হইয়াছিল কিন্তু নানা কারণে তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই।

ইহার কয়েক বৎসর পর গনের ভিটার শরৎচন্দ্র সেন এল-এম-এস গ্রামে ব্যবসা আরম্ভ করেন। অনেক বৎসর পর গোলারপাড়ের রেনু-ভূষণ গুপ্ত এম-বি গ্রামে আসিয়া ব্যবসা আরম্ভ করেন, কিন্তু প্রসূতিদের জন্য কোনও ডাক্তার ছিল না।

গ্রামে কোনও সরকারী হাসপাতাল ছিল না। কাজেই গরিব লোকদের খুবই অসুবিধা হইত। ঊনবিংশ শতাব্দে বকশী বাড়ির রজনী বাবু বরিশাল ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান থাকা কালে তাঁহার চেষ্টায় গৈলা গ্রামের জন্য এক দাতব্য চিকিৎসালয় (Out-door dispensary) মঞ্জুর হয় কিন্তু শেষ পর্যান্ত ঐ প্রস্তাব কার্যকরী হয় নাই। প্রস্তাবিত চিকিৎসালয় নিকটবর্তী বাকাল গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ছিল। এই অভাব দূর করার জন্য ১৯৪৬ সালে বরিশাল শহরে শশিকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে গৈলাবাসীদের এক সভা হয় এবং গ্রামে এক হাসপাতাল ও প্রসূতিসদন প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহন করা ও এই উদ্দেশ্যে টাকা তোলার চেষ্টা আরম্ভ হয়। এই জন্য টাকা তোলা, গ্রামে জমি সংগ্রহ করা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার জন্য কালুপাড়ার কুমুদ বিহারী সেনকে সভাপতি, বকশী বাড়ির অতুলানন্দ দাশ গুপ্তকে সেক্রেটারি ও কালীপ্রসন্ন পিপলাইকে কোষাধ্যক্ষ করিয়া এক কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটি বরিশালের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহিত আলাপ আলোচনা করেন। কর্তৃপক্ষ জানান যে হাসপাতাল স্থাপনের উপযুক্ত জায়গা ও নগদ ২০০০০৲ যদি কমিটি যোগাড় করিয়া গভর্ণমেণ্টের হাতে দেন তবে গভর্ণমেণ্ট হইতে হাসপাতাল ও প্রসূতিসদন প্রতিষ্ঠিত হইবে ও মাসিক

খরচ গভর্ণমেণ্টই বহন করিবেন। তখন বরিশাল প্রবাসী গৈলাবাসীদের এবং গৈলা গ্রামের লোকেদের নিকট যাওয়া হয় ও কলিকাতার বাহিরে যে সব গৈলার লোক থাকিতেন তাঁহাদের এই বিষয় জানান হয় এবং মাসিক ১০০৲ টাকার অধিক আয়ের সকলকে প্রত্যেকের এক বৎসরের আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ (মাসিক ১০১৲ হইতে ৫০০৲ টাকা আয় পর্য্যন্ত বার্ষিক আয়ের শতকরা ২॥০ ও ৫০১ টাকার উপরের আয়ের জন্য শতকরা ৫৲) এককালীন দানস্বরূপ দিতে ও স্বীকৃত চাঁদার অর্ধেক পরিমিত টাকা পাঠাইবার জন্য অনুরোধ জানান হয়। অনেকেই আনন্দের সহিত এই প্রস্তাবে সম্মতি জানান ও নিজ নিজ প্রতিশ্রুত চাঁদার অর্ধেক পাঠাইয়া দেন। হাসপাতাল স্থাপনে গ্রামের লোকের উৎসাহ ও আগ্রহের দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অক্ষয় কুমার গুপ্ত (ছোট নয়া গুপ্তের বাড়ি) ও মধুসূদন ভট্টাচার্য (মঠবাড়ি) তাঁহাদের ছেলেদের নাম ও ঠিকানা হাসপাতাল কমিটির কোষাধ্যক্ষের নিকট দিয়া চাঁদার জন্য তাঁহাদের নিকট চিঠি দিতে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। অবশ্য এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

হাসপাতাল স্থাপনের জন্য কালুপাড়া সেনের বাড়ির দরজার মাঠ, রামনাথ দাশের বাড়ির দরজার মাঠ, স্কুলের দক্ষিণে খালের পূব পাড়ের জমি ও মুনশী বাড়ির দরজার জমি দেখা হইয়াছিল। রামনাথ দাশের বাড়ির দরজার জমির মালিকেরা কমিটির নামে দলিলও করিয়া দিয়াছিলেন। কালুপাড়ার দরজার জমির একজন মালিক আপত্তি করিতেছিলেন, অপর সকলে রাজী ছিলেন। হাসপাতাল ও প্রসূতিসদন প্রভৃতির জন্য কোন জমি সর্বোত্তম হইবে এই বিষয়ে আলোচনা চলিতেছিল, এই সময়ে ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের ও সমগ্র বরিশাল জিলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার ঘোষণা গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রকাশ করা হয়। তখন চাঁদাদাতাগণের মতানুসারে এ বিষয়ে

আর অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে না বিবেচনা করিয়া এই পরিকল্পনা ত্যাগ করা হয়।

তখন পর্য্যন্ত বরিশাল কেন্দ্রে কলিকাতার বাহিরের ৯৫০০৲ চাঁদার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছিল ও ৬০০০৲ সংগৃহীত হইয়াছিল। নানা কারণে কলিকাতার চাঁদা আদায় তখন পর্যন্ত আরম্ভ হয় নাই, মাত্র কয়েকশত টাকা আদায় হইয়াছিল। কলিকাতায় আদায়ী টাকা সহ সর্বমোট প্রায় ৬৫০০৲ সংগৃহীত হইয়াছিল। খরচ বাবদ নাম মাত্র টাকা কাটিয়া রাখিয়া বাকি সব টাকা চাঁদাদাতাগণকে প্রত্যর্পণ করা হয়। যাঁহারা বরিশাল শহরে থাকিতেন না তাঁহাদিগকে চেক্ দ্বারা বা মনি অর্ডার যোগে টাকা পাঠান হয়। এই ভাবে এই পরিকল্পনার সমাপ্তি ঘটে

সামাজিক আচার ব্যবহার

সামাজিক রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, আর্থিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে এবং স্বাভাবিক সংস্কারবশত সহজে পরিবর্তিত হয় না। সেই জন্যই ৭০।৭৫ বৎসর পূর্বেকার আচার ব্যবহার কিছু কিছু শিথিল হইলেও মোটামুটি ভাবে দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত তাহা প্রায় একই ভাবে চলিয়া আসিতেছিল। দেশ বিভাগের পর অবশ্য নানা কারণে অনেক পরিবর্তন আসিয়াছে।

গ্রামে লোকেরা সাধারণত ভোরে শয্যাত্যাগ করিত এবং অধিকাংশই সন্ধ্যার কিছু পরে নিদ্রা যাইত। অবশ্য মাঝে মাঝে কোনও

কোনও বাড়িতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত হরিসংকীর্ত্তন চলিত। সকাল বেলা বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম বা লক্ষ্মী গোবিন্দকে 'ঘুম হইতে জাগান' হইত ও শঙ্খধ্বনি হইত। সন্ধ্যা বেলায়ও ঐরূপ শঙ্খধ্বনি হইত। অনেক বাড়িতে তুলসীমঞ্চ ছিল এবং সন্ধ্যায় সেখানে প্রদীপ জ্বালান হইত।

শুভকার্যে উলুধ্বনি দেওয়া হইত সাধারণত তিন ঝাঁক (বার)। পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলে সাত ঝাঁক ও কন্যা জন্মিলে ৫ বার। শুভকার্যের ভোরে অন্যান্য স্থানের ন্যায় উলুধ্বনি সহকারে দধিমঙ্গল করা হইত। স্ত্রীলোকেরা; কয়েক জন মিলিয়া সময়োপযোগী গান গাহিতেন। (যেমন অন্নপ্রাশন উপলক্ষে "বসিলেন মা হেমবরণী হেরম্বেরে ল'য়ে কোলে' ইত্যাদি)। এইরূপ গান দধিমঙ্গলের সময় ব্যতীত অন্য সময়েও করা হইত।

সাধারণত শুভকার্যের কয়েকদিন পূর্বেই ভিন্ন গ্রামের আত্মীয় ও আত্মীয়ারা আসিতেন এবং নিজেদের বাড়ির মতই খুব খাটিতেন। কার্য্য শেষেব কয়েকদিন পরে নিজ নিজ বাড়ি ফিরিতেন। যে সব আত্মীয়া স্ত্রীলোক আসিতেন তাঁহাদের এক এক খানা সাধারণ শাড়ি কাপড় দেওয়া হইত। অনেক সময়েই বিবাহ, বাসি বিবাহ ও ফুলশয্যা মেয়ের বাড়িতেই হইত। যাতায়াতের সুবিধার জন্য বিবাহাদি অনুষ্ঠান অনেকক্ষেত্রে বর্ষাকালে সম্পন্ন হইত। 'ব্যবহার' (উপহার) দেওয়া একান্ত আত্মীয়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু উপনয়ন উপলক্ষ্যে অনেক অনাত্মীয়াও ব্রতভিক্ষা দিতেন।

বিবাহাদির সময়ে, বিশেষত মাতৃ পিতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে অনেক লোককে ভোজন করান হইত। নিমন্ত্রন রান্নাও মাঝে মাঝে স্ত্রীলোকেরাই সম্পন্ন করিতেন। উৎকৃষ্ট রান্নার জন্য কয়েক জনের বিশেষ খ্যাতি ছিল।

নিমন্ত্রন দিবাভাগেই সম্পন্ন হইত। ভাতই ছিল প্রধান খাদ্য (লুচি নয়)। আরম্ভ হইত তিতার খেসারী ডাইল দিয়া, শেষ হইত পায়সে। অন্য

পদের মধ্যে আরও ৩টি ডাইল থাকিত। পূজার সময়ের নিমন্ত্রনে খিচুড়ী, কচুকাচকলার তরকারি ও পাকা শশার অম্বল প্রায় অপরিহার্য ছিল। বড় নিমন্ত্রনে মাংস, পোলাও, সন্দেশ, রসগোল্লা, অমৃতি, দধি প্রভৃতি থাকিত। যাঁহারা অনেক খাইতে পারিতেন নিমন্ত্রন বাড়িতে তাঁহাদের খুব আদর ছিল। নিমন্ত্রনে নিরামিষ খাওয়ানের নিয়ম ছিল না। সম্ভব হইলে শ্রাদ্ধে মাংস করা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া গণ্য হইত। ছোলা বা মুগ ডালে বা খিচুড়ীতে নারিকেল কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া দেওয়া হইত। পাঁপড়ের ব্যবহার ছিল না। কোনও কোনও ভূম্যধিকারীদের বাড়িতে এই সব নিমন্ত্রনে নিম্নশ্রেণীর প্রজারাও (তাহাদের সংখ্যা বেশ প্রচুরই থাকিত) অন্যান্যদের মত ভোজনে অংশ গ্রহণ করিত।

রোজকার খাওয়ায় ডাল ও মাছ থাকিত। তরকারি অনেক সময় কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া ডাইলের বা মাছের ঝোলের মধ্যে দেওয়া হইত। অনেক সময় রান্নাতে নারিকেল কোড়াইয়া বা কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া দেওয়া হইত। বিধবাদের রান্নায় নারিকেল অবশ্য-ব্যবহার্য ছিল। দুধ শিশুরা ও বৃদ্ধ লোক ব্যতীত মধ্যবয়স্কেরা বিশেষ পাইত না। স্ত্রীলোকেরা সকালে পান্তা ভাত শুকনা ডাইল বা কলা, কাঁচালঙ্কা ও গুড় সহযোগে খাইতেন। গরিব লোকেরা ডাইল বিশেষ খাইতেন না, মাছই পুকুর বা খাল হইতে ধরিয়া খাইতেন। মাছ ধরিবার সরঞ্জামও ছিল নানাবিধ—জাল, বড়শি, কোচ, একনালা, জোতি, চাই, গড়া প্রভৃতি। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই জাল ও বড়শি থাকিত এবং সারা বৎসরই মাঝে মাঝে উহার ব্যবহার হইত।

বর্ষাকালে নূতন জলের সহিত অনেক রকম মাছ আসিত। তাহা ধরার জন্য খালে 'গড়া' পাতা হইত অর্থাৎ খালের একদিক হইতে অপর দিক পর্যন্ত বাঁশের চটা দিয়া এমন ভাবে বেড়া দেওয়া হইত যে, যে কোনও মাছই সেই খালে আসিত তাহাই গড়ার মধ্যে বসান চাইয়ের ভিতর ঢুকিতে বাধ্য হইত। চাই প্রস্তুত প্রণালী এমন ছিল যে

তাহার মুখ দিয়া মাছ ঢুকিতে পারিত কিন্তু বাহির হইতে পরিত না। সকাল বেলা চাই হইতে মাছ বাহির করিয়া নেওয়া হইত।

কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে পুঁটি, সরপুটি, কই, ফলি প্রভৃতি মাছ ধরার জন্য বড়শির ব্যবহার খুব বেশি হইত। পৌষ মাঘ মাসে জল কমিয়া গেলে পুরানো পুকুর ও খাল ডাঙ্গা অর্থাৎ বেড়ের দুই মুখ বন্ধ করিয়া অনেকে একত্র হইয়া সেখানকার মাছ ধরিত। ইহাকে স্থানীয় ভাষায় 'পুকুর ভাঙ্গা' 'বেড় ভাঙ্গা' প্রভৃতি বলা হইত। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা অনেক সময় বাড়ির বাহির হওয়ার কালে একটা জোতি (মাছ ধরিবার একরকম যন্ত্র) নিয়া বাহির হইত, যাতায়াতের সময় খালে মাছ দেখিলে উহা দিয়া ধরিয়া নিয়া যাইত।

যে কেন লোক বাড়ি আসিলেই তামাক দেওয়া হইত। তামাক প্রায় সকলেই খাইত। ব্রাহ্মণদের হুঁকা পৃথক থাকিত। বৈশ্য বা কায়স্থদের জন্য পৃথক হুঁকা থাকিত। তামাক, কল্কি ও একটা মালসায় তুষের আগুন থাকিত। নারিকেলের শুকনা ছোলা দিয়া কল্কির উপরে আগুনের ব্যবস্থা করা হইত। বিশিষ্ট লোক আসিলেই পান দেওয়া হইত। চা পানের প্রচলন ছিল না। সধবা স্ত্রীলোক বাড়ি আসিলে তাহাকে পান দেওয়ার নিয়ম ছিল ও কপালে ও সিঁথিতে সিন্দুর পরাইয়া দেওয়া হইত।

আতুর ঘর সাধারণত নিজ নিজ বাড়ির উঠানে নির্মাণ করা হইত। উহাতে কোন প্রকারে চাল ও হোগলা পাতার বেড়া থাকিত এবং উহার ভিটা উচু হইত না। এ ঘরগুলি শীত বা গ্রীষ্ম বিশেষ নিবারণ করিতে পারিত না এবং অস্বাস্থ্যকর হইত। প্রসূতিরা সাধারণত এই ঘরে ৬ দিন থাকিত ও পরে আর এক ঘরে (ছেলেদের বেলায় ২১ দিন ও মেয়েদের বেলায় ১ মাস) থাকিত। এই সময় পর্যন্ত প্রসূতিকে অশুচি বলা হইত।

ব্রাহ্মণের উপনয়ন ১০।১১ বৎসরের মধ্যেই হইত। পরে বয়স ১৬

পর্যন্ত উঠিয়াছিল। ১০ দিন ব্রহ্মচারী অবস্থায় দিনে নিরামিষ ও রাত্রে ফল মূল দুগ্ধ আদি খাইয়া থাকিতে হইত। পরে ১০ দিন কমিয়া ৩ দিনে দাঁড়াইয়াছিল। বৈদ্যদের মধ্যে প্রথমদিকে উপনয়নের বড় নিয়ম ছিল না। পরে আরম্ভ হয়। প্রথমে বৈদ্যেরা ৩০ দিন অশৌচ পালন করিতেন কিন্তু যাঁহারা পৈতা নিতেন তাঁহাদের অশৌচ ছিল ১৫ দিন। পরে সকল বৈদ্যের মধ্যে উপনয়ন প্রথা ও ১০ দিন অশৌচ গালন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল। কায়স্থদের মধ্যেও কেহ কেহ উপবীত গ্রহণ করিতেন ও ক্ষত্রিয়াচারে দ্বাদশ দিন অশৌচ পালন করিতেন।

মেয়েদের বিবাহ খুব অল্পবয়সেই হইত। বয়ঃসন্ধির সময় পুনরায় বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইত। ইহাকে "পুনর্বিবাহ" বা "দ্বিতীয় বিবাহ" বলা হইত। পূর্বে কুলীন বাদে প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই কন্যাপণ প্রথা ছিল। মেয়েদের বয়স যত বাড়িত পণের পরিমাণও ততই বেশি হইত। উপযুক্ত সময়ে পণের টাকা সংগ্রহ না করিতে পারার জন্য অনেক পুরুষের বিবাহ অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সে সম্পন্ন হইত। ইংরেজী শিক্ষিতদের মধ্যে কন্যাপণের পরিবর্তে বরপণ প্রচলিত হয়।

পুত্র কন্যার বিবাহ সাধারণত গ্রামেই সম্পন্ন হইত। যাঁহারা বিদেশে থাকিতেন তাঁহারাও বিবাহ দেওয়ার জন্য দেশে আসিতেন।

বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরা শ্বশুর বাড়িতে মাথায় সর্বদা ঘোমটা দিতেন এবং শ্বশুর, ভাসুর প্রভৃতির সামনে সাধারণত আসিতেন না। ভাশুর ও মামাশ্বশুরকে কোনও প্রকারে স্পর্শকরা একান্ত নিষিদ্ধ ছিল। মেয়েরা কপালে সিঁন্দুরের টিপ ও সিঁথিতে সিন্দুর ব্যবহার করিত। সেমিজ, ব্লাউজ প্রভৃতির বিশেষ চল ছিল না, উহার প্রচলন হয় পরে। বিবাহিতা রমণীরা শাখা ব্যবহার করিত। দিবাভাগে স্বামীসম্ভাষণ দূষনীয় মনে হইত। নিতান্ত বৃদ্ধা ব্যতীত সব স্ত্রীলোকেরই মাথায় কাপড় থাকিত।

সাধারণত যৌথ পরিবার প্রথা প্রচলিত ছিল এবং রান্নাবান্না মেয়েরাই

করিতেন। পরিবারে প্রচুর লোক থাকিলে তাহাতে মেয়েদের খুবই পরিশ্রম করিতে হইত।

মৃত্যু সময় উপস্থিত হইলে যাহাতে ঘরের মধ্যে প্রাণ বিয়োগ না হয় সেজন্যে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হইত। "গতি করানর" জন্য অনেক বৃদ্ধ লোক নাড়ী দেখিয়া আসন্ন মৃত্যুর আনুমানিক সময় বলিয়া দিতে পারিতেন। তখন ঘরের বাহিরে তুলসী তলায় মুমূর্ষুকে নিয়া যাওয়া হইত। পায়ের কাছে ছোট একটি চতুষ্কোন গর্ত করিয়া সেখানে গঙ্গা জল রাখা হইত। মৃত্যুর পূর্বে 'রাম নাম' শুনান হইত ও প্রাণ বিয়োগ হইলে 'হরিবোল' বলা হইত। নিজ বাড়ির দরজায় শবদাহের ব্যবস্থা হইত। 'হরিবোল' ধ্বনি শুনিলেই আত্মীয় স্বজনেরা এবং স্বজাতীয় লোক অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় সাহায্য করিতে আসিতেন। বিশিষ্ট লোকের মৃত্যু হইলে ভিন্ন জাতীয় অন্য লোকও আসিত। চিতায় শবদেহের হাঁটু পিছন দিকে মুড়িয়া দেওয়া হইত এবং মাঝে মাঝে একজন উচ্চৈস্বরে "হরিবোল" এবং আর সকলে ততোধিক উচ্চে হরিবোল ধ্বনি দিত। উপস্থিত সকলেই চিতার উপর কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিত। দাহান্তে সকলেই এক এক কলসী জল চিতার উপর ঢালিয়া দিত এবং পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তিল তর্পণ করিত।

গ্রামে অনেক সময় দলাদলি থাকিত, এমনকি অনেক সময় আত্মীয় স্বজনেরাও খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন সামাজিক দলে থাকিত। কিন্তু দলাদলিতে সব-সময়ে বিশেষ শত্রুতা বুঝাইত না। এই দলাদলি খুব স্থায়ী ব্যাপারও ছিল না। কিছুকাল পরে দলের নেতাদের আবশ্যকমত দল পরিবর্তন হইত। ভিন্ন দলের লোকেরাও কোন কোন সময়ে কর্ম বাড়িতে আসিয়া কাজ কর্ম করিয়া দিত কিন্তু আহার্য গ্রহণ করিত না। কিন্তু শ্মশান বন্ধুদের বেলায় কোন দলাদলি ছিল না। দশ দিনের দিন সাধারণত সকল শ্মশান বন্ধুদের চিড়া, খই, দই, নারিকেল, মিষ্টি প্রভৃতি 'ফলার' খাওয়ান হইত। পরে শ্রাদ্ধের দিনে রীতিমত ভোজন করানো

হইত। শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন দক্ষিণা দেওয়া হইত। যাঁহাদের অবস্থা সচ্ছল ছিল তাঁহারা শ্রাদ্ধে 'ব্রাহ্মণ পণ্ডিত' নিমন্ত্রণ করিয়া 'বিদায়' (২৲ বা ৩৲ বা ৫৲) এবং যাতায়াতের খরচ ও 'সিধা' (চাল, ডাল, তরকারি, মাছ) ও কেহ কেহ গীতা বা নামাবলী প্রভৃতি দিতেন। ইহা বিশেষ পুণ্যকর্ম বিবেচিত হইত।

হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক

গৈলা গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল হিন্দু। মুসলমানের সংখ্যা ছিল খুবই কম। তাহাবা প্রায় নিবক্ষর কৃষিজীবী ছিল। গ্রামের চারিদিকের মৌজায় বহু মুসলমান বাস করিত। তাহাদেরও অধিকাংশ কৃষিজীবী ও দবিদ্র। এই সকল মুসলমানগণ প্রায় সকলই গৈলার তালুকদার শ্রেণীর ভদ্রলোকগণের প্রজা ছিল। প্রজা মনিব সম্বন্ধ বরাবরই প্রীতিপূর্ণ ছিল। নিরক্ষর দরিদ্র মুসলমানগণ গৈলার বাজারে হিন্দুদিগের নিকট জিনিষপত্র বিক্রয় করিত ও হিন্দু বাড়িতে অনেক সময় মজুর খাটিত। পরস্পরেব প্রতি উভয়েই নির্ভরশীল ছিল এবং হিন্দু মুসলমান সমস্যা বলিয়া এখানে কিছু ছিল না। সৌহৃদ্যের সঙ্গে সকলে বাস করিত। হিন্দু গৃহস্থ ঘরেব বয়স্কা স্ত্রীগণ এই সব মুসলমান প্রজা, মজুর বা বেপারিদের সঙ্গে বিনা দ্বিধায় কথাবার্তা বলিতেন এবং মুসলমানগণ তাহাদিগকে 'মা ঠারইন' 'বইন ঠারইণ' এবং বধূদিগকে 'বৌ ঠারইন' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। নোয়াখালির দাঙ্গা হাঙ্গামার পরে (১৯৪৬ সালে) বা দেশ বিভাগের পরে বরিশাল শহরে ও শহরের পার্শ্ববর্তী গ্রামে

যে সকল হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচার হইয়াছিল গৈলা গ্রাম সে সব হইতে একেবারে মুক্ত ছিল। এই উপলক্ষে উল্লেখযোগ্য যে দেশ বিভাগের ৮।১০ বৎসর পূর্বে একবার ভিন্ন জিলা হইতে কতক মোল্লা গ্রামে আসিয়া স্থানীয় মুসলমানগণকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু স্থানীয় মুসলমানদের দিক হইতে কোনও সাড়া না পাইয়া তাহাদের বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল।

কোন কোন মুসলমান প্রজা মনিব বাড়িতে দুর্গা পূজার সময় এক খানা 'ভেট' অর্থাৎ এক জোড়া নারিকেল এক ছড়া কলা, একটি শসা, চাল কুমড়া অথবা কুমড়া, একটি কচু ও কোনও কোন ক্ষেত্রে একখানা ইক্ষু দিত। একবার মুসলমান প্রজারা আসিয়া কোনও মনিবকে জানাইল যে তাহারা বরাবর 'ভেট' দিয়া আসিতেছে এবং এখনও দিতে ইচ্ছুক কিন্তু বিদেশ হইতে এক মৌলভী আসিয়া বলিতেছেন যে পূজায় 'ভেট' দেওয়া আর পূজা করা সমান এবং ইহাতে তাহাদের গুনাহ্ (অধর্ম) হয়, এ অবস্থায় তাহারা উপরোক্ত মৌলভীকে মনিব বাড়ি নিয়া আসিতে প্রস্তুত, যদি মনিব তাহাকে বুঝাইয়া দিতে পারে তাহা হইলেই সব গোলমাল চুকিয়া যায়। মনিব এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং মৌলভীও আসিলেন। পরস্পর আলাপ আলোচনার পর মৌলভী সাহেব তাঁহার পূর্বোক্ত মতে দৃঢ় থাকিলেন। তৎপর মনিব প্রজাদিগকে বলিয়া দিলেন যে তাহারা যদি পূজার সময় ভেট দেওয়া ধর্ম বিরুদ্ধ মনে করে তবে দেওয়ার দরকার নাই। ইহারচার বৎসর পরে উপরোক্ত মুসলমান প্রজারা তাহাদের মনিবকে পুনরায় জানায় যে তাহাদের 'ভেট' দেওয়া বিষয়ে আর কোনও প্রকার বাধা নিষেধ নাই, তাহারা পুনরায় ভেট দিতে আরম্ভ করিবে। এবং যে চার বৎসর 'ভেট' দেয় নাই সেই চার বৎসরের ভেটের মূল্য প্রতি বৎসর ১।০ হিসাবে পাঁচ টাকা মনিবকে দিয়া দিল। তৎপর হইতে পুনরায় পূর্বের মত 'ভেট' দেওয়া চলিত।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে পূজার সময় অনেক মুসলমান হিন্দু বাড়িতে

আসিয়া নারিকেলের সন্দেশ (লাড্ডু) ও বাতাসা, কলা প্রভৃতি খাইত। এই সব হইতেই হিন্দু মুসলমানের প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক বোঝা যাইবে। এই সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। হিন্দুদের দেশ ত্যাগে এই সব কৃষিজীবী, মজুর ও দোকানদার শ্রেণী প্রভৃতির মুসলমানগণ সুখী হইতে পারে নাই।

দেশ বিভাগের ফল

দেশ বিভাগের ফলে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার জন্য প্রথম অল্পসংখ্যক লোক দেশ ছাড়িয়া কলিকাতা অঞ্চলে আসে, কিন্তু দেশ যে একেবারে ছাড়িতে হইবে তখন তাহা কেহ মনে করে নাই। সকলেরই বাড়িতে বহু লোক রহিয়া গেল। পরে দুই দেশের মধ্যে যখন মনিঅর্ডার চলাচল বন্ধ হয় তখন যাহারা দেশে ছিল তাহাদের অধিকাংশই বাধ্য হইয়া দেশ ছাড়িল। ১৯৫০ সালের বরিশাল শহরে ও শহরের নিকটবর্তী গ্রামে ও অন্যত্র দাঙ্গা এবং হিন্দুর উপর অত্যাচারের ফলে গ্রামের লোক অত্যন্ত ভয় পায় ও দেশ একেবারে ছাড়িয়া কলিকাতা অঞ্চলে আসে। (এ স্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে গৈলা গ্রামে বা পার্শ্ববর্তী মৌজায় কোন দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় নাই)। কৃষিজীবী নমঃশূদ্র ব্যতীত অতি অল্পসংখ্যক হিন্দুই গ্রামে রহিল। বাড়ি ঘর, দালান কোঠা, তালুক ও জমা জমি সবই পড়িয়া রহিল। জিনিষপত্র বিক্রী করিতে অনেকেই চেষ্টা করিল কিন্তু গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী মৌজার মুসলমান সবই দরিদ্র কৃষিজীবী, তাহারা কোনও জিনিস কিনিতে অগ্রসর হইল না। ভাটি অঞ্চলের

কিছু কিছু মুসলমান বেপারি এখানে আসিয়া নাম মাত্র মূল্যে ঘরের টিন, খুঁটি, থালা, কলসী প্রভৃতি অস্থাবর সম্পত্তি কিনিল। ফলে একরূপ সর্বস্বান্ত হইয়া সকলে কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করে। যাহাদের আত্মীয়স্বজন এখানে চাকরি বা ব্যবসা উপলক্ষে বাস করিতেছিলেন তাহারা ঐ সব আত্মীয়ের বাসায় উঠিল, অনেকে বেশি ভাড়া দিয়া বাড়ি নিল, কেহ বা জবর দখল কলোনীতে, কেহ বা উদ্বাস্তু ক্যাম্পে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সকলের চেয়ে বেশি অসুবিধা হইল অন্যপ্রকার আয়হীন তালুকদার শ্রেণীর। যাহাদের পূর্ব হইতে চাকরি ছিল তাহাদের ততটা অসুবিধা হয় নাই। কিন্তু সকলেই নূতন করিয়া বাড়ি কবার সমস্যার সম্মুখীন হইল। কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জমির দাম তখন খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। ফলে খুব অল্পসংখ্যক যাহাদের সঞ্চিত অর্থ ছিল তাহারাই জমি কিনিয়া বাড়ি করে। অনেকেরই কর্জ করিয়া বাড়ি করিতে হইয়াছে। দেশ বিভাগের পর এই কয় বৎসরে এখন অনেকে জমি কিনিয়া বাড়ি করিয়াছে—যদিও বহুলোক নিতান্ত অসুবিধার মধ্যে দিন কাটাইতেছে। গৈলার এই সব লোকদের একস্থানে বাস করার সুযোগদানের উদ্দেশ্যে "গৈলা পুনর্বসতি সমিতি" নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল কিন্তু সমিতির প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাহার বিবরণ পরে দেওয়া হইল।

কলিকাতা আসার পর প্রথম কয়েক বৎসর অনেকে গ্রামের বাড়ির দুর্গাপূজা রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু ক্রমবর্ধমান আর্থিক অসচ্ছলতা ও দেশে টাকা পয়সা পাঠানোর অসুবিধা ও সর্বোপরি ভবিষ্যতে যে কোনও দিন দেশে ফিরিতে পারিবে এই বিষয়ে হতাশার জন্য ক্রমে ক্রমে বাড়ির পূজা বন্ধ করিয়া দেয়। গ্রামে পূর্বে প্রায় ২২৫ খানা দুর্গাপূজা হইত। এখন গ্রামে নাম মাত্র কয়েকখানি পূজা হয়। বর্তমান কলিকাতাবাসী গৈলার কয়েকজন এখানেই দুর্গাপূজা সম্পন্ন করিতেছেন।

স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে দেশে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ছোট বড় অসংখ্য চাকরির সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাতে গৈলার বহু লোক নিয়োগের বিষয়ে পূর্বে বলা হইয়াছে। স্বাধীন ভাবে ওকালতি, ডাক্তারি ও নানাবিধ ব্যবসা অনেকে করিতেছেন। ইঁহাদের পরিচয়ও পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। কুম্ভকার, নট্ট ও বাজনদার সম্প্রদায় প্রথম দিকে খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছিল, কিন্তু পরে নিজেদের জাতীয় ব্যবসায়ে প্রায় সকলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একান্নবর্তী পরিবার প্রথা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় প্রায় সকলকেই স্বাবলম্বী হইতে হইয়াছে।

গৈলা পুনর্বসতি সমিতি

দেশ বিভাগের ফলে গ্রামের যে সমস্ত লোক কলিকাতা অঞ্চলে চলিয়া আসে তাহাদের সুষ্ঠুভাবে পুনর্বাসন বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্ধারণ করার জন্য কানাই গুপ্তের বাড়ির হিমাংশু কুমার গুপ্ত ১৯৫০ সালের ১৬ই জুলাই তারিখে গৈলার কিছু লোককে তাঁহার বাড়িতে ডাকেন। সেখানে আলোচনার পর কলিকাতার শহরতলিতে গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে জমি সংগ্রহ করিয়া গ্রামের এই সব লোকদিগকে একত্রে বাস করার সুযোগদানের উদ্দেশ্যে 'গৈলা পুনর্বসতি সমিতি' স্থাপিত হয় ও তাহা আইনানুসারে রেজেষ্ট্রী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কল্যাণ কুমার দাশ গুপ্ত (বকশী বাড়ি) সভাপতি, হিমাংশু গুপ্ত সেক্রেটারি ও যতীশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত (দাশের বাড়ি, মেজ হিস্যা) সহকারী সেক্রেটারি নির্বাচিত হ'ন। পরে সমিতি রেজেষ্ট্রী করা হয়।

কলিকাতার আশে পাশে জমির খোজ নেওয়া হয় ও বেহালা মিউনিসিপ্যালিটির অধীন ঠাকুরপুকুর এলাকায় ৩এ বাস রুটের শেষ-প্রান্তে ডায়মণ্ড হারবার রোডের উপর কতক জমি বাসোপযোগী মনে করিয়া ঐ জমি মালিকদের নিকট হইতে নিয়া সমিতিকে

হস্তান্তর করার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা হয়। গভর্ণমেণ্ট ঐ জমির একটা প্ল্যান দিতে বলেন। সমিতির পক্ষ হইতে শচীন্দ্র নাথ গুপ্ত ঐ প্ল্যান তৈরী করেন ও উহা দাখিল করা হয়। সাধারণ ভাবে ঐ প্ল্যান অনুমোদন করিয়া গভর্ণমেণ্ট প্রায় ৩৬ বিঘা জমি দিতে রাজী হ'ন ও বিস্তারিত একটি প্ল্যান চাহিয়া পাঠান। রাস্তা, ড্রেন ও পুকুরাদি বাদে প্রায় ৪ কাঠা বিশিষ্ট ২২২টি প্লটের একটি বিশদ প্ল্যান শচীন্দ্র বাবু দাখিল করেন। গভর্ণমেণ্ট উহা মঞ্জুর করেন এবং মালিকদের উপর জমির অধিকার নোটিশ (Land acquisition notice) দিতে রাজী হ'ন। ১৯৫৪ সালের জুন মাসে গভর্ণমেণ্ট জানান যে প্রস্তাবিত জমির সম্পূর্ণ মূল্য দাখিল না করিলে জমি অধিকারের নোটিশ দেওয়া হইবে না। মালিকদের উপর নোটিশ দেওয়ার কতকাল পরে জমি পাওয়া যাইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে সমিতির চেষ্টা সত্ত্বেও মাত্র ৪২ প্লটের বেশির গ্রাহক পাওয়া গেল না। গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে এ বিষয়ে বহু লেখালেখি হয় এবং তদানীন্তন সেক্রেটারি শচীন্দ্র বাবু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অনেক আলোচনা করেন, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ টাকা না পাইলে জমি অধিকারের নোটিশ মালিকদের উপর দিতে স্বীকৃত হ'ন না। অনেকেই কত দিনে জমি দখল পাওয়া যাইবে ঠিক বুঝিতে না পারিয়া আর অগ্রসর হইল না। এ দিকে মোট ৪২ জন গ্রামবাসীর নিকট হইতে মোট ৪২০০০ টাকার কিছু বেশি আদায় হইয়াছিল কিন্তু তাহা দ্বারা সম্পূর্ণ জমির মূল্য পরিশোধ করা সম্ভব নয়। তখন ১৯৫৫ সালে বাধ্য হইয়া সমিতি গভর্ণমেণ্টকে সম্পূর্ণ মূল্য দেওয়ার অক্ষমতা ও জমি নেওয়ার দাবী পরিত্যাগ করার কথা জানাইয়া দেয় ও সমিতি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সমিতির প্রচেষ্টা এই ভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যাহারা মূল্য দাখিল করিয়াছিলেন খরচ বাবদ নাম মাত্র কিছু কাটিয়া রাখিয়া প্রায় সমুদয় টাকাই তাঁহাদের ফেরৎ দেওয়া হয়।

এই সমিতি স্থাপিত হওয়ার কয়েক মাস মধ্যেই হঠাৎ হিমাংশু কুমার গুপ্ত পরলোক গমন করেন। তখন নারায়ণ প্রসাদ দাশ গুপ্ত (দাশের বাড়ি, বড় হিস্যা) ও পরে শচীন্দ্রনাথ গুপ্ত সেক্রেটারি ও কল্যাণ বাবুর পর কালীপ্রসন্ন পিপলাই ও শ্রীমন্ত দাশ গুপ্ত (বকশী বাড়ি) সভাপতি ছিলেন।

গৈলা সম্মিলনী ও গৈলা সম্মিলনী ছাত্র ভাণ্ডার

অনেক বৎসর পূর্বে কলিকাতা প্রবাসী গৈলাবাসীদের মিলন কেন্দ্র স্বরূপ 'গৈলা সম্মিলনী' স্থাপিত হয়। ঐ সম্মিলনীর উদ্যোগে প্রতি বৎসর পূজার পর সকলে একত্র মিলিত হইতেন ও শুভেচ্ছাদি বিনিময় হইত। সামগ্রিক ভাবে গ্রামের উন্নতিকল্পে ইহারা আলোচনা করিতেন। বাংলা ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের সময় সম্মিলনীর সভাপতি কুমুদ বিহারী সেনের উদ্যোগে কলিকাতার গৈলাবাসীদের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিয়া গ্রামের দুঃস্থদের অনেক সাহায্য করা হইয়াছিল। সে সময় অবনী মোহন গুপ্ত ইহার সম্পাদক ছিলেন। তৎপর যুদ্ধের পরিস্থিতির জন্য ইহার কাজ কর্ম বন্ধ হইয়া যায়।

দেশ বিভাগের ফলে গ্রামের বহুলোক কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের এখানে একত্র বাস করার সুবিধার জন্য 'পুনর্বসতি সমিতি' স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ

সমিতির প্রচেষ্টা বিফল হওয়ার পর ১৯৫৬ সালে পুনরায় অবনী মোহন গুপ্তকে সভাপতি ও শচীন্দ্র নাথ গুপ্তকে সেক্রেটারি করিয়া গৈলা সম্মিলনীকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। প্রাক্তন গৈলাবাসীদের সর্ববিধ কল্যাণ সাধনই এই সম্মিলনীর উদ্দেশ্য। বর্তমান ইতিহাস প্রণয়নও গৈলা সম্মিলনীর উদ্যোগে সম্ভব হইয়াছে।

ইহার পর গ্রামের হিতকর কোনও স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ার কল্পনা কাহারও কাহারও মনে জাগে। ১৯৫৭ সালের ২০শে অক্টোবর পুজার পরের বার্ষিক সভায় কালীপ্রসন্ন পিপলাইয়ের প্রস্তাবে ও সর্বসম্মতি-ক্রমে গৈলা গ্রামের স্কুল ও কলেজের উপযুক্ত ও দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদিগকে আর্থিক সাহায্য দানে লেখাপড়া করার সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই সম্মিলনীর আনুষঙ্গিক 'গৈলা সম্মিলনী ছাত্র ভাণ্ডার' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সংকল্প গ্রহন করা হয় এবং তাঁহাকে কোষাধ্যক্ষ করিয়া একটি কর্মসমিতি বা কমিটি নির্বাচিত হয় ও কর্মনির্বাহের ভার কোষাধ্যক্ষের উপর দেওয়া হয়।

১৯৫৮ সালের প্রথম হইতেই এই ভাণ্ডারের কাজ আরম্ভ হয়। প্রথম তিন বৎসর সাহায্য দান কেবল কলেজ ও টেকনিক্যাল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তাহার পর হইতে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদিগকেও সাহায্য দান করা হইতেছে। ভর্তি ফিস, পুস্তকের মূল্য, স্কুল ও কলেজের বেতন এবং পরীক্ষার ফিস প্রভৃতি সব বাবদেই টাকা দেওয়া হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন যে সকল বই ছেলেদের নিকট হইতে ফেরৎ পাওয়া যায় তাহাও নূতন ছেলেদিগকে দেওয়া হয়।

১৯৫৮-৬৪ এই ৭ বৎসরে কলেজ ও পলিটেকনিকের ৭১ জন ছাত্র ও ৯ জন ছাত্রী ও স্কুলের ১৭ জন ছাত্র ও ৮ জন ছাত্রী—সর্বসুদ্ধ ১০৫ জন ছাত্রছাত্রী সাহায্য পাইয়াছে। পরীক্ষার ফল ভাল হইলে ক্রমাগত সাহায্য দেওয়া হইয়া থাকে। দুইজন ক্রমাগত ৬ বৎসর, ৮ জন ক্রমাগত ৫ বৎসর এবং অনেকে পরপর ৪ বৎসর সাহায্য পাইয়াছে। যে ছাত্রটি

সর্বাধিক সাহায্য পাইয়াছে সে পাইয়াছে মোট ৯৬০ টাকা। এই কয়েক বৎসরে ছাত্র ভাণ্ডার হইতে (পুরানো বই বাদে) সর্বমোট ২২, ৬৬৯ টাকা সাহায্য বাঁবদ দেওয়া'হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে স্কুল ফ্যাইন্যাল, হায়ার সেকেণ্ডারী, ইউনিভারসিটি ও টেকনিক্যাল স্কুলের বিভিন্ন পরীক্ষায় ৬৯ জন পাশ হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৩ জন গ্রাজুয়েট ও ৪ জন সাব-ইঞ্জিনিয়ার। সম্প্রতি অসচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের বিশেষ মেধাবী ছাত্রদের ঋণ হিসাবে সাময়িক সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে একটি ঋন ভাণ্ডার খোলার পরিকল্পনা তৎকালীন সভাপতি অমূল্যকুমার গুপ্ত করেন এবং এ বাবদ যথোপযুক্ত অর্থসাহায্য দিতে প্রতিশ্রুতি দেন। তদনুসারে ছাত্রভাণ্ডারের আনুষঙ্গিক এই রূপ একটি ঋণ ভাণ্ডার খোলার প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে।

প্রতি বৎসর পূজার পর বার্ষিক অধিবেশনে পরের বৎসরের জন্য কমিটি নির্বাচিত হয়। এই কমিটিই সাহায্যের উপযুক্ত ছাত্রছাত্রী মনোনয়ন করেন এবং প্রত্যেকের সাহায্যের ধরণ ও পরিমাণ নির্ধারণ করেন। ভাণ্ডারের জন্য অর্থসংগ্রহ, কমিটির নির্দেশমত টাকা দেওয়া ও আয় ব্যয়ের হিসাব রাখা কোষাধ্যক্ষের বিশেষ দায়িত্ব।

আবশ্যিক অর্থ গৈলার লোকেরাই চাঁদা হিসাবে দেন। গত কয়েক বৎসর বার্ষিক রিপোর্টে বিজ্ঞাপন ছাপিয়া কিছু টাকা পাওয়া গিয়াছে।

নূতন পর্যায়ে অবনী বাবুর পরে শ্রীমন্ত দাশ গুপ্ত, অতুলানন্দ দাশ গুপ্ত, শচীন্দ্রনাথ গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত. অমূলা কুমার গুপ্ত ও নারায়ণ প্রসাদ দাশ গুপ্ত এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, শচীন্দ্রনাথ গুপ্ত, সুধীর কুমার মুখার্জি ও মিহির কুমার দাশ গুপ্ত সেক্রেটারি বা কর্মসচিব এবং কালীপ্রসন্ন পিপলাই ও ধীরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত ইহার কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

মুখবন্ধ

এই খণ্ডে বিভিন্ন বংশের ও বাড়ির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল। ইহা প্রথম খণ্ডের পরিপূরক সুতরাং যাহাদের সম্বন্ধে কোনও বিষয় পূর্বে লেখা হইয়াছে তাহার পুনরাবৃত্তি করা হইল না। প্রথম খণ্ড না পড়িয়া এই খণ্ড পড়িলে ভ্রান্ত ধারণা হইতে পারে। পরিচিতিযোগ্য অনেকের নামও এখানে দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। দিগ্‌দর্শনস্বরূপ মাত্র অপেক্ষাকৃত বয়স্ক কয়েকজনের কথা এখানে লেখা হইয়াছে।

বিভিন্ন বংশ ও বাড়ি

এই অধ্যায়ে বর্ণানুক্রমে গৈলার বিভিন্ন বংশ ও বাড়ির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

আনন্দ ডাক্তারের বাড়ি

যাঁহার নামানুসারে বাড়ির নামকরণ হইয়াছে সেই আনন্দ চন্দ্র গুপ্ত ছিলেন পাশ্চাত্য স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ গ্রামের প্রথম চিকিৎসক। তিনি সরকারী কার্য করিতেন। এই বাড়ির হৃষীকেশের টালিগঞ্জ অঞ্চলে ঔষধের ব্যবসায় আছে। তিনি স্থানীয় বেদান্ত আশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

আলোক গুপ্তের বাড়ি

এই বাড়ির লোকদের অনেক বিত্ত সম্পত্তি ছিল। কৈলাস চন্দ্র ও অশ্বিনী কুমার নাম করা লোক ছিলেন। মতিলাল দাশ গুপ্ত বরিশালে কবিরাজ ছিলেন। সুরেশ চন্দ্র সিভিল ইঞ্জিনিয়ার।

কবিরাজ বাড়ি

এ বাড়ি মনসা বাড়ির উত্তর দিকে অবস্থিত। বাড়ির সম্মুখে বিরাট দীঘি। এ বাডির রামকমল দাশ কবীন্দ্রের আয়ুর্বেদ ও ব্যাকরণ অধ্যাপনার টোল ছিল। রসিক চন্দ্র বরিশালে লব্ধপ্রতিষ্ঠ মোক্তার ছিলেন। বিপিন বিহারীর বৃদ্ধ বয়সেও গৈলার সমস্ত ব্যাপারে তরুণদের মত উৎসাহ ছিল। ভূপেন্দ্রনাথ কলিকাতা হাই কোর্টের উকীল ছিলেন, পরে চাকরি গ্রহণ করেন। ডাঃ সুশীল চন্দ্র উত্তর কলিকাতার প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় চিকিৎসক। বহু গরিব লোককে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করেন। তিনি পশ্চিম বঙ্গ সমাজ সেবক সংঘের সেক্রেটারি ও স্থানীয় এম-এল-এ। সুনীল চন্দ্র ও মাখনলাল বিশিষ্ট ব্যবসায়ী।

কবিরাজ বাড়ি (ফুল্লশ্রী)

এ বাড়ির কার্ত্তিক দাশ গুপ্ত কলিকাতা বিশ্ববিত্তালয়ের অফিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন এবং কিছুকাল সাময়িকভাবে সহকারী রেজিষ্ট্রার পদেও কাজ করেন। শিশু সাহিত্য লিখিয়া তিনি খ্যাতি অর্জন করেন (সাহিত্য অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ও ভুবনেশ্বরী পদক লাভ করেন।

কবীন্দ্র বাড়ি

সুরেন্দ্র নাথ দাশ গুপ্ত এই বাড়িরই সন্তান। ১৮৮৫ সনের অক্টোবর মাসে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই সুরেন্দ্র নাথের মধ্যে কতগুলি

বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গিয়াছিল। কথিত আছে পাঁচ হইতে আট বৎসর বয়সের মধ্যে (তখন তিনি সংস্কৃতের কিছুই জানিতেন না) তিনি মুখে মুখে ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেন। নানা রকম যৌগিক আসন করিয়া সকলকে দেখাইতেন এবং কখনও কখনও কীর্তন শ্রবণে ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িতেন। মাঝে মাঝে তাঁহাকে কলিকাতার থিয়োসফিক্যাল সোসাইটিতে লইয়া যাওয়া হইত। সেখানে তিনি ধর্ম ও অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্নের সদুত্তর প্রদানে সকলকে চমৎকৃত করিতেন। এই সকল ব্যাপারে সেই সময়ে জাতিস্মর বলিয়া তাঁহার খ্যাতি রটিয়া গিয়াছিল। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও প্রভু জগদ্বন্ধু তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। কথিত আছে তাঁহার 'খোকা ভগবান' এই নাম বিজয়কৃষ্ণ দিয়াছিলেন। বালক সুরেন্দ্রনাথের এই ক্ষমতা বেশিদিন স্থায়ী হয় নাই।

সংস্কৃত কলেজে ছাত্রাবস্থায়ই তাঁহার বিদ্যার খ্যাতি রটিয়া গিয়াছিল। পাণিনি ব্যাকরণের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে অধ্যাপকদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিলে অনেক সময় তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করা হইত। ন্যায়শাস্ত্র তাহার এম-এ পরীক্ষার পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিলনা, কিন্তু সংস্কৃত কলেজে থাকিতে ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি যে গবেষণা করিয়াছিলেন অধ্যাপক মণ্ডলী, বিশেষ করিয়া কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাহার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

কাশিমবাজারের প্রাতঃস্মরনীয় মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর পরামর্শ ও আগ্রহে দর্শন শাস্ত্রে আরও জ্ঞান লাভের জন্য সুরেন্দ্রনাথ ১৯২০ সালে ইউরোপ গমন করেন এবং কেম্ব্রিজে দুই বৎসর পড়াশুনা করেন। তথায় অবস্থান কালে মহারাজা মনীন্দ্র নন্দীই তাঁহার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করেন। 'ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের' প্রথম খণ্ড এই সময়ে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। ঐ সময়ে তিনি ইউরোপীয়

দর্শনে কেম্ব্রিজের ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার নিযুক্ত হন।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার কিছুকাল পরে তিনি পর্যায়ক্রমে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। অবসর গ্রহণান্তর তিনি ইংলণ্ড গমন করেন। সেখানে তিনি হৃদরোগে বহুদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। সেই সময়ে 'ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের' চতুর্থভাগ সম্পূর্ণ করেন। ১৯৫০সালে তিনি লক্ষ্ণৌ শহরে আগমন করেন ও ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের পঞ্চম ও শেষ খণ্ড রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং তাহা প্রায় শেষ করিয়া আনেন। ১৯৫২ সালের ১৮ই ডিসেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্বেও তিনি উহার একটি অধ্যায় রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ভারত এক বিরাট দার্শনিক প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিত হারায়। গভর্ণমেণ্ট তাঁহার মনীষার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁহাকে সি-আই-ই উপাধি দান করেন।

ধর্ম, দর্শন, গল্প, কবিতা, সাহিত্য ও চিত্র সমালোচনা প্রভৃতি বিষয়ে সুরেন্দ্র নাথ ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় বহু পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

মহারাজা মনীন্দ্র নন্দীর মাসিক দানে তিনি পঞ্চদশ সহস্রাধিক পুস্তকের যে বিরাট লাইব্রেরী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহা তিনি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় পূর্বে বিভিন্ন অধ্যায়ে লেখা হইয়াছে।

এই বাড়ির শুভায়ু দাশ গুপ্ত ন্যাশন্যাল প্রডাকটিভিটি কাউনসিলের (National Productivity Council) ডিরেক্টর।

কানাই গুপ্তের বাড়ি

এ বাড়ির গুপ্তেরা 'জগদীশ গুপ্ত' বংশ বলিয়া পরিচিত। গোপাল গোবিন্দ বরিশালে ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করার অল্প কয়েক

বৎসরের মধ্যেই বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে বরিশাল আদালতের একটি মামলায় তাহার এক মক্কেল হাইকোর্টে আপীল করার জন্য খ্যাতনামা ডক্টর রাসবিহারী ঘোষকে উকীল নিযুক্ত করেন। ডক্টর ঘোষ গোপাল গোবিন্দের লিখিত ঐ আপীলের জন্য তৈরী ব্রিফটি দেখিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন এবং হাইকোর্টে ওকালতি করিবার জন্য তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। গ্রামের উন্নতি মূলক সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি জড়িত থাকিতেন। অল্প দিন হইল ১৩৭১ সালে তাঁহার পরিবার ও আত্মীয়বর্গ তাঁহার জন্ম শতবার্ষিকী পালন করিয়াছেন।

রজনীকান্ত ছিলেন সাব-ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও বিপিন বিহারী হেড মাষ্টার। গিরিজা প্রসন্ন প্রথমে ওকালতি আরম্ভ করেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় ব্যবসা ছাড়িয়া তিনি কিছু দিন গ্রামে থাকিয়া চরকা প্রচলন ও কংগেসী কার্যে লিপ্ত ছিলেন। অবনী মোহন সরকারী চাকরি হইতে অবসর গ্রহণান্তর ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনে দায়িত্বপূর্ণপদে অধিষ্ঠিত আছেন। গৈলা ও বরিশাল জিলার বহুলোকের বিপদে আপদে তিনি নানা ভাবে সাহায্য করিয়া তাহাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। প্রিয় গুপ্ত অল ইণ্ডিয়া রেলওয়েমেনস ফেডারেশনের (All India Railwaymens Federation) এক উৎসাহী কর্মী ও ঐ প্রতিষ্ঠানের জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিলেন।

কালুপাড়া সেন (উত্তরের বাড়ি)

গ্রামের কেন্দ্র স্থলে অবস্থিত এই বাড়িটি সর্ব প্রকারে উন্নত। জিলা বোর্ডের রাস্তা ও সংলগ্ন খাল হইতে ভদ্রাসন বাটি দক্ষিণ দিকে

বিস্তৃত। বাড়ির সন্মুখ ভাগে প্রশস্ত পুষ্করিণী, উহার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে সুউচ্চ পঞ্চরত্ন মন্দির। মন্দিরাভ্যন্তরে হরগৌরী মূর্তি। বিগ্রহের দৈনিক সেবা পূজার ব্যবস্থা আছে। পুকুর অতিক্রম করিয়া চণ্ডীমণ্ডপ ও আটচালা গৃহ এবং কিঞ্চিৎ দক্ষিণে ভিতর বাটি ও দ্বিতল অট্টালিকা।

এই বাড়িকে কালুপাড়া সেনদের উত্তরের বাড়ি বলে। ইহার দক্ষিণে সেনদের পুরাতন বা দক্ষিণের বাড়ি। উত্তরের বাড়ির বৃন্দাবন চন্দ্র চাকরি হইতে অবসর গ্রহণের পর দেশে থাকা কালে গ্রামের কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেন। তিনি গৈলা স্কুলের সভাপতি ও সেক্রেটারি ছিলেন। তাঁহার ছোট ভাই মধু বাবু (ইঞ্জিনিয়ার) পি-ডব্লু-ডি বিভাগে প্রথম বাঙ্গালী আণ্ডার সেক্রেটারী। তিনি রাজসাহীতে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার থাকা কালে পদ্মা নদীর পারে এক বাঁধ নির্মাণ করিয়া সরকারী ভবনাদি রক্ষা করেন। এই বাঁধ 'মধু বাবুর বাঁধ' নামে খ্যাত। এই বাঁধের উপর দিয়া সহরের সুন্দর রাস্তা গিয়াছে। কটকের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার থাকা কালে উড়িষ্যার মহানদী, ব্রাহ্মণী, কাটজুরী প্রভৃতি নদীর জল শাসন কাজে তিনি প্রচুর সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। তত্রত্য লোকেরা এখনও তাহা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করে। অবসর গ্রহণের পর তিনি বিনা পারিশ্রমিকে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতেন ও ঔষধ দিতেন। বৈদ্য ব্রাহ্মণ সমিতির তিনি সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তাঁহার দানশীলতা ও সদাশয়তার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

অক্ষয় কুমার গৈলা স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন। কুমুদ বিহারী গ্রামের সর্ববিধ জনহিতকর প্রচেষ্টার ও প্রতিষ্ঠানের অগ্রণী ও সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তিনি খুব উদার হৃদয় ও মুক্তহস্ত ছিলেন। কলিকাতাস্থ বরিশাল সেবা সমিতির প্রেসিডেণ্ট থাকা কালে ও পরে বরিশালের বহু ছাত্রের পড়াশুনায় তিনি সাহায্য করিয়াছেন। মেয়ের বিবাহ, ছেলের উপনয়ন, পরীক্ষার ফি বা পুস্তক মূল্য, কলেজের বেতন এবং দুর্ভিক্ষের

সাহায্যাদি বাবদ বহু লোক তাঁহার সাহায্য পাইয়াছে। তাঁহার অধিকাংশ দানই ছিল অতি গোপন, যাহাতে, গ্রহীতার আত্মসম্মানে কোন আঘাত না লাগে। গ্রামে উৎকৃষ্ট পানীয় জল সরবরাহের জন্য নিজ ব্যয়ে তিনি কয়েকটি নলকূপ বসাইয়া দিয়াছিলেন। পরে আবশ্যকমত উহার মেরামত খরচও বহন করিতেন। চাকরি হইতে অবসর গ্রহণের পর ভারত গভর্ণমেণ্টের অনেক বৈজ্ঞানিক পরামর্শ সমিতিতে তিনি সভ্য ভাবে কাজ করিতেন।

শঙ্কর ঔষধ-প্রস্তুত ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন।

এই বাড়ির কন্যা আরতি কলেজের অধ্যাপিকা।

কালুপাড়া সেন (দক্ষিণের বাড়ি)

পুরান বাড়ির মহিমাচরণ ছিলেন রাশভারী লোক। নিবারণ চন্দ্র ছিলেন পটুয়াখালীতে উকীল ও অশ্বিনী কুমার লব্ধপ্রতিষ্ঠ মোক্তার।

সুরেন্দ্রনাথ ছাপড়া জেলার মারহাওড়া শহরের বিখ্যাত ডাক্তার। তিনি অত্যন্ত সদাশয় ও মুক্তহস্ত। গ্রামের সব রকম জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে তাঁহার সাগ্রহ দান উল্লেখযোগ্য।

দেবপ্রসাদের স্ত্রী সীমা কলেজের অধ্যাপিকা। মিহির কুমার ইনকাম ট্যাক্স অফিসার। বিশ্বেশ্বর ছিলেন কেমিষ্ট ও বনমালী কবিরাজ। তিনি ও তাঁহার স্ত্রী কংগ্রেসের কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন।

কুন্দগ্রামী বংশ

কুন্দগ্রামীগণ পঞ্চানন ভট্টাচার্য বংশের দৌহিত্র কুল সম্ভূত। ইহাদের পূর্বে তিনটি বাড়ি ছিল, বর্তমানে দুইটি। পৌরোহিত্য

ইহাদের ব্যবসা ছিল। বর্তমান কালে এ বংশে ইঞ্জিনিয়ার ও কলেজের অধ্যাপক প্রভৃতি আছেন। গোপাল কুন্দগ্রামী গৈলা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিশেষ নাম করা ক্রিয়াক্ষম পুরোহিত ছিলেন। অপর বাড়ি টোল বাড়ি নামে পরিচিত। সে বাড়ির মধুসূদন স্মৃতিরত্ন ও অন্যান্যদের কথা পূর্বে বিস্তারিত ভাবে লেখা হইয়াছে। (সংস্কৃত শিক্ষাব বিবরণ দ্রষ্টব্য)।

কেরানী বাড়ি

গৈলার প্রথম ইংরেজী শিক্ষিতদের অন্যতম মহেশচন্দ্র দাশ এই বাড়ির সন্তান। রেবতী মোহন চাকরি হইতে অবসর গ্রহণের পব দীর্ঘকাল বঙ্গীয় ষ্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকালটির সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি অতিশয় মধুর প্রকৃতির ও নিরভিমানী লোক ছিলেন।

গোলার পাড় গুপ্তের বাড়ি

এ বাড়ি চারিটি খণ্ডে বিভক্ত। পুরাতন বাড়ি দুই খণ্ড ও নূতন বাড়ি দুই খণ্ড। গৈলা বাজাবের সংলগ্ন দক্ষিণ দিকের খালের অপব পার্শ্বে এই বাটি।

এ বাড়ির সুরেন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল ইউনিয়ন বোর্ড ও বেঞ্চের সদস্য ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ বরিশালে উকিল এবং কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল বরিশালে পোস্টাল ও আর-এম-এস ইউনিয়নের সেক্রেটারি এবং ঐ ইউনিয়নের বঙ্গদেশীয় সভার সহকারী সভাপতি ছিলেন। তিনি বাখরগঞ্জ জিলার জমিদার সভারও সহকারী সম্পাদক ছিলেন। হরেন্দ্রনাথ ওকালতি ব্যবসা করিতেন।

জ্যোতিভূষণ অবসর গ্রহণান্তর গৈলা স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন। ডাঃ রেণুভূষণ মেডিক্যাল কলেজের কৃতী ছাত্ররূপে পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন ও অনেক কাল দেশে ব্যবসা করিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন ও নানারকম প্রার্থীর অভাব অভিযোগ মোচন করিতেন। রমেশচন্দ্র ও দীনেশচন্দ্র সর্ব শ্রেণীর বসন্ত রোগীদের সেবা করিতেন। ভবেশচন্দ্র বসন্ত চিকিৎসক ও গ্রামবাসীদের নানা ভাবে সেবা করেন। বিমলাচরণ অধ্যাপক ও প্রবীর মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার। চিন্তাহরণ রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে বর্তমান গভর্ণমেণ্ট হইতে পেনসন ভোগ করিতেছেন।

কালীকমল ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে জলপাইগুড়ি শহরে ডাক্তারি আরম্ভ করেন ও সেখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সতীশ চন্দ্র ক্যাম্পবেল স্কুল হইতে ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ করিয়া জলপাইগুড়ি শহরে ব্যবসা করেন। তিনি জলপাইগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন এবং জলের কল এবং বিজলী বাতির ব্যবস্থা করিয়া শহরের প্রভূত উন্নতি করেন। শহরে যখন কলেজ স্থাপিত হয় তখন তাঁহার বাড়িতেই প্রথম ক্লাস বসিত। তিনি সেখানকার প্রথম শ্রেণীর অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ষ্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকালটির সভ্য ছিলেন।

মিহির প্রকাশ ফিলিপস কোম্পানীর পদস্থ ইঞ্জিনিয়ার।

অশোককুমার ইণ্ডিয়ান আর্মি কোর অব ইঞ্জিনিয়ার দলে লেফ্‌টেনাণ্ট ছিলেন। সিকিমে অবস্থান কালে দৈবদুর্ঘটনায় তাঁহার অকালে মৃত্যু হয়।

হিরণ্ময় গ্রামের কাজে উৎসাহী কর্মী।

চন্দ্রকান্ত ডাক্তারের বাড়ি

গ্রামের প্রায় মধ্যস্থলে ডাঃ চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীর বসত বাড়ি। তিনি সরল, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন এবং পিতৃভক্ত ও অত্যন্ত নিষ্ঠা-

বান ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাড়িতে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া পুকুরের পশ্চিম পারে তিনি সুন্দর মন্দির নির্মাণ ও তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। চাকরি হইতে অবসর গ্রহণান্তর বরিশাল শহরে কয়েক বিঘা জমি নিয়া তিনি বিস্তীর্ণ এক বাড়ি করেন ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের নানা জাতীয় ফল ও ফুলের গাছ ও লতা রোপন করেন। এই বিরাট বাগানে কাশ্মীরের আপেল ও আঙ্গুর ও দ্রাবিড়ের এলাচি লতা প্রভৃতি হরেক রকমের ফলবান বৃক্ষ ও লতা, মহীশুরের চন্দন ও দার্জিলিং-এর ইউকালিপটাস কোনটাই বাদ ছিল না, ফলে তথায় এক শান্ত ও স্নিগ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছিল। এই বাগান দর্শকদের শিবপুরের বোটানিক্যাল বাগানের কথা স্মরণ করাইয়া দিত। এ বাড়িতেও তিনি মহাদেবের প্রকাণ্ড মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

বরিশাল শহরে বাস কালেও তিনি চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন। তিনি যেমন ছিলেন সুচিকিৎসক, তেমনি ছিলেন শল্য বিদ্যায় পারদর্শী। একাধারে উভয় বিভাগে এইরূপ দক্ষতাব দৃষ্টান্ত সচরাচর দেখা যায় না।

চৌধুরী বাড়ি

'চৌধুরী' বাড়ির নামের হেতু সঠিক জানা যায় না। এই বাড়ির পূর্ব হাউলীর কৈলাস গুপ্ত এবং তাঁহার ভাই তারিণীর ভাটী অঞ্চলে অনেক সম্পত্তি ছিল এবং লোকে তাহাদের 'চৌধুরী' বলিয়া ডাকিত। বাড়ির লোকদের ধারণা যে উহা হইতেই ক্রমশ সমগ্র বাড়িরই 'চৌধুরী বাড়ি' নাম হইয়াছে।

এই বাড়ির দরজায় বড় দীঘি আছে। তাহার পাড়ে পাকা মন্দিরে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। ঐ মন্দিরের উত্তরে জয়দুর্গা ও নীল খোলা। চৈত্র বৈশাখ মাসে দুইদিন বাড়ির দরজায় 'খোল' হইত।

গুরুদয়াল বরিশালে উকীল ছিলেন। অন্নদাচরণ পানের নৌকায় ঢাকা যাত্রী বিদ্যার্থীদের .অন্যতম। তিনি ঢাকার নবাব, সায়েস্তা-বাদের নবাব প্রভৃতি জমিদারী এষ্টেটে চাকরি করিতেন ও অত্যন্ত সামাজিক লোক ছিলেন। নলিনী ভাল শিকারী, কুলদাচরণ বরিশালে লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল এবং বিজয় প্রসন্ন কেমিষ্ট ছিলেন।

ছোট নয়া গুপ্তের বাড়ি

রামচরণ, বিশ্বেশ্বর ও আশুতোষ এই বাড়িতে বাস করিতেন। পূব পাড়ার গার্লস স্কুল তাঁহাদের প্রদত্ত জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। অক্ষয় কুমার "পাগল হরনাথের" শিষ্য হইয়াছিলেন এবং চাকরি হইতে অবসর গ্রহণান্তর বৈষ্ণবোচিত ভাবে দিন যাপনের চেষ্টা করিতেন। গার্লস স্কুল প্রভৃতি দেশের জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে তাঁহার সক্রিয় উৎসাহ ছিল। বিনোদ বিহারী উকীল ও প্রফুল্ল চন্দ্র ডি-এস-পি ছিলেন। সুরেন্দ্র নাথ বরিশাল ষ্টীমার আফিসের পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। গ্রামের কাজে তাঁহার খুব উৎসাহ আছে।

ডিংসাই শ্রোত্রিয় বংশ

সিহিপাশা অঞ্চলে ডিংসাই শ্রোত্রিয়গণের বাস। তাঁহাদের অনেক বাড়ি। ইঁহাদের ব্যবসা প্রধানত ভবদাশ বংশের পৌরোহিত্য। ইঁহারা মনসা বাড়িরও পুরোহিত। "রামকিশোরের মঠ" ইঁহাদের এক পূর্বপুরুষ রামকিশোর চক্রবর্তীর নামে স্থাপিত। আজকাল ইঁহারা অন্য ব্যবসা ও চাকরিও আরম্ভ করিয়াছেন। অনেককাল পূর্বে অক্ষয় কুমার বিদ্যানিধি এই বংশে প্রথম এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। তিনি

১০৲ বৃত্তিও পাইয়াছিলেন। তিনি গৈলা স্কুলে বহুকাল পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র কলিভূষণ চক্ষু চিকিৎসা করিতেন।

তপাদার বাড়ি

এ বাড়ির ডক্টর দীনেশ চন্দ্র বিজ্ঞানের ছাত্র। সাহিত্য সেবায়ও তাঁহার সমধিক আগ্রহ আছে। শান্ত ও বিনয়ী দীনেশ চন্দ্র সর্বত্র জনপ্রিয়। দেশ বিভাগের পর তিনি হালিসহর অঞ্চলে বসবাস করিতেছেন এবং সেখানকার প্রতিটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত আছেন। গৈলাবাসীদের উন্নতিমূলক যে কোন কার্যে তিনি উৎসাহী।

তর্কবাগীশের বাড়ি

গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে এই বাড়ি অবস্থিত। বাড়ির দরজায় একটা দীঘি এবং দীঘির এক পার্শ্বে কালী খোলা। বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা রামজয় তর্কবাগীশ এই বাড়ি আসার পূর্বে বাজারের নিকট এক বাড়িতে বাস করিতেন। পরে পঞ্চানন ভট্টাচার্য বংশের একজনের নিকট ব্রহ্মত্র পাইয়া এই বাড়িতে আসেন। ইঁহারা কর্ণপুর ভট্টাচার্য বলিয়া খ্যাত এবং ইঁহাদের ব্যবসা গুরুতা। গ্রামে এবং অন্যত্র ইঁহাদের বহু ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য শিষ্য আছে। ব্রহ্মত্র জমি ও তালুকদারীও অনেকের আছে। পূর্বে ইঁহাদের মধ্যে বেশ সংস্কৃত চর্চা ছিল। রামচরণ শিরোরত্ন স্মৃতিশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন ও গ্রামের সাধারণ কাজে অংশ গ্রহণ করিতেন। মধুসূদন পাড়ার সমস্ত বিষয়ে, বিশেষত রাস্তা নির্মাণ ও খাল খনন ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। প্রতি বৈশাখ মাসে বাড়ির দরজায় দুই দিন "থোল হইত"।

তারাচাঁদ দাসের বাড়ি

তারাচাঁদ দাস ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হিসাবে গৈলা বাজারে ব্যবসায় আরম্ভ করেন, পরে তারাচাঁদ মেডিকেল হল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দুষ্প্রাপ্য ঔষধ সমূহ আমদানী করিতেন এবং ন্যায্য মূল্যে তাহা বিক্রয় করিয়া সর্বসাধারণের প্রভূত উপকার করিতেন।

দাশের বাড়ি

'পুবান বাড়ি' হইতে রাঘবেন্দ্র দাশের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ কৃষ্ণদেব অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বা মাঝামাঝি বর্তমান দাশের বাড়িতে নিজ বাসগৃহ স্থানান্তরিত করেন। কৃষ্ণদেবের চারি পুত্র—কাশীনাথ, কৃষ্ণপ্রসাদ, বাণেশ্বর ও ঘনশ্যাম। ইঁহারাই এই বাড়ির ৪ হিস্যার পূর্বপুরুষ।

দাশ পরিবারের ভদ্রাসন বাটি সংলগ্ন প্রকাণ্ড দীঘি। ইহার পূর্ব পাড়ে পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস, সন্নিকটে পূর্ব দিকে অপর একটি বৃহত্তর দীঘি। এই দীঘি গোলার দীঘি বা আন্ধি নামে পরিচিত। এই দীঘির দক্ষিণ পাড়ে বাজার, পূর্বপাড়ে কর্মকার পল্লী, উত্তর পাড়ে গোয়ালাদের বাড়ি, পশ্চিম পাড় ভুঁইমালীদের বাসস্থান। বাজারের পারেই খাল। বাজার অতিক্রম করিয়া পূর্বদিকে তাঁহাদের পারিবারিক শ্মশান। আরও পূর্বদিকে দোলমঞ্চ। স্কুলের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে চড়ক পূজার অঙ্গস্বরূপ ভোগ প্রদানের হাজরা খোলা।

ভদ্রাসন বাটী সংলগ্ন পূর্বদিকে বহির্বাটীতে ৪ হিস্যার ৪ খানি চণ্ডী মণ্ডপ, বিশালায়তন ২ খানা আটচালা, ৪ খানা কাছারী ঘর ও ২ খানা নহবৎ বিদ্যমান ছিল। গৈলা স্কুল স্থাপনের সময় হইতে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত এই সব ঘরেই স্কুল বসিত।

গৈলা বাজার বরিশাল জিলার বড় চারিটি দৈনিক বাজারের অন্যতম।

গৈলার কথা

বর্ষাকালে পাটের মরশুমে গৈলা বাজার একটি গঞ্জ বা বিরাট বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হইত। এরূপ লোক সমাগম এতদঞ্চলে খুব কম বাজারেই দেখা যাইত—বিশেষ করিয়া অধিবাস ও লক্ষ্মীপূজার বাজারে অত্যধিক জনসমাগম হইত। গ্রামবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক আলাপ পরিচয়েরও ইহা একটি প্রকৃষ্ট স্থান ছিল। বাজারের মালিক দাশ মহাশয়গণ কখনও নৌকা ঘাটের ঘাটমাঝি বা বাজার হইতে কোনরূপ খাজনা বা তোলা আদায় করেন নাই। সকলেই বিনা খাজনায় দোকান নির্মাণ করিয়া কারবার করিতে পারিত এবং অনেক ব্যবসায়ীই এই বাজারে পুরুষানুক্রমে কারবার করিয়াছেন। বর্তমানে (দেশ বিভাগের পর) গৈলা বাজার স্থানীয় সরকার খাস করিয়াছেন। পূর্ব মালিক দাশদের রীতি অনুসরণ করিয়া কর্তৃপক্ষ বাজারে কোন খাজনা ধার্য করেন নাই। দাশদের সম্পত্তি সমস্ত জিলায় বিস্তৃত ছিল। ইহা ভিন্ন কাহারও কাহারও নিজেদের ভূসম্পত্তি ছিল।

বড় হিস্যা

বড় হিস্যার প্রতিষ্ঠাতা কাশীনাথ ছিলেন প্রবল পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারী। তিনি প্রথম জীবনে মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে কার্য করিতেন এবং নবাব বাহাদুর প্রদত্ত "রায়" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী সহমৃতা হইয়াছিলেন। তাঁহার অধস্তন বংশধর-দিগের মধ্যে গুরুপ্রসাদ ও রামচন্দ্র ছিলেন ক্রিয়াকর্মান্বিত পুরুষ। আধুনিক ভাষায় বলিতে গেলে রামচন্দ্র ছিলেন গ্রামের প্রথম নাগরিক। তাঁহার সময়ে গ্রামের উন্নতিকল্পে যে সব প্রতিষ্ঠান হইয়াছে তাহার সহিত তাঁহার সক্রিয় সহযোগ ছিল। তিনি পিতৃপিতামহের সম্পত্তি অনেক বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

শশিভূষণ দীর্ঘকাল গৈলা স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি সদাশয় লোক ছিলেন এবং কালী মন্দির, বাসন্তী মন্দির ও পারিবারিক

শ্মশানে অনেকগুলি সমাধি মন্দির নির্মাণ করেন। বিপিন বিহারী চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বরিশাল শহরে বাস ক্যলে ১৪ বৎসর কাল শহরের হাসপাতাল কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন। হেমন্ত কুমার ভাল শিকারী ছিলেন। নারায়ণ প্রসাদ কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট ও পরে বার্ড কোম্পানিতে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। প্রতুলচন্দ্র ও সুধীর কুমার লাইফ ইনসিউরেন্স কর্পোরেশনের পদস্থ কর্মচারী। প্রতুল চন্দ্রের পুত্র কলেজের অধ্যাপক।

মেজ হিস্যা

দাশদের মেজ হিস্যার স্থাপয়িতা কৃষ্ণপ্রসাদ দাশ। তিনি দীঘির পশ্চিম পাড়ে নূতন বাড়ি পত্তন করেন। কৃষ্ণসুন্দর দাশের গ্রামের সর্বাপেক্ষা অধিক নগদ অর্থশালী ব্যক্তি বলিয়া খ্যাতি, ছিল। তিনি প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং গৈলা স্কুলের কার্যনির্বাহক কমিটির সভ্য ছিলেন।

রামচন্দ্র দাশ স্কুলের সেক্রেটারি থাকাকালীন স্কুলের ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য গঙ্গাপ্রসাদ তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি সদালাপী ও সামাজিক লোক ছিলেন। জিতেন্দ্রনাথ রেলওয়ের চাকরি হইতে অবসর গ্রহণের পরও দীর্ঘকাল পূর্ব রেলওয়ের উপদেষ্টা হিসাবে কার্য করেন।

লক্ষ্মীচরণ দীর্ঘকাল ইদিলপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি ছিলেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন। The Hindu Joint Family System নামে একখানি পুস্তক রচনা করিয়া তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন।

এই হিস্যার অশ্বিনীকুমার দীর্ঘকাল জিলা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান

ছিলেন এবং কিছুকালের জন্য চেয়ারম্যানের কার্য করিয়াছিলেন। তিনি গৈলা স্কুলের সভাপতিও ছিলেন। বহুদিন পূর্বে বরদাচরণ পদব্রজে ও নৌকায় কলিকাতায় আসিয়া মেডিক্যাল কলেজের বাঙ্গলা বিভাগে অধ্যয়ন করেন এবং শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া রংপুর গাইবাঁধা অঞ্চলে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তখন কলিকাতা কিম্বা উত্তর বঙ্গের সহিত রেল বা ষ্টীমার সংযোগ হয় নাই। এই যুগে যে কতিপয় সাহসী যুবক শিক্ষালাভ ও ভাগ্যান্বেষণের জন্য বিপদ সঙ্কুল পথে দূর দেশে গমন করেন বরদাচরণ ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম।

সুরেশচন্দ্র দানশীল ও পরদুঃখকাতর ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ চাকরি হইতে অবসর গ্রহণের পর গ্রামের জনহিতকর কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করিতেছেন। সুধাংশু ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

চৌধুরী হিস্যা

এই হিস্যার প্রতিষ্ঠাতা বাণেশ্বর দাশ চৌধুরী। মনসামঙ্গল গ্রন্থের সংকলয়িতা বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলের শিক্ষক প্যারীমোহন তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে অন্যতম কৃতী সন্তান। চিন্তাহরণ দীর্ঘকাল সেটেলমেণ্ট বিভাগে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি তাঁহার কোনও কোনও কার্যস্থলে মন্দির ও মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ডাঃ শান্তিরঞ্জন (চিফ মেডিক্যাল অফিসার) জাদুবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী এবং বৎসরে ২।১ বার জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সাহায্যকল্পে জাদু প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহার ভগিনী উমাও জাদুবিদ্যায় পারদর্শিনী। নবীনচন্দ্র বহুকাল গ্রাম্য পঞ্চায়েতের আদায়কারী সভ্য ছিলেন। ললিতমোহন চাঁদপুরে কবিরাজী করিতেন। তিনি চট্টগ্রাম ও আগরতলা অঞ্চলে 'গুপ্ত সাধু' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। জয়ন্ত বর্তমানে বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তিনি

আকুমার ব্রহ্মচারী, সাধুস্বভাব এবং বরিশালের জগদীশ আশ্রমে বাস করিয়া বর্তমানে ইহার পরিচালকের কার্য করিতেছেন।

ছোট হিস্যা

এই হিস্যার পূর্বপুরুষ ঘনশ্যাম দাশ। চণ্ডীচরণ দীর্ঘকাল বরিশাল জেলা বোর্ডের সেক্রেটারি হিসাবে কার্য করিয়া অবসর গ্রহণান্তর গৈলা স্কুলের সেক্রেটারি ও সভাপতির কাজ করিয়াছিলেন। দুর্গাপ্রসন্ন বরিশালের অন্যতম লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল এবং দীর্ঘকাল বরিশাল মিউ-নিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। পবিত্রকুমার ক্যানিং টাউন কলেজের অধ্যক্ষ। তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি লাভ করেন। নির্মলচন্দ্র বাঙ্গালোরে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে (I. I. S) দীর্ঘকাল গবেষণা করেন।

স্বদেশী যুগে সরোজেন্দ্রনাথ মাদ্রাজে চর্মশিল্পে শিক্ষালাভ করিয়া লেদার টেকনোলজিষ্ট (Leather Technologist) হ'ন। পরে বহরমপুরে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রতিষ্ঠিত চর্ম প্রতিষ্ঠানে বহুদিন চাকরি করেন। বাংলাদেশে স্বদেশী যুগে যাঁহারা ঐ বিদ্যা অর্জন করিয়া দেশকে শিল্পে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন সরেজেন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম।

প্রিয়লাল গৈলা ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা কাল হইতে আমরণ প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি বেঞ্চ কোর্টে'রও প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। গৈলা বাজারে ভেজাল দ্রব্য প্রতিরোধ কল্পে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। ডক্টর অমূল্য কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক।

দীঘির পাড়

ভোলা গিরি আশ্রমের বিশিষ্ট সাধু স্বামী প্রেমানন্দ গিরি মহারাজ

এই বাড়ির সন্তান। এই বাড়ির অন্যান্য ব্যক্তিদের কথা বিভিন্ন অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে।

দুহিসেন বংশ

ইহাদের দুই খানা বাড়ি। এই বংশে পূর্বকালে তারিণীশঙ্কর ও ভব সেন ছিলেন প্রসিদ্ধ কবিরাজ। ভব সেন নাড়ী দেখিয়া আসন্ন মৃত্যুর সময় বলিয়া দিতে পারিতেন বলিয়া খ্যাতি আছে। মথুরানাথ এই শতাব্দীর প্রারম্ভে কলিকাতা বাস কালে গ্রামের ছেলেদের অভিভাবকের মত ছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ গ্রামের জনহিতকর কাজে উৎসাহী।

রমেশচন্দ্র রাজনৈতিক কার্যের সহিত যুক্ত ছিলেন ও 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার 'সাব এডিটর' ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ রোটারি মেশিন সম্বন্ধে খুব অভিজ্ঞ ছিলেন এবং বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ বাড়ির অনেকে রাজনৈতিক কারণে কারাবরণ করিয়াছিলেন।

নয় দাশের বাড়ি

এই বাড়ি পূব পাড়ায়। স্বদেশী যুগে নেপালচন্দ্র দাশ ঐ আন্দোলনে একান্ত আন্তরিকতার সহিত যোগ দিয়াছিলেন। ১৯০৬ সালে দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। জলও খুব বেশি হইয়াছিল। রাস্তা, পুল প্রভৃতি তেমন ছিল না। সেই সময় নেপালবাবু সাহায্যের জন্য নিজে মাথায় করিয়া বাড়ি বাড়ি চাউল পৌঁছাইতেন এবং যে সমস্ত ভদ্রলোক দিনের বেলা সকলের সামনে সাহায্য গ্রহণ করিতে লজ্জা বোধ করিতেন, রাত্রির অন্ধকারে জল কাঁদা ভাঙ্গিয়া তিনি ঐ ভাবে তাঁহাদের বাড়ি গিয়া সাহায্য দিয়া আসিতেন। তাঁহাকে স্বদেশী

মোকদ্দমায় পড়িতে হইয়াছিল কিন্তু তিনি দেশ সেবার মহান আদর্শ হইতে কোনও দিন বিচ্যুত হ'ন নাই ও গ্রামও তাঁহার সেবা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। তিনি খুব শিক্ষিত ছিলেন না। তাঁহার অবস্থাও সচ্ছল ছিল না কিন্তু তিনি আমাদের জন্য দেশ প্রেম ও সেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

অসহযোগ আন্দোলনে তাঁহার ভ্রাতৃবধূ চারুশীলা দেবী নেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নরসিংহ দাশের বাড়ি

আমবৌলা রোড ও খালের সংলগ্ন এই বাড়ির প্রাকৃতিক শোভা সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই বাড়ির সম্মুখস্থ বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে অনেক সময়ে সভা সমিতি হইত।

এই বাড়ির নবীনচন্দ্র ছিলেন বরিশালের উকীল। নির্মলচন্দ্রও ওকালতি করিতেন। কলেজে পাঠ্যাবস্থায় তিনি কলিকাতায় 'বরিশাল সেবা সমিতির' সেক্রেটারি ছিলেন। অমিয়কুমার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পান। বর্তমানে তিনি কলেজের অধ্যাপক। চিত্তরঞ্জনও কলেজের অধ্যাপক। তিনি পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে কলেজ ও স্কুল পাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াছেন। দেবরঞ্জন ন্যাশনাল কোল ডেভালাপমেণ্ট কমিশনের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি। সুরেন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল শিক্ষা বিভাগে কর্ম করেন। তিনি ধর্মপ্রাণ ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং চরিত্র মাধুর্যের জন্য সকলেরই অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। বিপিন বিহারী স্বদেশী যুগের পর জীবন বীমা ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। কথিত আছে তিনিই প্রথম চিত্তরঞ্জন দাশকে "দেশবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করেন এবং সমগ্র দেশ তাঁহার প্রদত্ত উপাধিকে স্বীকৃতি দান করে। বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্যে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল।

নরসুন্দর বংশ

পূর্বে ইহাদের অধিকাংশই জাতীয় ব্যবসায় করিত। প্রায় সকলেরই নিজ নিজ চাষের জমি ছিল। অনেক চাকরান জমি ইহারা ভোগ করিত। হাবাণচন্দ্র এই বংশে প্রথম গ্রাজুয়েট। অনেক দিন ইনি শিক্ষকতা করেন। পরে গৈলা স্কুলের হেডমাষ্টার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এ বংশে যোগেশচন্দ্র ও আরও কয়েকজন গ্রাজুয়েট আছেন। ইহাদের অনেকেই এখন নানাবিধ চাকরি করিতেছেন, কেহ কেহ ব্যবসায়েও লিপ্ত আছেন।

নিমদাশের বাড়ি

নিমদাশ বংশের কয়েকখানা বাড়ি। এ বাড়ির ললিতমোহন ছিলেন একাধারে নিষ্ঠাবান ভগবদ্ভক্ত, পূতচরিত্র, আদর্শবাদী ও দেশের সর্ব প্রকার জনহিতকর প্রচেষ্টার পথ প্রদর্শক।

এম-এ পাশ করার পর ললিতমোহন নলধা স্কুলে হেডমাষ্টারের চাকরি গ্রহণ করেন। সেখানে সমাজ সংস্কার সমিতি নামে এক সমিতি গঠন করেন ও তাহার সেক্রেটারি নিযুক্ত হ'ন। সেই সমিতির উদ্যোগে এক বিধবা বিবাহ হয়। সেই সময়ে 'বিবাহে পণ গ্রহণ' নামে বরপণের বিরুদ্ধে তিনি এক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। পরে কলিকাতায় সিটি কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন। অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করার পর ছাত্রদের বাড়িতে পড়াইয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে থাকেন, কিন্তু ঐ সময়েও ২।১ টি ছাত্র ছাত্রীকে সর্বদাই বিনা পারিশ্রমিকে পড়াইতেন। অর্থলোভ তাঁহার একেবারেই ছিল না।

বাল্যকালে স্কুলে পড়িবার সময় ললিতমোহনের বিবাহ হয় এবং পত্নী বিয়োগ হইলে পুনর্বার বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই পত্নীও অল্প বয়সেই

মারা যান। এন্ট্রান্স পরীক্ষার পর প্রায় ২০ বৎসর বয়সে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পর আর বিবাহ করেন নাই, পিতা এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের (মাতা পূর্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন) সহিত সম্পর্ক বন্ধন দৃঢ় রাখিয়াছিলেন। প্রতি বৎসব পূজার ছুটিতে দেশের বাড়ি যাইতেন।

ব্রাহ্ম সমাজের সব প্রতিষ্ঠানের সহিত ললিতমোহন যুক্ত ছিলেন। সমাজের কার্যনির্বাহক কমিটির তিনি সভ্য ছিলেন এবং প্রতি সভায় ঠিক সময়ে উপস্থিত হইতেন। তিনি সমাজের 'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। ব্রাহ্মধর্মে তিনি দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু প্রচলিত হিন্দুধর্ম বা অন্য কোন ও ধর্মকে কখনও অশ্রদ্ধা বা নিন্দা করিতেন না।

কলিকাতায় ললিতমোহনের ৮২।১ নং হ্যারিসন রোডস্থ মেস (তিনি চিরকাল মেসেই থাকিতেন) গৈলা তথা বরিশাল জিলার ছাত্র বৃন্দের প্রধান মিলনকেন্দ্র ছিল। তাহাদের প্রতি তাঁহার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ। তাহারাও ললিতমোহনকে বন্ধু, পরামর্শদাতা, অভিভাবক ও আদর্শ মনে করিত।

"বরিশাল সেবা সমিতির" প্রাথমিক উদ্যোগ সভায় কেবল মাত্র ছাত্রদিগকেই আহবান করা হইয়াছিল। কিন্তু নিরভিমান ললিতমোহন সেই সভায় আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, বিনা নিমন্ত্রণে তিনি কেন আসিয়াছেন। তাহাতে তিনি উত্তর করেন, "খবরের কাগজে দেখিলাম তোমরা একটা ভাল কাজ আরম্ভ করিতে চেষ্টা করিতেছ, কি কর দেখিতে আসিলাম। এ জন্য কোনও নিমন্ত্রণ দরকার হয় না।" বরিশাল সেবা সমিতির তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন ও প্রথম সভাপতি ছিলেন। তাঁহার মেসেই বহু বৎসর পর্যন্ত উহার কার্য নির্বাহক সভার অধিবেশন হইত এবং বরাবরই তিনি উহাকে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত করিয়া গিয়াছেন।

ললিতমোহন গৈলা গ্রামকে ভালবাসিতেন ও তাহার সর্বাঙ্গীন

উন্নতির জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। নিজের কাছে গ্রামের বি-এ ও এম-এ প্রভৃতি ছাত্রদের তালিকা রাখিতেন। প্রতি বৎসর পূজার ছুটিতে গৈলা স্কুলের জেনারেল কমিটির অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতেন ও তাহার আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতেন। তিনি কর্মী সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় ইতিপূর্বে বিভিন্ন অধ্যায়ে লেখা হইয়াছে।

পঞ্চানন ভট্টাচার্য বংশ

ইঁহাদের ৫ খানা বাড়ি। এই বংশে গোবিন্দরাম সার্বভৌম, রঘুনাথ ন্যায়বাগীশ, গদাধর ন্যায়বাগীশ, ও রাধামোহন তর্কভূষণ প্রমুখ অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সেই জন্যই দেশে ও বিদেশে অনেকে তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ কবিয়াছিলেন। ইংরেজী শিক্ষার পূর্ব পর্যন্ত গুরুতাই ইঁহাদের ব্যবসা ছিল।

বেজের পাড়ের প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের বংশ, কুন্দগ্রামীবংশ, নীলমণি ও ঈশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের বংশ ইঁহাদেরই দৌহিত্র বংশ। গৈলায় বসতি স্থাপন করার পর পঞ্চানন ভট্টাচার্য বহু রজক, নরসুন্দর, নট্ট প্রভৃতিকে জমি দিয়া গৈলায় বসতি স্থাপন করিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

বেজের পাড়ের কালী বিগ্রহ উক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য মহাশয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ইঁহাদের পুরাতন বাড়ির যোগেন্দ্র নাথ বঙ্গীয় আইন বিভাগে সুপারিনণ্টেনডেণ্ট ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ খুলনা শহরে ডাক্তারি ব্যবসায়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বহুলোককে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করিতেন এবং ক্ষেত্র বিশেষে তিনি রোগীকে ঔষধ ও পথ্যের খরচও দিতেন। খুলনায় কংগ্রেসের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন এবং উহার তহবিলে অনেক টাকা দান করিয়াছেন। তিনি বেঙ্গল

মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সভায় একবার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ এবং শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত ও খুলনায় সকলেব খুব শ্রদ্ধা ভাজন। শেষ জীবনে তিনি ডাক্তারি ব্যবসা ছাডিয়া পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে গিয়া স্থায়ী ভাবে বাস করেন।

বাণেশ্বর ন্যায়পঞ্চাননের বাড়ির কৃষ্ণকুমাব জনহিতকর কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ কবিয়া থাকেন। তিনি বরিশাল সেবা সমিতির সেক্রেটারি এবং বহু বৎসব বিবিধ ভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ভারতীয় অডিট বিভাগে এসিস্ট্যাণ্ট একাউণ্টস্ অফিসার ছিলেন।

রাধানাথ ভট্টাচার্যের বাডির দৌহিত্র বংশের দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উকীল ও গ্রামের নানাবিধ কাজে একজন উৎসাহী কর্মী।

পিপলাই বাড়ি

পলাশির যুদ্ধের কিছুকাল পর এই বংশের রামশঙ্কর ওকালতি আরম্ভ করেন ও প্রায় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ওকালতি করিয়াছিলেন। তাঁহার ও এই বংশের অন্যান্য হিস্যার পূর্বপুরুষদের নামে খারিজা তালুক আছে।

শোনা যায় বহুকাল পূর্বে ইহাদের কাহারও কাহারও যাজনিক ব্যবসা ছিল। সে কত কাল পূর্বে এবং কাহার ছিল ঠিক জানা যায় না।

দুর্গাচরণ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় ওকালতি পাশ করিয়া বরিশাল শহরে ওকালতি আরম্ভ করেন ও ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঐ ব্যবসা করেন। তাঁহার সমসাময়িক প্রথম শ্রেণীর বিখ্যাত উকীলদের তিনি অন্যতম ছিলেন এবং সততা, চরিত্রের দৃঢ়তা ও তেজস্বিতার জন্য গ্রামের ও বরিশাল জিলার সর্বত্র সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতৃস্থানীয় লোকদের অন্যতম ছিলেন। বহুলোকের মামলা মোকদ্দমা তিনি সালিসি করিয়া নিষ্পন্ন

করিয়া দিতেন। তিনি বরিশাল শহরের ধর্মরক্ষিণী সভার প্রতিষ্ঠাতা ও বহু বৎসর পর্যন্ত উহার সভাপতি ছিলেন। গৈলা স্কুল স্থাপনের উদ্যোগীদের তিনি অন্যতম ছিলেন এবং স্কুল সৃষ্টি হইতে প্রায় ১৫ বৎসর কাল উহার কার্য নির্বাহক সভার সভ্য ছিলেন।

কালীপ্রসন্ন ১৯১৪ সালে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। পরে সরকারি বিচার বিভাগে চাকরি গ্রহণ করেন। কলিকাতাস্থ বরিশাল সেবা সমিতির প্রথম অবস্থায় তিনি উহার সেক্রেটারি ছিলেন। গৈলা স্কুল ও গার্লস স্কুলের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন ও গ্রামের জনহিতকর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেন।

ইঁহাদের পুরান বাড়িতে বৈশাখ মাসে ২ দিন খোল হইত।

পূব সেনপাড়া

পূব সেনপাড়ার সেন মহাশয়েরা বহু খারিজা তালুকের মালিক। ইঁহাদের বাড়ির সংখ্যা প্রচুর। লক্ষ্মীচরণ বিশেষ নামকরা লোক ছিলেন। আনন্দ চন্দ্র বিজনী ষ্টেটে চাকরি করিতেন এবং উৎসাহী সমাজকর্মী ছিলেন। তিনি গ্রামের নানাবিধ হিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকিতেন। কলিকাতায় বণিক প্রেসের তিনি মালিক ছিলেন।

জনার্দন সরকারি রাজস্ব বিভাগে চাকরি করিতেন। গৈলা স্কুল, গার্লস স্কুল ও রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতি ব্যাপারে উৎসাহী কর্মী ছিলেন। যামিনী মোহন, যতীন্দ্র নাথ ও মতীন্দ্র মোহন বিভিন্ন স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন।

সেনদের দৌহিত্রবংশীয় ও দুর্গামোহন সেনের বাড়ির দেবীপ্রসন্ন বহুদিন যাবৎ কালিকাতায় ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। তিনি অনেক বৎসর যাবৎ বরিশাল সেবা সমিতির সহিত যুক্ত ও তাহার কার্যকরী সভাপতি ছিলেন। ঢাকুরিয়া হাই ইংলিশ স্কুল ও গার্লস স্কুলের কার্য

নির্বাহক সভার তিনি সভ্য ছিলেন। গ্রামের সকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ আছে।

বিমলেন্দুর কন্যা, কলিকাতার শশিমুখী বালিকা বিদ্যালয়ের হেড মিষ্ট্রেস অণিমা সেন গুপ্ত পর্বতারোহণে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে কৈলাস ও মানস সরোবর, অমরনাথ, গোমুখী, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ, বদরিকাশ্রম, পিণ্ডারী গ্লেসিয়ার ও রূপকুণ্ড গমন করেন। কৈলাস মানস সরোবরের পথে তিনি ১৬০০০ ফিট উচ্চ লিপুলেখ পাসের উপর দিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বে সম্ভবত আর কোনও স্ত্রীলোক রূপকুণ্ড যান নাই। হিমালয়ের ট্রেলস্ পাস অভিযান কালে ৬০০০ ফিট উচুতে পর্বতের ধ্বস চাপা পড়িয়া ১৯৬৪ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। দুর্গম পর্বতারোহণ যেমন তাঁহার প্রিয় ছিল তেমনি পর্বতের কোলেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

প্যারীমোহন গাঙ্গুলীর বাড়ি

এ বাড়ির ললিতমোহন গ্রামের সব ব্যাপারে বেশ উৎসাহী। ঢাকুরিয়ায় কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠাতাদের তিনি অন্যতম ও অনেক বৎসর কালীবাড়ি কমিটির সভাপতি ছিলেন। চাকরি জীবনে তিনি ঢাকা ও দার্জিলিং-এ গভর্নরের বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক ওভারসিয়ার ছিলেন।

সুবোধ চন্দ্র গভর্ণমেণ্টের পুনর্বাসন বিভাগে চাকরি করেন।

প্রসন্নকুমার চাটার্জির বাড়ি

এই বাড়ি ছোট নয়া গুপ্তের বাড়ির দক্ষিণে অবস্থিত। চট্টোপাধ্যায়গণ বঙ্গবাসদের দৌহিত্র বংশীয় এবং যাজনিক কার্য করিতেন।

সততা ও পরোপকার প্রবৃত্তির জন্য প্রসন্নকুমার বিশেষ খ্যাত

ছিলেন। তাঁহার পরোপকার প্রবৃত্তির দুইটি উদাহরণ দেওয়া হইল। তাঁহার বাড়ি হইতে কিছুদূরে একজন ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক (স্ত্রী পুত্রাদি আত্মীয় বিহীন) বসন্ত রোগে মারা যায়। কেহই সাহস করিয়া তাহাকে দাহ কবিতে যান নাই। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তখন বয়স ৭০ কি ৭১। এই সংবাদ শুনিয়া বাড়ির কাহাকেও না জানাইয়া তিনি ঐ বাড়িতে গিয়া একাকী মৃতব্যক্তির দাহকার্য সম্পন্ন করেন।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত, তিনি একদিন বাজারে যাইতেছিলেন। বাজারের কাছে গিয়া দেখেন তাঁহার জানাশুনা একজন মুসলমান চাষী পাশে একটি বস্তা রাখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, লোকটি চাউল কিনিয়াছে কিন্তু হঠাৎ প্রবল জ্বর হওয়ায় তাহার বাড়ি পর্যন্ত যাইতে পারিতেছে না এবং চাউল না পৌছাইতে পারিলে তাহার ছেলে মেয়েদের উপবাসী থাকিতে হইবে। ঐ স্থান হইতে তাহার বাড়ি প্রায় ১॥০ মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু ঐ কথা শুনিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখনই বিনা দ্বিধায় ঐ চাউলের বস্তা নিজে লইলেন এবং লোকটিকে ধীরে ধীরে আসিতে বলিলেন। এই ভাবে তাহাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌছাইয়া দিলেন।

লোকের বিপদে আপদে সর্ব্বদাই তাঁহার সাহায্য পাওয়া যাইত। তাঁহার বেশ নাড়ীজ্ঞান ছিল এবং হাত দেখিয়া আসন্ন মৃত্যুর সময় বলিয়া দিতে পারিতেন।

অক্ষয়কুমার উড়িষ্যায় চাকরি করিতেন, বর্ত্তমানে ব্যবসায় করিতেছেন।

বকশী বাড়ি

গ্রামের পূর্ব উত্তর প্রান্তে এই বাড়িটি তিন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক খণ্ডে বা হাউলীতে পৃথক চণ্ডীমণ্ডপ আছে। বাড়ির দীঘিটি সুবৃহৎ।

তাহার পশ্চিম তীরে শিব মন্দির। এই মন্দিরে বিশ্বেশ্বর দাশের সহ-ধর্মিনী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উত্তর পাড়ে শ্মশান ও ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেকগুলি সমাধি মন্দির। এই দীঘি ব্যতীত বাড়িতে আরও সাতটি পুষ্করিণী আছে।

ত্রিলোচন দাশ হইতে নিম্ন চতুর্থ পুরুষ রামেশ্বর ও তাঁহার ভাই হরিনারায়ণ কবিরাজ বাড়ি হইতে এই বাড়িতে প্রথম আসেন। রামেশ্বরের অধস্তন পুরুষ গৌরকিশোর গৌরনদী থানায় 'বকশী' ছিলেন এবং তদবধি এই বাড়ি 'বকশী বাড়ি' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ বাড়ির কালীকুমার প্রথমে মাদারিপুর ও পরে বরিশাল শহরে ওকালতি করেন। রজনীকান্ত এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করিয়া ওকালতি পাশ করেন এবং বরিশালে ওকালতি ব্যবসা আরম্ভ করেন। ক্রমে তিনি শহরের প্রথম শ্রেণীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উকীল বলিয়া পরিগণিত হ'ন এবং বহুকাল বার লাইব্রেরীর সভাপতি ছিলেন। শহরের ও গৈলার সবরকমের জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। তিনি বরিশাল শহরের মিউনিসিপ্যালিটির ৩।৪ বার (term) চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়া ছিলেন। বরিশাল ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের তিনিই প্রথম বেসরকারী ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছিলেন (পদাধিকার বলে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব চেয়ারম্যান থাকিতেন) এবং একাধিক বার ঐ পদে আসীন ছিলেন। তাঁহার সময়ে জিলার নানাস্থানে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা তৈয়ার ও খাল খনন হইয়াছিল। গৈলা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের রাস্তা ও খাল প্রধানত তাঁহারই কীর্তি। গৈলা স্কুল স্থাপনে তাঁহার অবদানের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে গ্রামের সর্ববিধ উন্নতির মূলে ছিলেন তিনি।

পার্বতীকুমার ফরিদপুর জিলার ভাঙ্গা মহকুমার মুনসেফ কোর্টের সেরেস্তাদার ছিলেন এবং ওখানকার হাই ইংলিশ স্কুল স্থাপন করিয়া বহু কাল তাহার সেক্রেটারি ছিলেন। ভাঙ্গাবাসিগণ তাঁহাকে কি শ্রদ্ধার

চক্ষে দেখিত তাহা ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, তাঁহার মৃত্যু বাৰ্ষিকী উপলক্ষে বরাবর স্কুল ছুটি দেওয়া হইত। এমনকি পাকিস্থান হওয়ার পরেও ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই।

প্যারীমোহন, কুলভূষণ ও ইন্দুভূষণ বরিশালে উকীল ও শ্যামাচরণ পিরোজপুরের মোক্তার ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ছিলেন। বিশ্বেশ্বর ছিলেন সাব-ডেপুটি ও অতি সামাজিক লোক। অতুলানন্দ বরিশালেব রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। সেখানকার সমবায় আন্দোলনে তিনি বিশেষ অংশ গ্রহণ করিতেন এবং আর্যলক্ষ্মী ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা ও সেক্রেটারি ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি বরিশালে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক ও অবিনাশ চন্দ্র ব্যাঙ্কের এজেণ্ট।

বঙ্গবাস বংশ

ইহাদের অনেক বাড়ি—পাঠক (নূতন ও পুরাতন) বাড়ি, শিব বাড়ি, মঠ বাড়ি, চন্দ্রনাথ বিদ্যালঙ্কারের বাড়ি, গঙ্গা পুরোহিত, রসিক বঙ্গবাস, লক্ষ্মী বঙ্গবাস, বিধু ভট্টাচার্য, রজনী বঙ্গবাস প্রভৃতির বাড়ি, পশ্চিমের বাড়ি প্রভৃতি। নিজেদের নাম কেহ চক্রবর্তী, কেহ ভট্টাচার্য কেহ বঙ্গবাস ও আধুনিক কালে কেহ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়া লেখেন। ইহাদের 'বঙ্গবাস' পদবীর কারণ জানা যায় না।

উপরোক্ত সব বাড়ির পূর্বপুরুষ ছিলেন যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। রামনাথ, যদুনাথ ও জগদানন্দ তাঁহার প্রপ্রৌত্র ছিলেন। বর্তমান বঙ্গবাসগণ তাঁহাদের সন্তান। যাজনিক ক্রিয়া ছিল ইহাদের প্রধান জীবিকা। বিনায়ক সেন ও গুপ্তগণ ও আরও অনেক বংশ ইহাদের যজমান। মঠ বাড়িরও শিষ্য আছে।

আধুনিক কালে চিন্তাহরণ জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া

আফিসে অফিস সুপারিণ্টেনডেণ্ট ছিলেন। পশ্চিমের বাড়ির ডক্টর বিশ্বনাথ ও ব্রজনাথের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। ইঁহাদের দৌহিত্র বংশীয় বমনী মোহন গাঙ্গুলী গৈলার সর্ববিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত থাকিতেন ও বিশেষ উৎসাহী কর্মী ছিলেন। দেশ বিভাগের পব কলিকাতা হইতে কয়েক মাইল দূরে তাঁহার নূতন বাসস্থান কল্য-নগবে, একটি উচ্চ ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যতীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী কলেজের অধ্যাপক ও ন্যাশন্যাল ক্যাডেট কোরের ক্যাপটেন। পাঠ্যাবস্থায় গ্রামের কাজে তাঁহাব বিশেষ উৎসাহ ছিল।

এ বংশের কেহ কেহ ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন।

বৈদিক ব্রাহ্মণগণ

বৈদিক শ্রেণীব ব্রাহ্মণগণেব অনেক বাড়ি। গুরুতাই ইঁহাদের ব্যবসা। বহু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য প্রভৃতি ইহাদের শিষ্য। ইঁহাদের মধ্যে সমধিক সংস্কৃত চর্চা ছিল। পূর্বকালের বিদ্যাভূষণ, ন্যায়ালঙ্কার, শিরোমণি প্রভৃতি ও আধুনিক কালের সাংখ্যতীর্থ, স্মৃতিতীর্থ, কাব্যতীর্থ প্রভৃতি উপাধি তাহার সাক্ষ্য দেয়। সাধারণত ইঁহারা নিষ্ঠাবান আনুষ্ঠানিক হিন্দু।

হরেন্দ্র স্মৃতিতীর্থ স্মৃতিশাস্ত্রে বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন ও বরিশাল ধর্মরক্ষিণী সভার টোলে অধ্যাপনা করিতেন। শ্রীপ্রসন্ন কাব্যতীর্থ বহুকাল গৈলা স্কুলের হেড পণ্ডিত ছিলেন। প্রসন্নকুমার কাব্যতীর্থ, বামধন কাব্যতীর্থ, রামপ্রসাদ কাব্যতীর্থ, রামশঙ্কর সাংখ্যতীর্থ, কৈলাস চন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রভৃতি অনেকে বিভিন্ন ইংরেজী স্কুলের হেডপণ্ডিত ছিলেন।

ডক্টর চন্দ্রকান্তের বিষয়ে পূর্বে বলা হইয়াছে। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি লেখাপড়া নিয়া থাকেন। তিনি ইংরেজী ভাষাতে অনেক বই লিখিয়াছেন। রামচন্দ্র এম-এ পাশ করার পর অনেক কাল কলিকাতা

ও কলিকাতার বাহিরের বিভিন্ন স্কুলে হেডমাষ্টার ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনিই গ্রামের মধ্যে প্রথম আমেরিকা হইতে এম-এড ডিগ্রী লাভ করেন।

বর্তমানে বৈদিক বংশীয়গণ ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। প্রশান্ত এম-কম পাশ করিয়া ব্যবসা করিতেছেন।

ভরদ্বাজের বাড়ি

ভরদ্বাজ বংশের ২ খানা বাড়ি। একখানা গৈলার দক্ষিণ অংশে। ইহার পার্শ্ব দিয়া লস্করের আড়া নামক খাল আরম্ভ হইয়াছে। ঈশান চন্দ্র দাশ বরিশাল শহরের ব্রাউন সাহেবের ম্যানেজার ও অতি শান্ত প্রকৃতির মিষ্টভাষী লোক ছিলেন। এ বাড়ির অনেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনে কারাবরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের পরিচয় যথাস্থানে দেওয়া হইয়াছে।

ভরদ্বাজদের অপর বাড়ি মধ্য গৈলায় অবস্থিত। কল্লোল কুমার কমার্সিয়াল ট্যাকস্ অফিসার ও তপন বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের লেবার অফিসার।

ভুটি বাড়ি

প্রসিদ্ধি এই যে এই বাড়ির পূর্বপুরুষ রামদুর্লভ সেন ও তাঁহার ভাই হরমোহনের দেহ ছিল এত বিরাট যে তাঁহারা কথা বলিবার সময় শ্বাসরোধ হইয়া আসিত এবং তাঁহারা সব কথা শেষ করিতে পারিতেন না। প্রত্যেক বাক্যই অসমাপ্ত থাকিত, ফলে অনেক সময় অনিচ্ছাকৃত হাস্য কৌতুক সৃষ্টি হইত। তাঁহারা নিজেরাও ইহাতে সকলের সহিত যোগ দিতেন। এই সব কারণে গ্রামের লোকেরা তাহাদিগকে "ভুটি" বলিত এবং তাঁহাদের বাড়ি ভুটি বাড়ি নামে খ্যাত হয়। তাঁহাদের প্রচুর অর্থ ও ভাটী অঞ্চলে বিস্তর ভূসম্পত্তি

ছিল। গল্প আছে যে তাঁহাদের সোনার মোহর ও রূপার টাকা "ধামা" দিয়া ওজন করিয়া মাপিতে হইত। এই সব সম্পত্তি দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। কি ভাবে ইহা অর্জিত হইয়াছিল এবং কি ভাবেই বা শেষ হইল তাহাও জানা যায় নাই। বর্তমান কালে, এ বাড়ির যোগেশ চন্দ্রের বাল্য বয়সে, বাড়ির একস্থানে মাটির নিচে প্রোথিত একশতটি সোনার মোহর পাওয়া গিয়াছিল।

যোগেশ চন্দ্রের ও তাঁহার পুত্র কন্যার কথা যথাস্থানে বলা হইয়াছে।

মজুমদার বাড়ি

এই বংশ ফুল্লশ্রীতে প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন এবং প্রভাবশালী। ইঁহারা প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক। পরবর্তীকালে ইঁহারা পার্শ্ববর্তী কোনও কোনও বাড়ির পূর্বপুরুষদের এই অঞ্চলে স্থাপন করিয়াছেন।

ইঁহারা 'শিয়াল সেন'। কালী কৃষ্ণ গৈলা স্কুল স্থাপনের উদ্যোক্তাদের অন্যতম ছিলেন এবং কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। অনন্ত চন্দ্র প্রথম ইংরেজী শিক্ষিতদের অন্যতম ছিলেন। কৈলাস চন্দ্র ছিলেন গৈলা স্কুলের হেডমাষ্টার। তাঁহার সম্বন্ধে 'শিক্ষার বিবরণ' অধ্যায়ে বিস্তারিত বলা হইয়াছে। প্রধান শিক্ষকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করার পরও তিনি এক বৎসর স্কুলের কার্যনির্বাহক সভার সভাপতি ছিলেন।

ললিত চন্দ্র প্রথমে অন্য স্কুলে হেডমাষ্টার ছিলেন। পরে গৈলা স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। কৈলাস বাবুর ছুটির সময়ে তিনি স্কুলের অস্থায়ী হেডমাষ্টার ভাবে কাজ করিয়াছেন। প্রাণকুমার এম-এ পাশ করার পর শিক্ষকতা করেন। তিনি আজীবন দেশ সেবা করিয়া গিয়াছেন। নীরোদবরন ছিলেন ঢাকা শহরে উকিল এবং নলিনাক্ষ পুরীতে কবিরাজ। ইনি কাশী বিদ্যালয়ের আয়ুর্বেদ ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাশ করা ডাক্তার। শৈলেন্দ্র নাথ ডি-এস-পি ছিলেন।

পূর্বে এ বাড়ির গোবিন্দ মজুমদারের নেতৃত্বে একটি সার্কাসের দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। গ্রামের অন্নদা দে, অক্ষয় মজুমদার, আনন্দ শীল ও যামিনী দাস খেলায় অংশ গ্রহণ করিত। এ দলটি কিছু কাল এতদঞ্চলে নানাবিধ ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিয়াছিল। পরে ট্রাপিজের খেলা দেখানোর সময় অক্ষয় কুমার মজুমদার হঠাৎ উপর হইতে পড়িয়া যায় ও তাহার মৃত্যু হয়। দলও তখন বন্ধ হইয়া যায়।

মুনশী বাড়ি

গৈলার মুনশীরা ছিলেন প্রকাণ্ড জমিদার। ইহাদের বাড়ির কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। বিক্রমপুর পরগনার গোড়াগাছা হইতে রামচন্দ্র দাশ নিঃস্ব অবস্থায় গৈলা গ্রামে আসিয়া বসতি আরম্ভ করেন এবং অভাব অনটনের মধ্যেই জীবন শেষ করেন। তৎপুত্র রামরাম অবস্থার কিছুটা উন্নতি করেন। তাঁহার ৪ পুত্রের মধ্যে রামলোচন নবাব সরকারে মুনশীর পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অনেক অর্থোপার্জন করেন এবং সেলিমাবাদ পরগনা খরিদ করেন। এই পরগনা স্বরূপকাঠি, পিরোজপুর, মঠবাড়িয়া প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থিত ছিল এবং জমিদারির আয় ছিল বার্ষিক প্রায় ২০০০০৲। পরে রামলোচন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হইতে নিজ ২ পুত্র কালীপ্রসাদ (মোহন বাবু) ও দুর্গা-প্রসাদের (গোবিন্দ বাবু) নামে বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত সমগ্র সুন্দর-বন অঞ্চল বন্দোবস্ত নেন। মোহন বাবুর সময়ে এই অঞ্চলের আয় বেশ বৃদ্ধি পাইয়া কয়েক হাজার টাকায় দাঁড়ায় এবং তাঁহারা খুব প্রতাপশালী জমিদার হন। পরে ঐ অঞ্চল নিয়া গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে তাঁহাদের মোকদ্দমা বাধে এবং তাহাতে তাঁহারা খুবই ক্ষতিগ্রস্থ হন। পরে নিজেদের দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ ও মামলা মোকদ্দমায় একেবারে সর্বস্বান্ত হন। বরিশাল শহরে অনেক জায়গা জুড়িয়া তাঁহাদের বাড়ি ছিল এবং অনেক সময় মোহনবাবু সেখানে থাকিতেন। প্রবাদ এই যে বরিশাল

শহরে জুড়ি গাড়ি তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন এবং বরিশাল জিলায় "বাবু" বলিলে তখন একমাত্র মোহন বাবুকেই বুঝাইত। গ্রামে তাঁহাদের প্রতিপত্তির উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদিও দেশে খাওয়া দাওয়া নিয়া অনেক সময় অনেক দলাদলি থাকিত এবং এক বাড়ির লোক অন্য বাডি বা অন্য দলের লোকের সঙ্গে খাইতেন না, মুনশী বাড়ির নিমন্ত্রণে কোনও দলাদলি ছিল না।

দেশে সর্বস্বান্ত হওয়ার পর মোহন বাবু দেশত্যাগী হইয়া উত্তরবঙ্গে মালদহ জিলায় রোহনপুরে প্রবাসী হইয়াছিলেন। সেখানে সামান্য কর্ম করিয়া তিনি অর্থোপার্জন ও সঞ্চয় করিয়া পুনরায় জমি ক্রয় করিয়া বিত্ত-শালী হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র পৌত্রাদিগণ তথায় প্রচুর জমির মালিক হইয়াছিলেন। গোবিন্দ বাবুর পুত্র প্রভারঞ্জন কলিকাতায় একজন বড় ব্যবসায়ী।

যোগেশ চন্দ্র উড়িষ্যান্তর্গত করদ মিত্র রাজ্য বামরা রাজ্যের দেওয়ান পদে নিযুক্ত থাকা কালে গৈলাবাসীদের অনেককে সেখানে কর্ম সংস্থান করিয়া দিয়াছেন। এই বাড়িতে বৈশাখ মাসে ২ দিন "থোল" হইত।

রথ বাড়ি

এ বাড়ির অক্ষয় কুমার দাস জলপাইগুড়ীতে ব্যবসায় করিয়া বিস্তর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হইয়াছেন। রাম চন্দ্র দাস নাড়ী প্রকরণে অভিজ্ঞ ছিলেন ও নাড়ী পরীক্ষা করিয়া অন্তিম সময় নির্ণয় করিতে পারিতেন বলিয়া খ্যাতি আছে। গ্রামে কেবল মাত্র এই বাড়িতেই রথ টানা হয় বলিয়া এই বাড়ি 'রথ বাড়ি' নামে পরিচিত।

রামকমল দাসের বাড়ি

গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে এই বাড়ি। আনুমানিক ১৫০ বৎসর পূর্বে

রামময় দাস চাঁদসী গ্রাম হইতে আসিয়া এই বাড়ি ক্রয় করিয়া বসতি আরম্ভ করেন। ইহারা তালুকদার। বৈশাখ মাসে ২ দিন এ বাড়িতে "থৌল" হইত। মথুরা নাথের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে।

রামনাথ দাশের বাড়ি

গৈলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আদি ভূম্যধিকারী রামনাথ দাশ। বর্তমানে তাঁহার নামীয় যে বাড়ি গ্রামের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত তাহা তাঁহারই স্থাপিত। তিনি নবাব সরকারে চাকরি করিতেন ও 'পুরান বাড়ি' হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান বাড়িতে আসেন। বাড়ির দরজার দুই পাশে ঝাউগাছ সমন্বিত প্রশস্ত রাস্তাটি পূর্বদিকে খাল পর্যন্ত গিয়াছে। খালের অপর পারে তাঁহাদের হাট খোলা। বহুকাল পূর্বে হাট বসিত। পরে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। আবার শেষের দিকে সপ্তাহে দুই দিন করিয়া হাট বসিতে আরম্ভ করে।

রামনাথ ক্রিয়াকর্মান্বিত লোক ছিলেন এবং মন্দির, জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার গুরুকে এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণদের প্রচুর ব্রহ্মত্র জমি দান করিয়াছিলেন। জরিপের কালে নির্ধারিত হয় যে তাঁহার প্রদত্ত ব্রহ্মত্র জমির পরিমান ২২ দ্রোণ বা প্রায় ১৬৯০ বিঘা (৪$\frac{৪}{৫}$ বিঘা=১ কানি; ১৬ কানি=১ দ্রোণ)। এতদঞ্চলে এরূপ ভূমিদানের আর দৃষ্টান্ত নাই।

রামনাথের অপর কীর্তি সুদূর উত্তর বঙ্গের (বরেন্দ্রভূমের) ব্রাহ্মণ গৈলায় ঠাকুর পূজার জন্য আনয়ন ও প্রতিষ্ঠা। এতদ্ব্যতীত অনেক বৈদিক ব্রাহ্মণও তিনি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রামনাথের দুই পুত্র। তাহাদের অকালে মৃত্যু হইলে তিনি দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন।

এ বাড়ির মধুসূদন গ্রামের রাস্তা, খাল, গার্লস স্কুল, প্রভৃতি জনহিতকর কার্যে খুব উৎসাহী ছিলেন। হীরালালও এই সব ব্যাপারে উদ্যোগী ছিলেন। রেবতী মোহন চাকরি উপলক্ষে মীরাটে থাকিয়াও

গ্রামের উন্নতি মূলক কার্যকলাপের সহিত সংযুক্ত থাকিতেন। দেবেন্দ্র-নাথ উকীল ছিলেন।

রামমোহন দাশের বাড়ি

এ বাড়ির নবীনচন্দ্র ছিলেন প্রসিদ্ধ তালুকদার। গৈলা স্কুল স্থাপনেব সময় তিনি তাহার কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ক্ষীরোদচন্দ্র উকীল ছিলেন। স্বকুমার লব্ধপ্রতিষ্ঠ মোক্তার। অন্যান্য দের কথা যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

এ বাড়িতে 'সতী' হওয়ার দৃষ্টান্ত আছে। রামসুন্দর গুপ্ত (শচীন্দ্র নাথ গুপ্তের বৃদ্ধ প্রপিতামহ) পরলোক গমন করিলে তাঁহার সহধর্মিনী রামসীতা দেবী সহমৃতা হ'ন। যখন আত্মীয়েরা কিছুতেই তাঁহাকে এ সংকল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলেন না তখন তাঁহাবা দড়ি দিয়া তাঁহাকে বাঁধিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা অনাবশ্যক মনে করিয়া হর্ষোৎফুল্লমুখে চিতারোহণ করেন। এই সময় আকাশে মেঘ জমিয়াছিল এবং বৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল। তিনি তখন ঐ চিতার উপরই নিম্নলিখিত ছড়া রচনা করিয়া বলিয়াছিলেন—

"হরি দেওই বরিষ না
খানিক গিয়া ধর,
মায়েরে নির্বাণ দিয়া
পুত্র যাউক ঘর।"

বৃষ্টি আর আসে নাই। তাঁহার নশ্বর দেহ ভস্মসাৎ হইয়া গেল কিন্তু তাঁহার স্মৃতি অমর হইয়া রহিল।

দুর্গানন্দ গুপ্ত গণ্যমান্য লোক ছিলেন ও দেশের জনহিতকর কার্যে

অংশ গ্রহণ করিতেন। তিনি গৈলা স্কুলের প্রথম কার্যনির্বাহক সভার অন্যতম সভ্য ছিলেন।

প্যাবীমোহন কলিকাতায় চাকবি করিতেন। তাঁহার ১নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীটের বাসা কলিকাতায় প্রথম আগমনকারী গৈলার অনেকের আশ্রয়স্থল ছিল। অবসর গ্রহণের পর তিনি গ্রামে বাস করেন ও সকলের মধ্যে নৈতিক ও ধর্মবোধ জাগ্রত করার জন্য 'ধর্মসভা' নামে এক সভা প্রতিষ্ঠিত কবিয়াছিলেন।

প্রিয়নাথ ববিশালেব উকীল ছিলেন। গৈলা স্কুলের পার্শ্ববর্তী খালেব পূব পাব হইতে গ্রামের মধ্য দিয়া বামনাথ দাশের দরজা হইয়া যে রাস্থা পালেরদি পর্যন্ত গিয়াছে ঐ রাস্তা নির্মাণের ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগীদের তিনি অন্যতম ছিলেন। গৈলা স্কুল কমিটির তিনি সভাপতি ছিলেন। গ্রামের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বরিশালের 'শিক্ষা স্বাস্থ্য বিধায়িনী সভার' অনুরূপ এক সভা স্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু উহা বিশেষ কার্যকরী হয় নাই। তিনি সর্বপ্রকার জনহিতকব কাজেই অগ্রণী ছিলেন।

শশীকান্ত কিছুকাল কলেজে অধ্যাপনা করার পর বরিশালে উকীল হ'ন। তিনি প্রথম জীবনে ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন ছিলেন। পরে শ্রীশ্রীভোলানন্দ গিরি মহারাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

তিনি বরিশাল শহরে ভোলা গিরি আশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও উহার ট্রাষ্টবোর্ডের সভাপতি এবং কলিকাতার বোর্ডের অন্যতম সভ্য ছিলেন। বরিশাল শহরের রামকৃষ্ণ মিশন, ব্রাহ্মসমাজ, অক্‌স্‌ফোর্ড মিশন ও জগদীশ আশ্রম প্রভৃতি প্রত্যেকটি ধর্মসভার সহিত যুক্ত ছিলেন এবং মাঝে মাঝে সেই সব স্থানে বক্তৃতা দিতেন। গৈলার জনহিতকর সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। গৈলা স্কুলের তিনি বহুকাল প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারি ছিলেন; গার্লস স্কুল ও কবীন্দ্র কলেজের কমিটিরও সভ্য ছিলেন।

শশীকান্ত উকীল ছিলেন কিন্তু জ্ঞাতসারে মিথ্যা মোকদ্দমা গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার সততার একটা দৃষ্টান্ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি মুনসেফি চাকরির জন্যে হাইকোর্টে নাম লিখাইয়াছিলেন (enrolled) কিন্তু এনট্রান্স পরীক্ষার সার্টিফিকেটে তাঁহার বয়স কম লিখা ছিল। পরে হাইকোর্ট আফিসে প্রকৃত বয়স যে বেশি তাহা জানাইতে যা'ন। সেখানে তাঁহাকে বলা হইল যে ঐ বয়স লেখা হইলে তাঁহার চাকরির সম্ভাবনা নাই সুতরাং ঐ বয়স লেখানোর প্রয়োজন নাই। কিন্তু শশীকান্ত তাঁহার সংকল্পে অটল রহিলেন ও প্রকৃত বয়স লিখাইলেন। ফলে চাকরিও হইল না।

দেশ বিভাগের পর তিনি ইছাপুরে বাস করেন ও জনসাধারণকে সর্বভাবে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে 'হরিসভা' প্রতিষ্ঠা করেন।

সততা এবং সর্বপ্রকার জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সক্রিয় সহযোগিতার জন্য তিনি সর্বত্রই সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

ননীভূষণ গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় ললিত বাবুর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। গ্রামের জনমঙ্গলজনক কোনও প্রতিষ্ঠান তাঁহার সাহায্য হইতে কোনও দিন বঞ্চিত হয় নাই।

অমূল্য রতন কুচবিহার কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। শচীন্দ্র নাথ 'সর্বভারতীয় রোড কংগ্রেসের' সহ-সভাপতি ছিলেন। গ্রামের সর্বপ্রকার জনহিতকর চেষ্টায় তিনি বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন।

শচীন্দ্রনাথের সহধর্মিনী মনোরমা বিশিষ্ট সমাজ সেবিকা। সর্বভারতীয় নারী সভার (All India Women Conference) তিনি সম্পাদিকা ও কোষাধ্যক্ষা এবং নিউ আলিপুর মহিলা সমিতির ফাউণ্ডার সেক্রেটারি, বর্তমানে প্রেসিডেন্ট। দুঃস্থ, শরণার্থী উদ্বাস্তু ও শিশুদের সাহায্যের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি যুক্ত আছেন। ১৯৩৭ সালে আসানসোলে মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠার তিনি সূত্রপাত করিয়াছিলেন।

এই বাড়ির আর একটি বধূ (সুবোধ চন্দ্রের স্ত্রী) ইন্দুপ্রভা (নমিতা) গ্রাজুয়েট ও গৈলা গার্লস স্কুলে বিনা পারিশ্রমিকে অনেকদিন শিক্ষকতা করিয়া গ্রামের সকলের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন।

সুধীন্দ্র নাথের স্ত্রী প্রতিভা স্বামীর কর্মোপলক্ষে আন্দামান দ্বীপে থাকা কালে তত্রত্য সকল প্রকার জনহিতকব ও সামাজিক কার্যাবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন ও তথাকার রবীন্দ্র বাংলা বিদ্যালয়ের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি সুলেখিকা। বিবিধ প৹ পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

ডাঃ শৈবাল গুপ্ত কৃত্রিম হৃদযন্ত্র চালনা বিদ্যা আয়ত্ব করেন। তাঁহার সহায়তায কলিকাতায় ১৯৬২ সালে মনুষ্যের হৃদযন্ত্র বন্ধ করিয়া তাহার উপর সাফল্যের সঙ্গে অস্ত্রোপচার কবা হয়। কলিকাতায় এইরূপ অস্ত্রোপচার এই প্রথম।

সিমলাই বাড়ি

গ্রামের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে সিমলাই বাড়ি। শ্যামাচরণ ওকালতি পাশ করিয়া প্রথমে বরিশাল শহরে ও পরে পটুয়াখালীতে ব্যবসা আরম্ভ করেন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি সেখানকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উকীল বলিয়া পবিগণিত হ'ন ও প্রায় ৪০ বৎসর সেখানকার সরকারী উকীল ছিলেন। বার এসোসিয়েশনের তিনি প্রথম সভাপতি ও অনেক বৎসর সেক্রেটারি ছিলেন। পটুয়াখালীর সর্ববিধ জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের তিনি অগ্রণী ছিলেন। তিনি ১৫ বৎসর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ও ২০ বৎসর লোকাল বোর্ডের মেম্বর ছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি ৩১ বৎসর জুবিলি হাই স্কুলের সেক্রেটারি, ৭ বৎসর ভাইস প্রেসিডেণ্ট ও ১ বৎসর প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি পাবলিক লাইব্রেরীরও প্রতিষ্ঠাতা ও তাহার সেক্রেটারি ছিলেন। ইহা ভিন্ন সেখানকার মিউনিসিপ্যালিটির

চেয়ারম্যান, কালীতারা গার্লস স্কুলের ও পটুয়াখালী কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা ও হিতসাধনী ফাণ্ডের সেক্রেটারি ছিলেন। তাঁহার ৫০ বৎসর ওকালতি পূর্তি হইলে সেখানকাব উকীল সভ্য তাঁহার স্বর্ণ জয়ন্তী উৎসব করিয়াছিল।

গ্রামে গৈলা স্কুলের জেনারাল কমিটির সভ্য হিসাবে শ্যামাচরণ যুক্তিপূর্ণ পরামর্শ দিতেন ও গার্লস স্কুলের উৎসাহী সভ্য ছিলেন।

তাঁহার এক পৌত্র ডি-এস-পি।